ভ. বুইয়ানোভ

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

В. М. Буянов

Первая медицинская помощь

Издательство «Медицина» Москва

ভ. বুইয়ানোভ

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

মির প্রকাশন মস্কো

মনীষা গ্রন্থালয় কলিকাতা

অনুবাদ: শান্তিদা কান্ত রায়

V. M. Buyanov
FIRST AID

на языке бенгали

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ISBN 5-03-000427-0

সূচীপত্র

মুখবন্ধ

এই পাঠ্যপুস্তকে সব রকমের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ও আকস্মিক রোগ সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা, গঠন ও তাতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের মূল ভিত্তিগুলি আলোচিত হয়েছে। এতে আলোকপাত করা হয়েছে সাধারণ প্রশ্নগুলির ওপর, প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হলে যেগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা সকলের দরকার, যেমন জীবাণুশূন্যতা (অ্যাসেপসিস), জীবাণুনাশক (অ্যান্টিসেপটিক) সম্বন্ধে জ্ঞান; ব্যান্ডেজ বাঁধার নীতি, পুনরুজ্জীবিতকরণের মূল ভিত্তি উপায়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান ইত্যাদি।

এই পুস্তকে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে: দুর্ঘটনায় আহতদের ক্ষত থেকে রক্তপাত বন্ধ করা, নরম কলার জখম ও অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান করা; বিদ্যুৎ আঘাত, অগ্নিদগ্ধতা ও রৌদ্রাঘাতের চিকিৎসা করা; বিষক্রিয়া, জরুরী সার্জিকাল অবস্থা, নানা আকস্মিক রোগ ও গর্ভাবস্থার নানা জটিলতায়, প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া সম্পর্কে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের স্বাস্থ্যরক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত বিষয়সূচী অনুযায়ী রচিত এই পুস্তকটি, প্রাথমিক চিকিৎসা বিদ্যালয়ের প্রাথমিক চিকিৎসক ও লেবরেটরী কর্মী এবং কম্পাউন্ডারী ও দাঁত বাঁধাই কারিগরী বিদ্যা শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীদের জন্য নির্দিষ্টকৃত।

ভূমিকা

সোভিয়েত ইউনিয়নে মানুষের জীবন ও তার সুস্বাস্থ্যকেই সবচেয়ে বড় সম্পদ বলে মনে করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন নিবন্ধে তা লিপিবদ্ধ — যেমন গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নের আইন নিবন্ধে তেমনি তার অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির আইন নিবন্ধের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় আইনেও তার উল্লেখ রয়েছে। সোভিয়েত দেশে চিকিৎসা সাহায্য বিনা খরচের, সর্বজনলভ্য ও অতি উচ্চমানের। কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ সোভিয়েত চিকিৎসা সাহায্য ব্যবস্থা, চিকিৎসা সাহায্যের কার্যকারিতা প্রতি বছর উন্নত হচ্ছে, তার প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায় সর্বাগ্রে এখানকার মানুষের আয়ুবৃদ্ধির ভেতর দিয়ে। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে যেখানে মানুষের গড়পড়তা আয়ু ছিল মাত্র ৩০ বছর, আজ সেখানে তা হয়েছে ৭০ বছরেরও বেশী। অনুরূপ সাফল্য একমাত্র সুউন্নত সমাজতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব যেখানে মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলে ধরা হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২৫ ও ২৬

তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, জনগণের স্বাস্থ্যরক্ষার কাজ উন্নততর করার উদ্দেশ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, আধুনিকতম চিকিৎসা-সরঞ্জামের প্রবর্তন ও রোগ নিবারণের নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান নির্মাণের জন্য, ওষুধ ও চিকিৎসার যন্ত্রপাতি শিল্প গঠনের জন্য, স্যানাটোরিয়াম ও স্বাস্থ্যনিবাস নির্মাণের জন্য, সমাজসেবা, শরীরচর্চা ও খেলাধুলার বিকাশ প্রভৃতি মূল্যবান কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ অনেক বেশী বৃদ্ধি করা হয়েছে। সোভিয়েত দেশে হাসপাতালের বেডের সংখ্যা ও ডাক্তারের সহকারী কর্মীর সংখ্যা, সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করে আছে। এই সবের ফলে সোভিয়েত দেশে চিকিৎসা সাহায্যের মান খুবই উন্নতি ও উৎকর্ষতা লাভ করেছে আর জরুরী চিকিৎসা সাহায্য দানের সুগঠিত সংগঠন বর্দ্ধিত করেছে যেমনি তার কার্যকারিতা তেমনি সময় মত সাহায্য দানের ক্ষমতা।

মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন রকমের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মাঝে অন্যতম প্রধান স্থান দখল করে সেই সব প্রতিষ্ঠান যেগুলি জরুরী চিকিৎসা সাহায্য দান করে থাকে।

সোভিয়েত দেশে জরুরী চিকিৎসা সাহায্য দানের ব্যবস্থা বিশেষ উন্নত। সুদক্ষ জরুরী চিকিৎসা দান পরিচালিত হয় জরুরী চিকিৎসার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ প্রতিষ্ঠান, জরুরী চিকিৎসার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানমূলক ইনষ্টিটিউট, মেডিক্যাল উচ্চশিক্ষা ইনষ্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্লিনিকে। আজকাল জরুরী চিকিৎসা দানের ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হচ্ছে: দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে চিকিৎসা

প্রতিষ্ঠানের জালবিন্যাস, বছরের পর বছর বাড়ছে ডাক্তার, প্রাথমিক চিকিৎসক, হাসপাতালের নার্স, লেবরেটারী-কর্মী ও অন্যান্য চিকিৎসা কর্মীদের সংখ্যা। এ সবের ফলে আজ সুদক্ষ চিকিৎসা সাহায্য যতদূর সম্ভব রোগীদের নিকটবর্তী নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং চিকিৎসার ফলাফলেও সমূহ উন্নতি দেখা দিয়েছে। কিন্তু তাহলেও, একেবারে আদর্শ জরুরী চিকিৎসা দানের সংগঠন থেকে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আকস্মিক রোগে ও দুর্ঘটনায় রোগীকে সাহায্য দানে দেরী হয়ে গেছে, কেননা যে লোকেরা দুর্ঘটনাস্থলের কাছে ছিল তাদের কেউই প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান করতে জানে না। এর থেকেই বোঝা যায়, দেশের গোটা জনসাধারণকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার যে প্রচেষ্টা, তার কারণ কী। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের কায়দাগুলি শেখানো হয় ইস্কুলের ছাত্রদের, দমকল-বাহিনীর কর্মীদের, পুলিশে কাজ-করা লোকদের, যানবাহনের চালকদের, সৈন্যবাহিনীর কর্মচারীদের।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য বলতে কী বোঝায়? প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য হল কতগুলি জরুরী চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রয়োগ যা আকস্মিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া বা দুর্ঘটনায় আহত হওয়া রোগীদের ওপর প্রয়োগ করা হয়, যেমন ঘটনাস্থলে তেমনি রোগীদের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করার সময়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য হয় নানা রকমের। রকমগুলি নির্ভর করে তার ওপর, কে সেই চিকিৎসা সাহায্য দান করছে:

১. প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য (অদক্ষ্য), যে সাহায্যকার্য পালিত হয় এমন লোকেদের দ্বারা যারা চিকিৎসা সংক্রান্ত কর্মক্ষেত্রের লোক নয় এবং প্রায়ই যাদের কাছে না আছে সাহায্যের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, না আছে ওষুধ-পত্র।

২. সুদক্ষ (প্রাক-ডাক্তারী) প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য, যে সাহায্যকার্য সম্পাদিত হয় চিকিৎসা সংক্রান্ত কর্মক্ষেত্রের কর্মীদের দ্বারা যারা আগে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের বিশেষ ট্রেনিং পেয়েছে (প্রাথমিক চিকিৎসক, নার্স, লেবরেটারী কর্মী, দাঁতবাঁধাই-এর কর্মী প্রভৃতি)।

৩. ডাক্তার প্রদত্ত প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য, যে সাহায্যদান করে ডাক্তার নিজে, যার হাতের কাছে রয়েছে নানা দরকারি ডাক্তারী যন্ত্রপাতি ও প্রয়োজনীয় ওষুধ-পত্র, রক্ত ও রক্তের বদলে ব্যবহার্য পদার্থ এবং আরও নানা জিনিষ।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য তাদেরই দরকার যারা কোন দুর্ঘটনায় পড়েছে বা যাদের হঠাৎ দেখা দিয়েছে জীবনের পক্ষে বিপদজনক কঠিন অসুখ।

দুর্ঘটনার কেস বলা হয় সেই সমস্ত কেসকে, যাতে মানুষের কোন না কোন দেহাঙ্গ জখম হয়েছে বা বাইরের পরিবেশের আকস্মিক প্রভাবে শরীরের কোন কাজ ব্যাহত হয়েছে। দুর্ঘটনা অনেক সময় এমন জায়গায় ঘটে যেখান থেকে জরুরী চিকিৎসা সাহায্য স্টেশনে খবর দেওয়াও সম্ভব নয়। অনুরূপ অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য মূল্যবান সার্থকতা পরিগ্রহণ করে। সে সাহায্য দিতে হয় ঘটনাস্থলে ডক্তোর আসার আগে বা রোগীকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করার সময়।

দুর্ঘটনায় আহতেরা নিজেরা, তাদের আত্মীয়-স্বজন, তাদের পড়শীরা বা প্রত্যক্ষদর্শীরা প্রায়ই সাহায্যের জন্য নিকটবর্তী চিকিৎসা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান (ওষুধের ডিস্পেন্সারী, দাঁতবাঁধাই-এর কারিগরী প্রতিষ্ঠান, ডাক্তারী লেবরেটারী, স্যানিটারী ও মহামারী বিরোধী ষ্টেশন, শিশুরক্ষা কেন্দ্র) প্রভৃতির শরণাপন্ন হয়। এইসব প্রতিষ্ঠানের চিকিৎসাকর্মীদের এসব ক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে সাহায্য দান করতে হয়।

এর থেকেই বোঝা যায় কেন লেবরেটারী-কর্মী, কম্পাউন্ডারী (ফার্মাসিউটিক), দাঁত-বাঁধাই কারীগরিবিদ্যা শিক্ষার্থীদের ও অন্যান্যদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য বিষয়ে শিক্ষা কোর্সের ব্যবস্থা করা অতি প্রয়োজনীয় কর্তব্য। দুর্ঘটনা ও আকস্মিক রোগে সুদক্ষ প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের জন্য সমস্ত চিকিৎসা বিষয়ক কর্মীদের ভাল করে জানা দরকার বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনায় ও আকস্মিক রোগের মূল উপসর্গগুলি ও পরিষ্কার বোঝা দরকার, দুর্ঘটনায় আহত বা অসুস্থ হয়ে পড়া ব্যক্তির পক্ষে তার জখম বা পীড়া কতখানি বিপদজনক।

ডাক্তারের প্রত্যক্ষ সাহায্যপূর্ব প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের ভেতর পড়ে তিন ধরনের সাহায্যের ব্যবস্থা:

১) অবিলম্বে দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বাইরের ক্ষতিকারক কারণগুলিকে (বিদ্যুৎপ্রবাহ, অতিউচ্চ বা অতিনিম্ন তাপমাত্রা, ভারী বস্তুর চাপ) অপসারিত করা ও দুর্ঘটনা-গ্রস্তকে মারাত্মক পরিবেশ থেকে (জলের তলা থেকে, আগুন-জ্বলা ঘর থেকে, বিষাক্ত গ্যাস জমা-হওয়া প্রকোষ্ঠ থেকে) উদ্ধার করা;

২) আঘাতের বা আকস্মিক রোগের ধরন ও চরিত্র বিচারে উপযুক্ত প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান করা (রক্তপাত বন্ধ করা, ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধা, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা, হৃৎপিন্ড মালিশ করা, বিষের প্রতিশেধক ব্যবহার করা প্রভৃতি);

৩) রোগী বা আহতক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা (গাড়ীতে করে)।

উপরোল্লিখিত এক নম্বর ব্যবস্থা ধারায় যে সব ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে সেগুলি মূলত সাধারণ প্রাথমিক সাহায্য, চিকিৎসা সাহায্য নয়। সে সাহায্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিচালিত হয় দুর্দশাগ্রস্তের নিজের ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায়, কেননা সকলেই জানে যে জলে ডুবন্ত লোককে জল থেকে টেনে না তুললে, অগ্নিদগ্ধকে আগুন-ধরা ঘর থেকে না বের করতে পারলে, চাপা-পড়া লোককে চাপের তলা থেকে উদ্ধার করতে না পারলে দুর্দশাগ্রস্তের মৃত্যু অনিবার্য। বলা দরকার যে, ঐসব দুর্ঘটনার কারণগুলির ক্রিয়া যত বেশীক্ষণ ধরে চলবে তত গভীর ও বিপদজনক হবে তার পরিণতি। তাই, প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য আরম্ভ করা উচিত উক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করে।

দুই নম্বর ব্যবস্থাধারাগুলি হল সরাসরি চিকিৎসা সাহায্যের ব্যবস্থা, যে সাহায্য দিতে পারে একমাত্র চিকিৎসা-কর্মীরা অথবা তারা, যারা বিভিন্ন দুর্ঘটনার মূল উপসর্গগুলি জানে ও প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদানের বিশেষ কায়দাগুলি অবলম্বন করতে শিখেছে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যে ব্যবহার্য ব্যবস্থাগুলির মধ্যে ৩ নং ব্যবস্থা ধারার কাজগুলি খুবই মূল্যবান। যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব দুর্দশাগ্রস্তকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। অসুস্থকে বা আহতকে শুধু যে তাড়াতাড়ি পরিবহণ করা দরকার তাই নয়, পরিবহণ করা দরকার ঠিক ভাবে অর্থাৎ পাঠানোর সময় তার অসুখ বা আঘাতের চরিত্র বিচারে এমন অবস্থানভঙ্গীতে পাঠাতে হবে যাতে তার কোন ক্ষতি না হয়। যেমন পাঠাতে হয় কাত্ করে শুইয়ে যদি রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকে বা তার বমি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে; আহতের অস্থিভঙ্গ হলে তাকে পাঠাতে হয় এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যাতে আহত অঙ্গ নড়াচড়া না করতে পারে ইত্যাদি।

পরিবহণের জন্য সবচেয়ে ভাল, বিশেষ পরিবহণ ব্যবস্থা (এম্বুলেন্স গাড়ী বা এম্বুলেন্স উড়োজাহাজ)। তা না থাকলে পরিবহণ করতে হয়, সেই বিশেষ পরিবেশে হাতের কাছে যে যানবাহন পাওয়া যায়, তাতে করেই। সবচেয়ে খারাপ যদি কোন যানবাহন না পাওয়া যায়, তখন দুর্দশাগ্রস্তকে নিয়ে যেতে হয় কোলে করে বা বিশেষ স্ট্রেচারে করে অথবা তৎক্ষণাৎ তৈরী-করা স্ট্রেচারে করে বা ত্রিপলের চাদরের ওপর শুইয়ে বা অন্য উপায়ে।

পরিবহণের কাজ সমাধা করতে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে। চিকিৎসাকর্মীর কাজ — সেই সময় রোগীকে দেহের সঠিক অবস্থানভঙ্গীতে রেখে নিয়ে যাওয়া ও প্রয়োজনীয় অবস্থানভঙ্গীতে রেখে এক পরিবহণব্যবস্থা থেকে অন্য পরিবহণব্যবস্থায় বদলি করা, স্থানান্তরণকালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া ও এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে রোগীর কোন জটিলতা না দেখা দেয়। জটিলতা দেখা দেওয়া সম্ভব বমি হলে,

নিশ্চল করে বাঁধা অঙ্গের নিশ্চলতা নষ্ট হলে, বেশী রকম ঠাণ্ডা লাগলে, ঝাঁকুনি লাগলে বা অন্যান্য কারণে। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের সার্থকতা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সহজ নয়। সময়মত সঠিক চিকিৎসা এক এক সময় শুধু যে রোগীর বা আহতের জীবন বাঁচায় তাই নয়, তা পরবর্তী কালে পীড়া বা আঘাতের সফল চিকিৎসা চালিয়ে যেতেও সাহায্য করে। শক্ হওয়া, ক্ষত স্থানে পুঁজ জমা, রক্ত জীবাণুদুষ্ট হওয়া প্রভৃতি কঠিন জটিলতার আবির্ভাব থেকে তা রোগীকে বাঁচায় এবং একই সঙ্গে রোগর কার্য্য ক্ষমতা হারানোর সম্ভাবনা কমায়।

সংযুক্ত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তার অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক আইন সংবিধানে পরিষ্কার লেখা আছে — স্বাস্থ্যকর্মীদের অধিকার ও কর্তব্য কী। আইনটির ৩৩ নং ধারায় লিপিবদ্ধ আছে যে, রাস্তায়, কোথাও যাওয়ার পথে, কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বা বাসায় বসে আহত হয়ে অথবা আকস্মিক রোগে আক্রান্ত হয়ে দুর্দশাগ্রস্ত কেউ যদি কোন চিকিৎসাকর্মীকে সাহায্যের জন্য ডাকে, তাহলে সেই ডাকে সাড়া দিয়ে সে চিকিৎসাকর্মী ঠিকমত প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান করতে বাধ্য। ঐ আইনেরই ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, চিকিৎসাকর্মী ,যারা তাদের পেশাদারী কর্তব্য পালনে অবহেলা করবে তাদের ওপর আইন অনুযায়ী নিয়ম ভঙ্গের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে যদি না সে অবহেলা এমনিতেই ফৌজদারী আইনে সোপর্দনীয় হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার সমস্ত অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলির স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় আইনের ৩৭ নং ধারায় বাধ্য উক্তি আছে যে, জনগণের

প্রতিনিধিদের এলাকা-কার্যকরি কমিটিগুলি, সেখানকার বিভিন্ন কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলির নেতৃত্ব প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদানে চিকিৎসাকর্মীদের সর্বদিক থেকে সহায়তা করতে বাধ্য। প্রয়োজন মত গাড়ী দিয়ে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে ও অন্যান্য ব্যবস্থা করে দিয়ে তারা আহত ও আকস্মিক রোগে আক্রান্ত রোগীকে নিকতবর্তী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থায় সাহায্য করবে।

চিকিৎসাকর্মী হতে ইচ্ছুক সকলের মনে রাখা উচিত যে, তারা যে পেশা বেছে নিচ্ছে তা একটুও হাল্কা পেশা নয়, তার জন্য প্রয়োজন ধৈর্য্য ধরে যথেষ্ট কঠিন পরিশ্রম করা, সর্বদা কাজের উন্নতি সাধন করা ও জ্ঞানবৃদ্ধি করা। রোগীদের জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য, চিকিৎসাকর্মীদের নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে উঠতে হবে। সর্বত্যাগী পরিশ্রম ও রোগীদের প্রতি সীমাহীন ভালবাসার জন্যই সোভিয়েত চিকিৎসাকর্মীরা সর্বজনের শ্রদ্ধার পাত্র এবং কমিউনিষ্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারেরর যত্নপরিবেষ্টিত। সোভিয়েত ইউনিয়নে চিকিৎসা শিক্ষা দান করা হয় বিনা খরচে এবং সমস্ত চিকিৎসাকর্মী, আপন জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। একাজের জন্য সোভিয়েত দেশে শতশত চিকিৎসা জ্ঞান বৃদ্ধির শিক্ষাকোর্স, বিশেষ বিশেষ ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে।

জরুরী চিকিৎসা সাহায্য স্টেশন। সোভিয়েত দেশে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের জন্য বিশেষ বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে — জরুরী-চিকিৎসা

সাহায্যদানের স্টেশন ও জরুরী চিকিৎসা কেন্দ্র (আঘাতের জরুরী চিকিৎসা কেন্দ্র, দাঁতের জরুরী চিকিৎসা কেন্দ্র)।

জরুরী চিকিৎসা সাহায্য স্টেশনের কাজ জটিল ও নানা রকমের। তার কাজ বিভিন্ন রকমের: আঘাত ও আকস্মিক রোগে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া, জরুরী চিকিৎসার জন্য দরকার হলে রোগীদের হাসপাতালে আর প্রসূতিদের প্রসবাগারে স্থানান্তরিত করা। জরুরী সাহায্যের অ্যাম্বিউল্যান্সের কাজ ও কর্তব্য হল, ডাক পড়লেই বিলম্ব না করে যে কোন ডাকে সাহায্যের জন্য রওয়ানা হয়ে যাওয়া। দুর্ঘটনাস্থলে পেঁৗছে জরুরী সাহায্যের ডাক্তার বা প্রাথমিক চিকিৎসক, প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদান ক'রে আহত বা অসুস্থকে যথাযথ সুব্যবস্থা মত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে।

জরুরী চিকিৎসা সাহায্য দানের ব্যবস্থা দিন দিন উন্নত হচ্ছে ও উৎকর্ষতা লাভ করছে। এখন সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত বড় বড় শহরের জরুরী চিকিৎসা সাহায্য স্টেশনগুলি, বিশেষ আধুনিক যন্ত্রপাতি ও ব্যবস্থাদি যুক্ত অ্যাম্বিউলেন্স গাড়ী (Reanimobile — পুনরুজ্জীবিতকরণের গাড়ী) দিয়ে সুসজ্জিত, যার সাহায্যে খুবই উচ্চমানের ডাক্তার প্রদত্ত প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদান করা চলে। সেই সব অ্যাম্বিউলেন্স গাড়ীর ডাক্তার ও প্রাথমিক চিকিৎসকেরা প্রয়োজন হলে ঘটনাস্থলে বা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময় রোগীর দেহে রক্ত বা রক্তের পরিবর্তে ব্যবহার্য তরল পরিসঞ্চালন করে, বুকের বাইরে থেকে হৃৎপিন্ড মালিশ করে বা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করে,

দরকার হলে রোগীকে অজ্ঞান করে, দরকার হলে বিষ প্রতিষেধক ও অন্যান্য ওষুধ প্রয়োগ করে। জরুরী চিকিৎসা সাহায্যে অনুরূপ সুসজ্জিত অ্যাম্বিউলেন্স ব্যবহার ক'রে এ কাজে যথেষ্ট সুফল লাভ করা গেছে ও সে সাহায্য উচ্চমানের সুদক্ষ চিকিৎসা সাহায্যে পরিণত হয়েছে। প্রত্যেকটি জরুরী চিকিৎসা সাহায্য স্টেশনে কাজ করে কতিপয় বিশেষ ব্রিগেড যারা সুদক্ষ ও সুব্যবস্থা সহকারে রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে। পলিক্লিনিক, চিকিৎসা ও মহামারী বিরোধী প্রতিষ্ঠান বা জরুরী সাহায্য কেন্দ্রের ডাক্তারদের ডাকে এই সব ব্রিগেড উক্ত প্রতিষ্ঠানে গিয়ে সেখান থেকে রোগীদের স্থানান্তরিত করে।

সোভিয়েত দেশে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এলাকা-ডাক্তারখানা, পলিক্লিনিক, চিকিৎসা ও মহামারী বিরোধী প্রতিষ্ঠান এবং প্রাথমিক চিকিৎসক ও ধাত্রী সাহায্য কেন্দ্রের এক সর্বব্যাপি বিরাট জালবিন্যাস, যেগুলি দিনের বেলায় নিজ নিজ এলাকার বাসিন্দাদের জরুরী চিকিৎসা সাহায্য দান করে। পলিক্লিনিকের ডাক্তারেরা, যারা বাসায় গিয়ে রোগীদের চিকিৎসা করে তারা আকস্মিক বিপদজনক অসুখে বা দুর্ঘটনা কেসেও তাদের বাসায় গিয়ে প্রাথমিক ডাক্তারী সাহায্য দান ক'রে স্থির করে রোগীকে বা আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করার প্রয়োজন আছে কি না, তা কতখানী জরুরী এবং স্থানান্তরিত করতে হলে তা কীভাবে করতে হবে।

ওষুধের ডিস্পেন্সারী, ডাক্তারী লেবরেটারী, দাঁত চিকিৎসার পলিক্লিনিক, জনস্বাস্থ্য রক্ষার ও মহামারী বিরোধী কাজের স্টেশনগুলিতে, যে কোন সময় দুর্ঘটনায়

আহত বা জরুরী চিকিৎসার প্রয়োজন — এমন সব আকস্মিক রোগে আক্রান্ত মানুষ এসে সাহায্য প্রার্থনা করতে পারে বলেই, ঐসব প্রতিষ্ঠানেও প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের নানা রকম সাজসরঞ্জাম ও ওষুধ-পত্র রাখা দরকার। ওষুধের ডিস্পেন্সারিতে রাখা প্রয়োজন হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, আয়োডিন, এমোনিয়া; ব্যথা নিবারণের ওষুধ (এনাল্‌জিন, এমিডোপাইরিন); হৃৎপিন্ড ও রক্তবাহী শিরার অসুখে ব্যবহারের ওষুধ (টিংচার ভ্যালেরিয়ান, কেফিন, ভ্যালিডল, নাইট্রোগ্লিসারিন, কর্ডিয়ামিন, প্যাপাজল); জ্বর কমানোর ওষুধ (এস্পিরিন, ফেনাসেটিন); ফোলা নিবারণের ওষুধ (সাল্ফানিলএমাইড ও বিভিন্ন এন্টিবাইওটিক); জোলাপের ওষুধ, রক্তপাত থামানোর বাঁধন (টুর্নিকেট), জ্বর মাপার থার্মোমিটার, ক্ষত ড্রেস করার সামগ্রী যুক্ত প্যাকেট, স্টেরাইল বা জীবাণুমুক্ত করা ব্যাণ্ডেজ, তুলো, অস্থিভঙ্গে ব্যবহার্য্য স্প্লিন্ট।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য লোকেরা ওষুধের ডিস্পেন্সারির শরণাপন্ন হয়। তাই সব কম্পাউন্ডারদের প্রাথমিক চিকিৎসা দানের কায়দা জানা থাকা দরকার। জানা দরকার, কোন্ জরুরী আকস্মিক রোগ ও কী রকম দুর্ঘটনায় কোন্ ওষুধ দিতে হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়ার জন্য, আগে থেকে তৈরী করা সেট সর্বদা প্রস্তুত রাখা দরকার। তার সঙ্গে আরও প্রস্তুত রাখা দরকার রোগী বহনের স্ট্রেচার, রোগীর ব্যবহার্য্য ক্রাচ্, স্টেরাইল যন্ত্রপাতি (আর্টারি ফরসেপ্‌স, ইঞ্জেকসণের সিরিঞ্জ, কাঁচি), অম্লজান-ভর্তি বালিস, এম্পুলে ভর্তি ওষুধ (কেফিন, কর্ডিয়ামিন,

লোবেলিন এড্রিনালিন, এট্রোপিন, গ্লুকোজ, করামিন, প্রোমিডল, এনাল্জিন, এমিডোপাইরিন)। মনে রাখা দরকার যে, বেদনা কমানোর ওষুধগুলি সব হিসাবানুধীন, ঐ সব ওষুধ খরচ করার পর তা হিসারের বিশেষ খাতায় লিখে রাখতে হয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

জীবাণুনাশকতা (অ্যাণ্টিসেপ্সিস) ও জীবাণু-শূন্যতা (অ্যাসেপ্সিস) সম্বন্ধে মূল জ্ঞাতব্য বিষয়

আজ থেকে একশো বছরেরও অধিক সময় পূর্বে ফরাসী বিজ্ঞানী পাস্তুর প্রমাণ করেন যে, পচন ও গাজনের প্রক্রিয়া সৃষ্টি হয় অণুজীবের (micro-organism) ক্রিয়ার ফলে। ইংল্যাণ্ডের শল্য চিকিৎসক লিণ্টার, পাস্তুরের গবেষণার ওপর ভিত্তি ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌছান যে, ক্ষতস্থান সংক্রামিত হয় তাতে অণুজীব পতিত হওয়ার ফলে। হাসপাতালের নোংরার ছোঁয়াচে রোগীর ক্ষতস্থান পেকে ওঠে — এই ধারণা প্রথম ব্যক্ত করেন ন. ই. পিরগভ। লিণ্টারের বহুপূর্বে ক্ষতস্থান জীবাণুবিহীন করার জন্য তিনি স্পিরিট, সিলভার নাইট্রেট ও আয়োডিন ব্যবহার করেন।

মানুষ সর্বদা হাওয়া ও পারিপার্শ্বিক বস্তুসমূহে অবস্থিত বিশাল সংখ্যক জীবাণুর সংস্পর্শে আসে। সুস্থ মানুষের চামড়ায় ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের জীবাণু। কিন্তু দেহের অভ্যন্তরে তারা প্রবেশ করে কেবল-মাত্র তখনই যখন আঘাত লাগা, ছড়ে যাওয়া, খোঁচালাগা, পুড়ে যাওয়ার ফলে চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সমগ্রতা নষ্ট হয়; যখন রক্ত সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার ফলে, ঠাণ্ডা

লেগে, মেদবিহীন হওয়ার ফলে শরীরের প্রতিরোধ শক্তি কমে যায় বা বিভিন্ন সাধারণ অসুখে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।

দেহের কলার ভেতর প্রবেশ ক'রে জীবাণুগুলি ক্ষতের প্রবেশমুখে (পেকে যাওয়া ঘা, ফোঁড়া, পচা ঘা) পুঁজ যুক্ত স্ফীতি সৃষ্টি করে এবং আরও খারাপ কেসে (জীবাণু যদি রক্তে প্রবেশ করে) সৃষ্টি হয় গোটা দেহের সার্বিক জীবাণুদুষ্টতা বা সেপসিস্।

অস্ত্রোপচার, ইঞ্জেকসন, স্নায়ুর ব্লকেড, শিরার ভেতর বা চামড়ার তলায় তরল ওষুধ পরিসঞ্চালন প্রভৃতি চিকিৎসার কাজে এক বা অন্যরকমে চামড়ার সমগ্রতা নষ্ট হয়, যে স্থানের ভেতর দিয়ে দেহের অভ্যন্তরে জীবাণু প্রবেশ করতে পারে। ক্ষতের ইনফেকসন বা জীবাণুদুষ্টতা নিবারণ করার জন্য এবং ক্ষতে জীবাণু পতিত হলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য ব্যবহৃত হয় নানা ব্যবস্থা, যেগুলির নামকরণ হয়েছে "অ্যান্টিসেপ্টিক" ও "অ্যাসেপ্টিক" ব্যবস্থা।

অ্যান্টিসেপ্টিক বা বীজবারক ব্যবস্থা

অ্যান্টিসেপ্টিক বা বীজবারক ব্যবস্থা হল সেইসব নানা রকমের ব্যবস্থা যার উদ্দেশ্য ক্ষতের জীবাণু বিনাশ করা ও ক্ষতের ভেতর এমন অবস্থা সৃষ্টি করা যাতে জীবাণুর বংশবৃদ্ধি রোধ হয় এবং তা গভীরে অবস্থিত কলায় প্রবেশ করতে না পারে। অ্যান্টিসেপ্টিক ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয় যান্ত্রিক, ভৌত, রাসায়নিক ও জৈবিক উপায়ে।

যান্ত্রিক অ্যাণ্টিসেপ্টিক ব্যবস্থাগুলির মধ্যে পড়ে ক্ষত থেকে মৃত ও ছিঁড়ে-যাওয়া কলা, রক্তের ঢেলা, বাইরের নোংরা ও অন্যান্য পদার্থ অপসারণ করা। যান্ত্রিক অ্যাণ্টিসেপ্টিক ব্যবস্থার উদাহরণ হল হাসপাতালের ডাক্তার কর্তৃক শল্য চিকিৎসার যন্ত্রপাতির সাহায্যে ক্ষতের প্রাথমিক পরিষ্কারকরণ। ভৌতিক অ্যাণ্টিসেপ্টিক ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে কোয়ার্টজ আলোর রশ্মির সাহায্যে ক্ষত চিকিৎসা, সোডিয়াম ক্লোরাইডের হাইপারটনিক সলিউশনে সিক্ত ক্ষতে নানা রকমের নল, গজের টুকরো, গজের পোল্‌তে ব্যবহার করা যাতে পুঁজ ও ক্ষতের রস বাইরে নিষ্কাশিত হতে পারে ও ক্ষতে জীবাণু সংক্রমণের পথে বাধা সৃষ্টি হয়। অ্যাণ্টিসেপ্টিকের এই রকম ব্যবস্থা মূলত ডাক্তারী সাহায্য দেবার সময় প্রয়োজন হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের জন্য সবচেয়ে মূল্যবান হল রাসায়নিক ও জৈবিক অ্যাণ্টিসেপটিক ব্যবস্থা, অর্থাৎ নানা রকমের দ্রব্য ব্যবহার করা যা ক্ষতের মধ্যে পতিত হওয়া জীবাণু বিনষ্ট করে বা সেগুলির বংশবৃদ্ধি বিলম্বিত করে (জীবাণুনাশক বা ব্যাক্টেরিওসাইড দ্রব্য)।

রাসায়নিক অ্যাণ্টিসেপ্টিক দ্রব্যাদি

বীজবারক অ্যাণ্টিসেপ্টিক দ্রব্যের সংখ্যা বিশাল, কিন্তু তার বেশীর ভাগই ক্ষতের ওপরকার কলার ওপরও কম বেশী পরিমাণে ক্ষতিকারক কাজ করে। ঐ সব দ্রব্য তাই ব্যবহার করা উচিত খুবই সাবধানে, অর্থাৎ কতখানি তা ক্ষতিকারক ও কতখানি তার দ্বারা উপকার সম্ভব — তা বিচার করে।

হাইড্রোজেন পেরক্সাইড সলিউশন (Sol. Hydrogenii peroxydi diluta) — রংবিহীন জলীয় পদার্থ, দুর্বল বীজবারক (অ্যান্টিসেপ্টিক); দুর্গন্ধ বিনষ্ট করে। হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ব্যবহৃত হয় 2% সলিউশনে। ক্ষতের ভেতর পুঁজ ও রক্তের সংস্পর্শে এলে তা থেকে নির্গত হয় অনেক পরিমাণ অম্লজান, যার ফলে তৈরী হয় ফেনা এবং তা ক্ষতকে পুঁজ ও অবশিষ্ট মৃত কলা থেকে মুক্ত করে। ক্ষতস্থান পুনর্বার ড্রেসিং করার সময় ক্ষতের গায়ে শুকিয়ে শক্ত হয়ে লেগে থাকা ব্যান্ডেজকে ভেজানোর জন্যও হাইড্রোজেন পেরক্সাইড খুব ব্যবহৃত হয়।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট (Kalii permanganas) — কালচে বেগুনী রঙের কৃষ্টাল বা দানা দানা পদার্থ যাকে সহজে জলে গোলা যায়। সলিউশনটি দুর্বল জীববারক শক্তি সম্পন্ন, পুঁজযুক্ত ক্ষত ড্রেসিং-এর জন্য ব্যবহৃত হয় ০·১% থেকে ০·৫% সলিউশন। জল শুষে নেওয়ার গুণসম্পন্ন ওষুধ হিসাবে ৫% সলিউশনে এই ওষুধ ব্যবহৃত হয় আগুনে পোড়া জায়গা, ঘা, বেডসোরের চিকিৎসায়।

বোরিক অম্ল (Acidum boricum) — সাদা দানা-দানা পাউডার, যা সহজে জলে বিগলিত হয়। এর ২% সলিউশন ব্যবহৃত হয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, ক্ষত, দেহের বিভিন্ন গহ্বর ধৌত করার জন্য।

স্পিরিটে-গোলা আয়োডিন সলিউশন (Tinctura jodi 5%) — ব্যবহৃত হয় অপারেশনের জায়গা ও শল্য-চিকিৎসকের হাতের জীবাণু নাশের কাজে এবং তা ছাড়াও

তা ব্যবহৃত হয় আহতের চামড়ায় ছড়ে যাওয়া ও আঁচর লাগা জায়গার জীবাণুনাশক হিসাবে।

আয়োডোনেট (Iodonatum) — কাল্‌চে মেটে রঙের, হাল্কা আয়োডিনের গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। তা জলের সঙ্গে সহজে মেশে এবং ব্যবহৃত হয় ১% সলিউশনে অস্ত্রোপচারের জায়গায় লাগানোর জন্য এবং জরুরী কেসে ডাক্তারের হাত জীবাণুবিহীন করার জন্য।

আয়োডোফর্ম (Iodoformium) বিক্রী হয় গুঁড়ো আকারে যা দিয়ে মলম ও ইমাল্‌শন তৈরী করা হয় ও ব্যবহার করা হয় পুঁজযুক্ত ক্ষতের চিকিৎসার জন্য।

ক্লোরামিন "বি" (Chloraminum B) — সাদা বা হাল্কা হলদে রঙের, ক্লোরিনের গন্ধ যুক্ত দানা দানা গুঁড়ো। পদার্থটি সহজে জলে গোলে। এর, জীবাণুনাশক ও খারাপ গন্ধ দূরীকরণের গুণ আছে। ব্যবহৃত হয় ১% থেকে ২% সলিউশনে, পচা ঘা ধোয়ার জন্য। হাতের গ্লোভ্‌স্‌ ও যন্ত্রপাতির জীবাণু নাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয় ০·২৫% থেকে ০·৫% ক্লোরামিন "বি" সলিউশন। সলিউশনটিকে জমা করে রাখতে হয় কালো বোতলে, কারণ কয়েক দিন জমা রাখার পর সলিউশনটি নষ্ট হয়ে যায় ও জীবাণুনাশক শক্তি হারায়।

মার্কিউরিক ক্লোরাইড (Hydrargyri dichloridum) (সুলেমা) — ভারী সাদা গুঁড়ো, সহজে জলে গোলে। সুলেমার ১:১০০০ সলিউশনই সাধারণত ব্যবহার করা হয়। এটা এক শক্তিশালী বিষ, তাড়াতাড়ি দেহে শোষিত হয়, এমনকি অক্ষত চামড়ার ভেতর দিয়েও। এবং সে বিষক্রিয়ায় মৃত্যুও হতে পারে। এই ওষুধকে তাই রাখতে

হয় নিষিদ্ধ ওষ্ুধের আলমারীতে এবং এ ওষ্ুধের বোতলের গায়ে লিখে রাখতে হয় (বিজ্ঞাপণ মেরে রাখতে হয়) যে এটা বিষ। সুলেমা ব্যবহৃত হয় প্রধানত সেই সব যন্ত্রপাতি ও হাতের গ্লোভ্সের জীবাণু নাশ করার জন্য, যেগুলি সংক্রামক রোগীদের জন্য পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে।

ডাইওসিড (Diocidum) হল দুই রকম উপাদানের সংমিশ্রণে গঠিত পারদ যুক্ত অ্যান্টিসেপটিক, যা থেকে বিশেষ উপায়ে তৈরী করা সলিউশন শক্তিশালী বীজাণুনাশকের কাজ করে। প্লাষ্টিকের জিনিষপত্র ও বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্বীজিত করার জন্য ব্যবহার করা হয় ১:১০০০ সলিউশন।

কোল্লার্গল (collargolum) জলে সহজে বিগলিত হয় — এমন কোল্লয়েডকৃত রূপা (কোল্লায়ডাল সলিউশন)। সলিউশনটি দেখতে গাঢ় মেটে রঙের বা লালচে বাদামী রঙের। এর, জীবাণু নাশ করা, জল শুষে কষে ফেলা ও পুড়িয়ে দেওয়ার গুণ আছে। ঘা ধৌত করা, ডুশ দেওয়া, চোখে ফোঁটা দেওয়া ও নাক ধোওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় এর ০·২ থেকে ১% সলিউশন, আর কোন জায়গা পুড়িয়ে দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় ৫ থেকে ১০% সলিউশন।

সিল্ভার নাইট্রেট (Argenti nitras) — শক্তিশালী এ্যান্টিসেপ্টিক ওষুধ। পুড়িয়ে দেওয়া ও নিবারকের কাজ করে। ১:৩০০০ দ্রবণমাত্রার দুর্বল সিল্ভার নাইট্রেট সলিউশন মূত্রাশয় ধৌত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। আর ১০ থেকে ৩০% সলিউশন ব্যবহৃত হয় ঘায়ের গ্রাণুলেশন কলা পুড়িয়ে দেওয়ার ও অন্যান্য কাজের জন্য।

ইথাইল স্পিরিট (Spiritus aethylicus) — বিশেষ রকমের গন্ধ যুক্ত, রঙবিহীন দ্রব পদার্থ। এর ৭০% ও ৯৬% সলিউশন ব্যবহৃত হয় ছুরি, কাঁচি প্রভৃতি কাটার যন্ত্রপাতি, সেলাইয়ের বস্তু নির্বীজিত করতে এবং অস্ত্রোপচারের জায়গা, শল্য চিকিৎসকের হাত, ঘায়ের চারপাশের চামড়া প্রভৃতি ডিসইনফেক্ট করতে ও শুষ্ক করতে।

স্পিরিটের জীবাণুনাশক কাজ অনেক বৃদ্ধি পায় যদি তাতে থাইমল ও এনিলিন রঞ্জক দ্রব্য যুক্ত করা যায়।

স্পিরিট ও থাইমলের সলিউশন, দ্রবণমাত্রা (১:১০০০)— খুবই শক্তিশালী এ্যাণ্টিসেপ্টিক, কার্যকারীতার দিক থেকে যা ৩% দ্রবণমাত্রা যুক্ত কার্বলিক অম্লের চেয়ে ৩০ গুণ বেশী শক্তিশালী অথচ তাতে কার্বলিক অম্লের মত উগ্র গন্ধও নেই বা তাতে কোনরকম জ্বালা সৃষ্টি হয় না।

ব্রিলিয়াণ্ট গ্রীণ সলিউশন (viride nitens) ব্যবহার করা হয় এর ১% সলিউশন রূপে এবং তা প্রয়োগ করা হয় ডাক্তারী যন্ত্রপাতি নির্বীজিত করার জন্য, চামড়ার পুঁজ যুক্ত ফোঁড়া ও ছড়ে যাওয়া বা আঁচর লাগা চামড়ার ওপর মাখানোর জন্য।

'নোভিকভ'র সলিউশন — এতে থাকে ট্যানিন, ব্রিলিয়াণ্ট গ্রীণ, ইথাইল স্পিরিট, ক্যাষ্টর অয়েল ও কলোডিয়ন। কলোডিয়ন পদার্থ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় এবং চামড়ার ওপর তৈরী হয় এক শক্ত স্থিতিস্থাপক পর্দা। এই সলিউশন ব্যবহৃত হয় চামড়ার অগভীর জখমে।

মেথিলিন ব্লু সলিউশন (Methylenum coeruleum) —

এর স্পিরিট-গোলা ২% সলিউশন ব্যবহৃত হয় পুড়ে যাওয়া ক্ষত চিকিৎসায়। জলে-গোলা এর ০·০২% সলিউশন ব্যবহার করা হয় শরীরের বিভিন্ন গহ্বর ধৌত করতে।

ডেগমিন (Degminum) হল হাই মলিকিউলার (বড় অণুযুক্ত) স্পিরিট ও হেক্সামেথিলিনএমাইন থেকে তৈরী ওষুধ। তা সহজে জলে গোলে ও শক্তিশালী জীবাণু বিনাশকের কাজ করে। এর ১% সলিউশন ব্যবহার করা হয় হাত ও অপারেশনের জায়গা নির্বীজিত করতে।

এথাক্রিডিন ল্যাকটেট (Aethacridini lactas) — এর অন্য নাম **রিভানল** — সূক্ষ্ম দানা যুক্ত হলুদ রঙের গুঁড়ো। ঠান্ডা জলে প্রায় গোলা যায় না; গরম জলে সহজে গোলে। দেহের বিভিন্ন গহ্বর ও পুঁজযুক্ত ঘা ধৌত করতে ব্যবহৃত হয় এর ০·০৫% সলিউশন।

ফুরাসিলিন (Furacilinum) — হলদে রঙের দানাযুক্ত গুঁড়ো। জলে সহজে গোলে না। বেশীর ভাগ পুঁজ সৃষ্টিকারী জীবাণুগুলির ওপর ভাল এ্যান্টিসেপ্টিকের কাজ করে। পুঁজযুক্ত ঘা, দেহের বিভিন্ন গহ্বর, পোড়া ঘায়ের উপরিভাগ, বেড্-সোর প্রভৃতি ধৌত করার জন্য ব্যবহৃত হয় এর ১:৫০০০ দ্রবণ মাত্রার সলিউশন।

এ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড সলিউশন (Sol. Ammonii caustici 10%), অন্য নাম এমোনিয়াম স্পিরিট, উগ্র গন্ধযুক্ত রঙবিহীন (স্বচ্ছ) তরল পদার্থ। সহজে জলে গলে যায়। হাত ধোয়ার জন্য, ময়লা ক্ষতস্থান ও অপারেশনের জায়গা পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয় এর ০·৫% সলিউশন।

শোধিত ফেনল (Phenolum purum), অন্য নাম কার্বলিক অম্ল (Ac. Carbolicum crustallisatum) —

বিশেষ রকমের উগ্র গন্ধযুক্ত, রঙবিহীন দানাযুক্ত ওষুধ, যাকে জল, স্পিরিট ও ইথারে দ্রবীভূত করা হয়। ফেনলের সলিউশনের শক্তিশালী জীবাণুনাশক গুণ আছে। রোগীর সেবায় কাজে লাগা জিনিষ-পত্র, তার জামা-কাপড়, রোগীর নিঃসরণ প্রভৃতি নির্বীজিত করতে ব্যবহৃত হয় এ ওষুধের ৩-৫% সলিউশন। রোগীর ঘর নির্বীজিত করা হয় কার্বলিক সাবান-গোলা দিয়ে। ফেনল সহজে শোষিত হয় চামড়ার ভেতর দিয়ে, যার জন্য তা বিষক্রিয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

ফার্মালডিহাইড সলিউশন (Sol. Formaldehydi) — বিশেষ রকমের গন্ধযুক্ত রঙবিহীন্ বিষাক্ত তরল পদার্থ। ডাক্তারের হাত ও তার যন্ত্রপাতি কাজের জন্য প্রস্তুত করতে, তা ছাড়াও হাতের গ্লোভ্স, পুঁজ ইত্যাদি নিষ্কাশণের টিউব নির্বীজিত করতে ব্যবহৃত হয় এর ০·৫% সলিউশন।

সাল্ফানিলএমাইড — এ্যাণ্টিসেপ্টিক পদার্থের (ওষুধের) মধ্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে সাল্ফানিলাএমাইড বিভাগের ওষুধগুলি। এ ওষুধের জীবাণুর বিকাশ ও জীবাণুর বংশবৃদ্ধি প্রতিরোধের (ব্যাক্টেরিওষ্ট্যাটিক ক্রিয়া) গুণ থাকলেও তা দেহের ওপর কোন ক্ষতিকারক কাজ করে না। এই কারণেই এই ওষুধকে ইনফেকশনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

এই বিভাগের ওষুধগুলির মধ্যে অধিক প্রচলিত — ষ্ট্রেপটোসাইড, নরসাল্ফাজল, এথাজল, সাল্ফাডিমিজাইন সুলজিন, থ্যালাজল, সাল্ফাডিমিটক্সিন। ক্ষতের জীবাণু-দুষ্টতা রোধ করার জন্য সাল্ফানিলএমাইডের ওষুধগুলি খেতে দেওয়া হয় এবং বিশেষ ক্ষেত্রে তা সোজাসুজি

ক্ষতস্থানেও ব্যবহার করা হয় (গুঁড়ো করে ছিটিয়ে)। শিরার ভেতর দিয়ে প্রয়োগের জন্যও তৈরী করা হয়েছে সাল্ফানিলএমাইডের ওষুধ (নরসাল্ফাজল)। পুঁজযুক্ত ঘায়ে সাল্ফানিলএমাইডের ওষুধগুলি ব্যবহার করা হয় ঘায়ের ওপর মলম ও ইমাল্শন রূপে। এতে নির্ভরযোগ্য ভাবে নির্বীজন ক্রিয়া সাধিত হয়, ঘা শুকানোর কাজে কোনই বাধা সৃষ্টি হয় না।

জৈব এ্যান্টিসেপ্টিক পদার্থগুলি

জৈব উপায়ে এ্যান্টিসেপ্টিকের অবস্থা সৃষ্টির জন্য নানা জৈব ওষুধ ব্যবহার করা হয় যেগুলি ঘায়ে বা দেহের ভেতরে প্রবেশ করা জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করে। অনুরূপ ওষুধগুলির মধ্যে পড়ে এ্যান্টিবায়োটিক, যেগুলি তৈরি করা হয় জীবাণুগুলি থেকে বা প্রস্তুত করা হয় সিন্থেটিক উপায়ে। তাছাড়াও এ ওষুধগুলির মধ্যে পড়ে দেহের রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধির ওষুধগুলি: — ভ্যাক্সিন, সিরাম, গামাগ্লোবিউলিন প্রভৃতি।

এ্যান্টিবায়োটিক। আমাদের দেশে এ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুত ও অধ্যয়ন করার বড় কৃতিত্ব প্রাপ্য বিজ্ঞানী জ. ভ. এরমোলিয়েভার। দেহের ভেতর প্রবেশের পর এ্যান্টিবায়োটিকগুলি, জীবাণুগুলির বিকাশ ও তাদের বংশবৃদ্ধির ওপর সক্রিয় প্রভাব বিস্তার করে। বেশীর ভাগ এ্যান্টিবায়োটিক এক একটি বিশেষ জীবাণুর বিরুদ্ধে ফলপ্রসূ কাজ করে, আবার অনেক এ্যান্টিবায়োটিক আছে যেগুলি একসঙ্গে কয়েক রকম জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ

করতে পারে। বর্তমানে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, সিণ্টোমাইসিন, টেট্রাসিক্লিন, নিওমাইসিন সাল্ফেট (কোলিমাইসিন), মোনমাইসিন, এরিথ্রোমাইসিন, সিগমামাইসিন, মর্ফোসিক্লিন, জেণ্টামাইসিন সাল্ফেট (গ্যারামাইসিন), কানামাইসিন, লেভোমাইসেটিন, পাইওপেন, রণ্ডোমাইসিন, প্রভৃতি। এখন তৈরী হয়েছে আধাসিন্থেটিক এ্যাণ্টিবায়োটিক — সেপারিন, এম্পিসিলিন।

এণ্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয় যেমন স্থানীয় ভাবে (এ্যাণ্টিবায়োটিকের সলিউশন রূপে ঘা ধুতে বা ঘা ভিজিয়ে রাখতে, ,অথবা এ্যাণ্টিবায়োটিকের মলম বা ইমাল্সান রূপে ঘা বেঁধে রাখতে), তেমনি সারা শরীরের ওপর ক্রিয়ার জন্য (সেবন করা হয়, চামড়ার তলায় — মাংসপেশী বা রক্তের শিরার ভেতর দিয়ে ইঞ্জেকশন করে)। জীবাণুগুলি খুবই তাড়াতাড়ি এ্যাণ্টিবায়োটিকের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয় ও এ্যাণ্টিবায়োটিকের প্রতি স্পর্শকাতরতা হারায়। এই কারণে এ্যাণ্টিবায়োটিক দিয়ে চিকিৎসা করতে, ব্যবহার করা এ্যাণ্টিবায়োটিকের প্রতি জীবাণুগুলির স্পর্শকাতরতা সংরক্ষিত কি না — তা আগে পরীক্ষা ক'রে নেওয়া হয়। এক এক সময় এ্যাণ্টিবায়োটিক ব্যবহারের পর নানা জটিলতা দেখা দেয়: এলার্জি জনিত কারণে শরীরের কোন স্থান ফুলে যাওয়া, আমবাত দেখা দেওয়া, এমনকি সকের অবস্থা সৃষ্টি হওয়া। বর্তমানে তাই এ্যাণ্টিবায়োটিক চিকিৎসা আরম্ভের আগে এ্যাণ্টিবায়োটিকের প্রতি রোগীর সহনশীলতা পরীক্ষা করে নেওয়া হয়।

ডাক্তারী যন্ত্রপাতি, সেলাই-এর সূতো নির্বীজিত করতেও এ্যাণ্টিবায়োটিকের সলিউশন ব্যবহার করা হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অনুরূপ নির্বীজন ক্রিয়া করা হয় রাসায়নিক স্টেরিলাইজেশনের পর অস্ত্রোপচারের বা রোগীর ওপর ব্যবহারে ঠিক পূর্বে। সাধারণত অনুরূপ সলিউশনে থাকে নানা এ্যাণ্টিবায়োটিক একত্রে (পেনিসিলিন+ স্ট্রেপ্টোমাইসিন + নিওমাইসিন সাল্ফেট প্রভৃতি ১০০০০০০ থেকে ২০০০০০০ ইউনিট এ্যাণ্টিবায়োটিক ২০০ মিলিলিটার ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটারের ভেতর গুলে সে সলিউশন তৈরী হয়)।

এ্যাসেপ্টিক ব্যবস্থা

এ্যাসেপ্টিক ব্যবস্থা হল সেই সব ব্যবস্থাসমূহ, যার কাজ ক্ষতে জীবাণুপাত রোধ করা। একাজ সাধিত হয়, সমস্ত যন্ত্রপাতি যা ক্ষতের সংস্পর্শে আসবে তা জীবাণু মুক্ত ক'রে। অস্ত্রোপচারের স্থান ঢাকার জন্য ব্যবহৃত ন্যাক্‌ড়া, তোয়ালে, অপারেশনের যন্ত্রপাতি, সেলাই-এর সূতো ব্যাণ্ডেজের জন্য ব্যবহৃত জিনিষ-পত্র, গ্লোভস, এপ্রন, শল্যাচিকিৎসকের হাত প্রভৃতি থেকে জীবাণু ও জীবাণুর সুরক্ষিত অণুগুলিকে সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করাকে বলা হয় নির্বীজন ক্রিয়া। এই ক্রিয়া সাধিত হয় নানা উপায়ে: উচ্চ চাপের জল-বাষ্প দিয়ে (অটোক্লেভ করা), শুস্ক তাপ দিয়ে, জল ফুটিয়ে, আগুনে পুড়িয়ে, এ্যাণ্টিসেপ্টিক ও এ্যাণ্টিবায়োটিক সলিউশনে অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রেখে। যথেষ্ট প্রচলিত রেডিওএ্যাকটিভ রশ্মির সাহায্য নির্বীজিত

করা (গামা রশ্মি)। আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি এ কাজে ব্যবহার করা (পারদ — কোয়ার্টজ আলো) হয়। গ্যাসের সাহায্যেও নির্বীজনের কাজ করা যায়।

কোন বস্তুকে নির্বীজিত বলে ধরা হয় যদি তার উপরি-ভাগে ও গভীরে কোন জীবাণু না থাকে, যা বংশবৃদ্ধি করতে পারে। কোন বস্তু স্টেরাইল কি না তা যাচাই করা হয় বিশেষ পুষ্টিসাধক মাধ্যমে তার থেকে নেওয়া পদার্থের ব্যাক্টেরিওলজিকাল কালচার করে।

ক্ষতস্থল ড্রেসিং করার সাজ-সরঞ্জাম ও তার নির্বীজন

অস্ত্রোপচারের সময়, ক্ষত ও তার চারপাশ পরিষ্কার করা ও শুকানোর জন্য, ক্ষত গজ দিয়ে ভরার জন্য, নানা রকমের পটি বাঁধার জন্য যে সমস্ত সাজসরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় সেগুলিকে বলে ড্রেসিং-এর সাজসরঞ্জামের জল শুষে নেওয়ার গুণ (হাইগ্রোস্কোপিক), তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাওয়ার গুণ, স্থিতিস্থাপকতার গুণ ও তাড়াতাড়ি যাতে নির্বীজিত করা যায় — এই সব গুণ থাকা দরকার।

ড্রেসিং সাজসরঞ্জামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় গজ (জালি কাপড়ের টুকরো), তুলো, লিগনিন, গজ-তুলোর কাপড় যা রক্ত, পুঁজ ও অন্যান্য তরল পদার্থ ভালকরে শুষে নিতে পারে। গজ স্থিতিস্থাপক, নরম, ক্ষত নোংরা করেনা এবং এই সব কারণেই গজ হল সেই কাপড় যা থেকে তৈরী করা হয় ব্যাণ্ডেজ। গজের ফালি, গজের পেটি, গজের পোলতে ইত্যাদিও ব্যবহৃত হয়। তুলো — কার্পাস তুলোর আঁস থেকে তৈরী চিকিৎসার কাজে ব্যবহৃত

হয় অধিক জল শুষে নিতে পারে — এমন তুলো (হাইগ্রোস্কোপিক)। ক্ষত ড্রেসিং-এ তুলো পাতা হয় গজের (জালিকাপড়ের) ওপরে যাতে করে বন্ধনীর জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতা বাড়ে ও বাইরের জিনিষ ক্ষতের ওপর ক্রিয়া না করতে পারে। লিগনিন — ঢেউ-খেলানো খুব পাতলা কাগজের পাতা; ব্যবহৃত হয় জল-শোষা তুলোর পরিবর্তে। ড্রেসিং-এর সাজসরঞ্জাম যেমন তৈরি হয় বড় বড় বান্ডিল ও প্যাকেটে নির্বীজিত না করা অবস্থায় (তার থেকে ক্ষত বন্ধনের সাজ সরঞ্জাম কেটে নেওয়া হয় উপযুক্ত পরিমাণে, নির্বীজিত করা হয় চিকিৎসাকর্মীদের দ্বারা নিজেদের কার্যস্থলে) তেমনি নির্বীজিত করা অবস্থায় ভালভাবে আটকানো অয়েল পেপারের ছোট ছোট প্যাকেটে। চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের বাইরে (কাজের জায়গা, মাঠ বা গৃহে) প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের পক্ষে সব চেয়ে সুবিধাজনক নির্বীজিত করা প্যাকেট ব্যবহার করা। বাজারে পাওয়া যায় নির্বীজিত-করা ক্ষত বন্ধনের বিভিন্ন মাপের ব্যাণ্ডেজ ও গজের টুকরো ও আলাদা আলাদা প্যাকেট, যাতে থাকে বিশেষ ব্যাণ্ডেজ। আরও থাকে পৃথক প্যাকেট যাতে নানা এণ্টিসেপ্টিকে (আয়োডোফর্ম, ব্রিলিয়াণ্ট গ্রীণ, সিণ্টোমাইসিন প্রভৃতি) মাখানো গজ, রক্তের জমাট বাঁধা ত্বরান্বীত করার গজ (যেমন হেমোষ্ট্যাটিক গজ)।

ফ্যাক্টরী ও অন্যান্য কাজের প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক সাহায্য দান করে চিকিৎসাকেন্দ্র বা স্যানিটারী পোষ্টের চিকিৎসা-কর্মীরা অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা, যারা প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের ট্রেনিং পেয়েছে ও যাদের হেফাজতে আছে প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধপত্র, স্ট্রেচার স্প্লিন্ট।
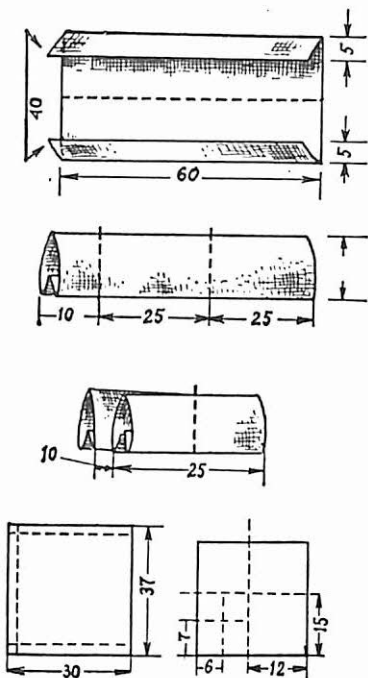
চিত্র — 1: বন্ধনী বাঁধার সামগ্রী প্রস্তুত করা
a — বড় মাপের গজ; b — মাঝারী মাপে কর্তিত গজ

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য কেন্দ্রে বা স্যানিটরী কেন্দ্রে থাকা উচিত উপযুক্ত পরিমাণ ড্রেসিং সাজসরঞ্জাম। জমা রাখা ও প্রয়োজনমত ব্যবহারের পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক হল আগে থেকে তৈরী করে রাখা নির্বীজিত-করা ব্যাণ্ডেজ, গজ ও তুলোর প্রচলিত প্যাকেট। এতে তাড়াতাড়ি ও নির্ভরযোগ্য উপায়ে ক্ষত বিষাক্ত হওয়া রোধ করা যায়।

নির্বীজিত-করা ড্রেসিং-এর সরঞ্জাম না থাকলে তা তৈরী করা হয় অনির্বীজিত গজের বড় বড় টুকরো থেকে (চিত্র — ১)। গজের রুমালের মত টুকরো ও পটিগুলিকে ১০টি ১০টি করে বেঁধে রাখা হয় ও নির্বীজিত করা হয় অটোক্লেভে। নির্বীজত করা ড্রেসিং-এর সরঞ্জাম জমা রাখা হয় বিক্সে। প্রচলিত এসব বাঁধা প্যাকেটের পরিবর্তে ইচ্ছামত ড্রেসিং সরঞ্জামের প্যাকেটও তৈরী রাখা যায়। তার জন্য নেওয়া হয় গজের টুকরো ৬×৯ সেণ্টিমিটার মাপের, তাকে পেতে তার মাঝখানে প্রায় তার ধারগুলি পর্যন্ত সমান করে পাতা হয় এক পড়ত তুলো, তার পর তাকে দুভাজে ভাজ করা হয়; গজ থাকবে বাইরের দিকে ও রাখা হয় তাকে ১৬×১৬ সেণ্টিমিটার মাপের আয়েল পেপারে (তৈল-কাগজে) মুড়ে। আলাদা আলাদা প্যাকেটগুলিকে বিশেষ বাক্সে রেখে তা নির্বীজিত করা হয়।

গজের টুকরো, তোয়ালে প্রভৃতি কাপড়, ড্রেসিং-এর সরঞ্জাম বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নির্বীজিত করা হয় অটোক্লেভে, উচ্চ চাপের জলীয় বাস্পে। তাই এই উপায়ে নির্বীজিত করার নামকরণ হয়েছে অটোক্লেভ করা।

কাপড়ের জিনিষপত্র ও ড্রেসিং-এর সাজসরঞ্জাম সাধারণত নির্বীজিত করা ও রক্ষিত করা হয় ধাতব ড্রামের মত বাক্সে যাকে যাকে বলা হয় বিক্স। বিক্সের পাশের দেওয়ালে থাকে কতগুলি ফুটো যার ভেতর দিয়ে জলীয় বাস্প ভেতরে ঢুকতে পারে। নির্বীজন ক্রিয়া শেষ হয়ে যাবার পর বিক্সের ধাতব পাত ঘুরিয়ে সেই ফুটোগুলি বন্ধ করা হয়। বিক্সের ফুটোগুলি যদি খোলা থাকে তবে বলতে হবে, ভেতরের সামগ্রী জীবাণুবিহীন নয়।

ড্রেসিং-এর সরঞ্জাম মোটা কাপড়ের থলের ভেতর রেখেও নির্বীজিত করা যায়।

অটোক্লেভ করার পর ভেতরের সামগ্রীগুলি কতখানি জীবাণুবিহীন হয়েছে তা পরীক্ষা করা হয় এক বিশেষ পরীক্ষার সাহায্যে। বিক্সের ভেতরকার সামগ্রীগুলির সঙ্গে একটি টেস্টটিউবে রাখা হয় গন্ধক, এণ্টিপাইরিন, এমিডোপাইরিন অথবা অন্য জিনিষের গুঁড়ো যা গলে যায় ১২০° সেণ্টিগ্রেডের কাছাকাছি উত্তাপে। ১২০° থেকে ১৩০° সে. উত্তাপে ঐ জিনিষগুলি একেবারে গলে যায়। যদি সেগুলি না গলে তা হলে বিক্সের ভেতরকার সামগ্রীকে নির্বীজিত হিসেবে ধরা যায় না। এক এক সময় ব্যবহার করা হয় মিকুলিচের উপায়। এক টুকরো ফিল্টার কাগজে পেন্সিল দিয়ে লেখা হয় "নির্বীজিত", তারপর কাগজের টুকরোটিতে মাখানো হয় স্টার্চের মাড় ও ডোবানো হয় জলে-গোলা আয়োডিন সলিউশনে — কাগজটি তাতে গাঢ় নীল রঙ ধারণ করে ও লেখা দেখা যায় না। ঐ কাগজের টুকরোটিকে তখন ঐ ভাবেই নির্বীজন করার সামগ্রীর সঙ্গে বিক্সে ভরা হয়। ১১০° সেটিগ্রেডের অধিক উত্তাপে স্টার্চ ডেক্সটিনে পরিবর্তিত হয়, যার ফলে নীল রঙ অন্তর্হিত হয় ও ফুটে ওঠে লেখা "নির্বীজিত"।

এক এক সময় জীবাণুবিহীনতা পরীক্ষা করা হয় জৈবিক পরীক্ষার সাহায্যে। এক টুকরো সিল্কের সুতো ভেজানো হয় এক রকম সলিউশনে, যাতে যোগ করা হয়েছে কিছু সংখ্যক জীবাণু (স্পোর করতে পারে — এমন জীবাণু)। তারপর সুতোটিকে স্টেরাইল কাগজে মোড়া হয়। অটোক্লেভ করার পর, সেই সিল্কের সুতোটিকে

নিউট্রিয়েন্ট মিডিয়ামে কালচার করা হয়। তাতে যদি জীবাণু না জন্মায়, তাতে বোঝা যায় যে নির্বীজন ক্রিয়া ফলপ্রসূ হয়েছে।

নির্বীজিত করা কাপড়ের জিনিষগুলি শুষ্ক হতেই হবে, অন্যথায় তা নির্বীজিত কি না তা সন্দেহজনক।

জরুরী কেসে যদি নির্বীজিত করা গজ বা ব্যাণ্ডেজ হাতের কাছে না থাকে তা হলে ড্রেসিং-এর জন্য যে কোন পরিষ্কার নেকড়া বা কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করা চলে কিন্তু ক্ষতের ওপর পরিষ্কার গজ পাতার আগে তাকে গরম ইস্তিরী দিয়ে ইস্ত্রি করে নেওয়া দরকার।

যদি ঐ ভাবেও ক্ষত ড্রেসিং-এর সামগ্রী জীবাণুবিহীন করার সুযোগ না থাকে তাহলে অনির্বীজিত গজ বা অন্য জল শুষে নেওয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন যে কোন কাপড় নেকড়ার মত ড্রেসিং সামগ্রী এথাক্রিডিন ল্যাকটেটে (রিভানলে), হাল্কা পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গনেট সলিউশনে, বুরভের সলিউশনে (২ চা-চামচ, এক গ্লাস ফুটানো জলে) অথবা বোরিক অম্ল সলিউশনে (১/৩ চা-চামচ, ১ গ্লাস ফুটানো জলে) ভিজিয়ে নিয়ে ব্যবহার করা দরকার। নেহাত দরকার পড়লে এর কোন একটা সলিউশনে ভেজানো ড্রেসিং সামগ্রী ক্ষতের ওপর পেতে ব্যবহার করা চলে।

শল্যচিকিৎসার যন্ত্রপাতি ও তার নির্বীজন ক্রিয়া

আধুনিক শল্য চিকিৎসার অস্ত্র ও যন্ত্রপাতি বিভিন্ন ধরনের। অস্ত্রগুলির সাহায্যে কলা ছেদন করা হয়,

রক্তপাত বন্ধ করা হয়, কলা ধরে রাখা হয় অস্ত্রোপচারের জন্য সুবিধাজনক অবস্থায়, ক্ষতের ফাঁক প্রসারিত করা হয়, কর্তিত কলা সেলাই করা হয়, আরও কত কি কাজ চলে। কলা ছেদন করার জন্য ব্যবহৃত হয় ছুরি, স্ক্যাল্‌পেল, কাঁচি; নরম কলা ধরা ও ধরে রাখার জন্য শল্য চিকিৎসার চিম্‌টে ও নানা রকমের সাঁড়াশী; রক্ত বন্ধের জন্য নানা রকমের রক্ত বন্ধ করার ফরসেপ্‌স, নানা রকমের সাঁড়াশী; নানা রকমের সূঁচ বা ধাতু-ক্লিপের সাহায্যে সেলাই করে কলা যুক্ত করা হয়।

ক্ষত ড্রেসিং করার কাজে ব্যবহৃত হয় চিমটে (অ্যানাটমির চিমটে ও শল্যচিকিৎসার চিমটে), কাঁচি, ধাতব শলাকা (নালী-কাটা শলাকা, শলাকার অগ্রভাগে বুটি), আঁকশি (হুক) যার সাহায্যে ক্ষত ফাঁক করা হয়, নানা রকমের রক্ত বন্ধ করার ফরসেপ্‌স, লম্বা গজ ধরার ফরসেপস যাকে বলে কর্নসাঙ্গ। ক্ষত ড্রেসিং করা হয় নির্বীজিত অস্ত্রপাতির সাহায্যে। ক্ষত ড্রেসিং একদিকে যেমন, ক্ষতকে জীবাণু প্রবেশের হাত থেকে রক্ষা করে অন্যদিকে তেমনি, যে ড্রেসিং করছে তার হাত নোংরা হতে দেয় না বিশেষ করে ক্ষত যদি পুঁজযুক্ত হয়। ক্ষত পরিষ্কার বা পুঁজযুক্ত যাই হোক না কেন, সকল ক্ষেত্রেই ড্রেসিং করতে ব্যবহার করা হয় নির্বীজিত অস্ত্র। প্রত্যেকটি ড্রেসিং-এর পর সে অস্ত্রগুলিকে ধুয়ে আবার নির্বীজিত করতে হয়। পুঁজযুক্ত ঘা ড্রেসিং করার পর ব্যবহার করা অস্ত্রগুলিকে নির্বীজিত করা হয় আলাদা ভাবে।

ধাতব অস্ত্রকে নির্বীজিত করা যায় আগুনের স্ফুলিঙ্গে উত্তপ্ত করে ও শুষ্ক গরমে, বিশেষ ভাবে শুষ্ক গরমের

আলমারিতে রেখে। এই কাজে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত বৈদ্যুতিক উপায়ে গরম করার ব্যবস্থাযুক্ত আলমারি যার ভেতর ১০—১৫ মিনিটের মধ্যে তাপমাত্রা ওঠে ১৪০°—১৫০° সেণ্টিগ্রেডে। এই উত্তাপে যন্ত্রপাতি সম্পূর্ণ জীবাণুবিহীন হয় ২০ থেকে ৩০ মিনিটের মধ্যে।

নির্বীজিত করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল গরম জলে ফোটানো। জলে ফুটিয়ে নির্বীজিত করা যায় যে কোন পাত্রে ও যে কোন আগুনের উত্তাপে। পাওয়া যায় বিভিন্ন রকমের নির্বীজক — পকেটে করে নিয়ে যাওয়া যায়, এমন জাল দেওয়ার পাত্র থেকে হাসপাতালে ব্যবহৃত হয় এমন পাত্র পর্যন্ত।

জলে ফুটিয়ে নির্বীজিত করা যায় ধাতব ডাক্তারী যন্ত্রপাতি; ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ ও অন্যান্য কাঁচের জিনিষ; রবারের হাতের গ্লোভস, ক্যাথিটার, নল; কোন কোন প্লাষ্টিকের যন্ত্রপাতি; বিশেষ প্রয়োজনে ক্ষত ড্রেসিং-এর জিনিষপত্র। যন্ত্রপাতি নির্বীজিত করা হয় সেগুলিকে নির্বীজিত জলে ফুটিয়ে। জল সহজেই নির্বীজিত করা চলে, তাকে ২ বার (৬ ঘণ্টার ব্যবধানে) ৩০ মিনিট ধরে ফুটিয়ে। ঐ ভাবে বার বার ফোটানোর ফলে মরে যায় এমনকি সবচেয়ে সহিষ্ণু জীবাণুর স্পোর (আত্মরক্ষাকৃত জীবাণু)। জলে মেশানো হয় ক্ষার, যতক্ষণ পর্যন্ত না হচ্ছে ২% সলিউশন। ক্ষারযুক্ত জল নির্বীজন ক্রিয়া দ্রুততর করে, অম্লজান মিশ্রিত হওয়া বন্ধ করে ও অস্ত্রপাতিতে মরচে ধরে না। নিকেল-করা যন্ত্রপাতি নির্বীজিত করতে সেগুলিকে ছাড়তে হয় ফুটন্ত জলে আর ঠাণ্ডা করতে হয় নির্বীজিত অয়েলক্লথ পাতা টেবিলে। কাঁচের জিনিষপত্র

(সিরিঞ্জ, টেষ্টটিউব, বয়াম, গেলাস) কখনো গরম জলে ছাড়তে নেই কেননা সেগুলি ফেটে যেতে পারে।

জরুরী কেসে ধাতব যন্ত্রপাতি ত্বরান্বীত উপায়ে জীবাণুমুক্ত করা সম্ভব আগুনে পুড়িয়ে নিয়ে (আগুনের স্ফুলিঙ্গে পোড়ানো)। আগুনে পুড়িয়ে নেওয়ার কাজ সমাধা করা হয় জলন্ত স্পিরিট দিয়ে। অস্ত্রপাতিকে একটি গামলায় রাখা হয়, তারপর তাতে স্পিরিট ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। এই ভাবে জ্বালিয়ে মোটামুটি ভাবে নির্বীজিত করা চলে, তবে নির্ভরযোগ্য নির্বীজন এতে হয় না।

সিরিঞ্জ, তার নির্বীজন ও ব্যবহার

পাকবহির্গত পথে (অর্থাৎ চামড়ার তলা দিয়ে, মাংস-পেশীর ভেতর দিয়ে বা রক্তের শিরা প্রভৃতির ভেতর দিয়ে) দেহে বিভিন্ন ওষুধের সলিউশন প্রবেশ করাতে হয়, তা করা হয় নানা রকম সিরিঞ্জের সাহায্যে। সিরিঞ্জে থাকে তার সিলিন্ডার (যা এক দিকে শেষ হয় শঙ্কুর মত ছুঁচোল ভাবে, যেখানে তাকে সূচের সঙ্গে যুক্ত করা হয়) আর পিষ্টন (চাপদন্ড), যা সিলিন্ডারের ভেতর পরানো হয়। সিরিঞ্জ হয় নানা মাপের (১ থেকে ২৫০ বা ৫০০ মিলিলিটার মাপের), নানা উপাদানে তৈরী (কাঁচের, ধাতুর, প্লাষ্টিকের বা কাঁচ ও ধাতুর এক সঙ্গে তৈরী)। সিরিঞ্জের শঙ্কুও হয় নানা মাপের — যেমন, লুয়েরে সিরিঞ্জের সূঁচ, "রেকর্ড" সিরিঞ্জে আটকানো যায় না। প্রত্যেক ইঞ্জেক-শনের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন নির্বীজিত সিরিঞ্জ।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সিরিঞ্জ জীবাণুবিহীন করা হয় জলে ফুটিয়ে। সিরিঞ্জ ফোটাতে হয় তার অংশগুলিকে খুলে আলাদা করে, গজের ভেতর জড়িয়ে। নির্বীজকে ঠাণ্ডা জলে রেখে তারপর তা ফোটাতে আরম্ভ করতে হয়। তা না হলে তা ফেটে যায়। বিশেষ সাবধাণে নির্বীজিত করতে হয় মিশ্র সিরিঞ্জগুলিকে, কেননা ধাতু ও কাঁচ গরমে একই রকম প্রসারিত হয় না। জল ফুটতে শুরু করলে, সিরিঞ্জগুলিকে ৩০ মিনিট ধরে ফোটাতে হয়। তারপর তোলার সময় জল থেকে সিরিঞ্জ তুলতে হয় নির্বীজিত চিমটে বা কর্নসাঙ্গের সাহায্যে।

কাঁচের "লুয়ের" সিরিঞ্জ ও উত্তাপসহনশীল মিশ্র সিরিঞ্জগুলিকে (যার গায়ে লেখা থাকে ২০০° সেণ্টিগ্রেড) অটোক্লেভ করে বা শুষ্ক তাপের আলমারিতে নির্বীজিত করা যায়।

ইঞ্জেকশন দেওয়ার কায়দা। ইঞ্জেকশনের জন্য সিরিঞ্জ ফিট করতে হয় যখন তার অংশগুলি ফুটিয়ে নেওয়ার পর জুড়িয়ে গেছে। সিরিঞ্জ ফিট করার আগে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নির্বীজিত গজ দিয়ে মুছে স্পিরিট মাখিয়ে হাত এ কাজের জন্য প্রস্তুত করা প্রয়োজন। তারপর সিরিঞ্জ ফিট করে প্রয়োজনীয় সূঁচ বেছে নিতে হয় — চামড়ার তলায় ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য দরকার ছোট সূঁচ, মাংশপেশীতে ইঞ্জেকশন দেবার জন্য — লম্বা সূঁচ (৪০ মিলিমিটার)। তারপর সূঁচের ভেতর দিয়ে টেনে সিরিঞ্জে ওষুধ ভরে নিয়ে তাকে ওপর-মুখি করে ধরে সিরিঞ্জ ও সূঁচ থেকে সমস্ত হাওয়া ঠেলে বের করে দিতে হয় (চিত্র — ২)।

চিত্র — 2: সিরিঞ্জ ও সূঁচ থেকে হাওয়া বের করে দেওয়া

ইঞ্জেকশন দেওয়ার জায়গার চামড়ায় স্পিরিট বা টিংচার আয়োডিন মাখিয়ে বাঁ হাত দিয়ে ইঞ্জেকশনের জায়গার চামড়া টেনে ভাঁজ করে ধরে, ডান হাত দিয়ে দ্রুত ও সবলে চামড়ায় সূঁচ ফোটাতে হয়। মাংসপেশীর ভেতর ইঞ্জেকশন দিতে সূঁচ ফোটানো হয় লম্বভাবে আর চামড়ার তলায় ইঞ্জেকশন দিতে হয় তির্যকভাবে (চিত্র — ৩)। তারপর বিশেষ অবস্থায় সিরিঞ্জটিকে স্থির করে ধরে বেশ

চিত্র — 3: চামড়ার তলায় ইঞ্জেকশন দেওয়া

তাড়াতাড়ি অথচ মোলায়েম ভাবে ওষ্ধ (সলিউশন) ঠেলে দিতে হয় ভেতরে। তারপর স্ূচ টেনে বের করে নিয়ে স্পিরিটে ভেজানো তুলো দিয়ে কিছুক্ষণ সময় ধরে মালিশ করে দিতে হয় ইঞ্জেকশনের জায়গাটি।

ব্যবহারের পর সিরিঞ্জ খুলে তার অংশগুলি কলের জলে ধুয়ে সেগুলিকে ১৫ মিনিট ধরে রাখতে হয় ৫০° সেণ্টিগ্রেড উত্তাপের গরম সলিউশনে, যাতে থাকবে ০·৫% হাইড্রোজেন পেরক্সাইড + ধৌত করার সাবান-গুঁড়ো। এক লিটার পরিমাণ উক্ত সলিউশন তৈরী করতে, নিতে হয় ৯৭৫ মিলিলিটার ফুটন্ত জল, ২০ মিলিলিটার ৩৩% হাইড্রোজেন পেরক্সাইড সলিউশন, ৫ গ্রাম সাবান-গুঁড়ো। সলিউশন থেকে বের করে নেওয়া সিরিঞ্জকে তারপর পরিশ্রুত জলে (ডিষ্টিল্ড ওয়াটারে) ধুতে হয়। এই ভাবে তৈরী করা সিরিঞ্জকে এর পর পূর্বোল্লিখিত উপায়-গুলির কোন একটি উপায়ে নির্বীজিত করা হয়।

এই ভাবে পুঙখানুপুঙখরূপে সিরিঞ্জ পরিষ্কার করার কারণ হল এই যে, সিরিঞ্জ ও স্ূচের ভেতর দিয়ে বহু কেসে বিপদজনক ভাইরাসের অসুখ সংক্রামিত হতে দেখা যায়, বিশেষ করে সংক্রামক হেপাটাটিস — যাকে বলে বোতকিনের অসুখ।

ইঞ্জেকশন দেওয়ার ওষুধ-সলিউশন নির্বীজিত করা যায় অটোক্লেভ করে ও তাকে ফুটিয়ে। সে সলিউশনকে নির্বীজিত করা যায় সেই পাত্রেই, যার ভেতর তা রক্ষিত হয়। সলিউশন-ভরা বোতল ও শিশিগুলির ছিপি খুলে সেগুলিকে ও ছিপিগুলিকে রাখা হয় অটোক্লেভের ভেতর ও ৩০ মিনিট ধরে তাতে নির্বীজিত করা হয় ২ এটমসফিয়ার চাপে।

নির্বীজিত করার পর শিশি ও বোতলগুলির ছিপি আটকে সেগুলিকে গলা পর্যন্ত ট্রেসিং পেপার দিয়ে মুড়িয়ে সুতো দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়।

ফুটিয়ে নির্বীজিত করতে ব্যবহৃত হয় বারে বারে ফোটানোর উপায়টি। সলিউশনগুলিকে ৩০ মিনিট ধরে পাত্রে ফোটানো হয়, ৬ ঘণ্ট পর তাকে আবার ৩০ মিনিট ধরে ফুটিয়ে ছিপি বন্ধ করা হয়। সংরক্ষণ করা চলে ঐ সলিউশনগুলিকে মাত্র ১ থেকে ২ দিন পর্যন্ত।

হাত ও হাতের গ্লোভসের নির্বীজন

হাত, এমনকি পরিষ্কার হাতে নখের জায়গায় ও চাড়ির ভেতর অনেক জীবাণু থাকে, যেগুলি চামড়ার রন্ধ্রের ভেতর দিয়ে, ঘামের ও চর্বিগ্রন্থির ভেতর দিয়ে গভীরে ঢুকে থাকতে পারে। তাই যাতে হাত থেকে রোগীর ক্ষতে জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে সেই জন্য যে কোন অস্ত্রোপচারের আগে চিকিৎসকের হাত ভাল করে তৈরী করে নেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয় ও ছোট করে নখ কাটা দরকার।

হাত প্রস্তুত করার জন্য প্রচলিত ভাল করে ঘষে হাত পরিষ্কার করা, এণ্টিসেপ্টিক সলিউশনে হাত ধোয়া ও চামড়া শক্ত করা। চামড়া শক্ত করার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় স্পিরিট। স্পিরিট চামড়া শক্ত ক'রে চামড়ার রন্ধ্রগুলির মুখ বন্ধ করে ও সেই উপায়ে রোধ করে হাতের আপনা থেকে জীবাণুদুষ্ট হওয়ার পথ।

হাত প্রস্তুত করার অনেক উপায় আছে:

স্পাসকুকংস্কি-কচোর্গনের উপায় — ময়লা হাত (হস্ত ও পুরোবাহু) কলের জলের ধারায় ভাল করে সাবান দিয়ে ধুতে হয়। তাতে হাতের সাধারণ ময়লা দূর হয়। হাত যদি পরিষ্কার থাকে তা হলে আর আগে ওভাবে হাত ধোয়ার দরকার পড়ে না। হাত প্রস্তুতের মূল কাজটা করা হয় দুটি এনামেলের গামলায়, যাতে রাখা হয় ০·৫% গরম এমোনিয়া সলিউশন (Sol. Ammoni Caustici)। প্রত্যেকটি গামলায় ২ লিটার ফোটানো জলে যোগ করা হয় ১০ মিলিলিটার কষ্টিক এমোনিয়া। হাত ধোয়া হয় নির্বীজিত গজের টুকরোর সাহায্যে ঘষে ঘষে। ঘষতে হয় তাড়াতাড়ি ও জোরে জোরে তবে বেশীর ভাগ সময়েই হাতকে সলিউশনে ডুবিয়ে রাখতে হয়। প্রথম গামলায় বিশেষ যত্ন করে ধুতে হয় পুরোবাহু, চাড়ি, হাতের পাতা আর দ্বিতীয় গামলায় বিশেষ করে ধুতে হয় হাতের পাতা ও হাতের কব্জি। প্রতিটি গামলায় হাত এই ভাবে ধুতে হয় ৩ মিনিট ধরে। তারপর ভাল করে হাত মুছতে হয় নির্বীজিত তোয়ালে, গজের টুকরোর সাহায্যে। তারপর দুই শুকনো হাতে (হাতের পাতা, হাতের কব্জি) দুবার ২·৫ মিনিট ধরে ৯৬% ইথাইল এলকোহল মাখাতে হয়।

এই উপায়ে ডিসইনফেক্ট করে হাত প্রস্তুত করাতে হাতের চামড়ার কোনই ক্ষতি হয় না। উপায়টি যে কোন অবস্থায় হাত পরিষ্কার করার জন্য যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য ও কার্যকর।

ফিউরব্রিঙ্গের'র উপায়। এতে লোমযুক্ত দুইটি ব্রাশের সাহায্যে ১০ মিনিট ধরে সাবান জলে হাত ঘষে কলের উষ্ণ জলের ধারায় তা ধুয়ে ফেলতে হয়। তারপর নির্বীজিত গজের সাহায্যে হাত মুছে তিন মিনিট ধরে তাতে লাগাতে

হয় ৭০% ইথাইল এলকোহল ও ১:১০০০ ঘনমাত্রার সনুলেমা সলিউশন। নখে মাখানো হয় টিংচার আয়োডিন।

পারফর্মিক অম্লের সলিউশনে ডুবিয়ে রেখে হাত নির্বীজিত করার উপায়। কলের জলের ধারায় সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নির্বীজিত গজের সাহায্যে তা মুছে হাত ডুবিয়ে রাখতে হয় উল্লিখিত সলিউশনে ১ মিনিট ধরে। তারপর হাত মুছে ফেলতে হয় নির্বীজিত গজের সাহায্যে। নির্বীজিত করার এই সলিউশন তৈরী করতে হয় ব্যবহারের ১—১·৫ ঘণ্টা আগে। ব্যবহৃত হয় ২·৪% সলিউশন। এক লিটার সলিউশন প্রস্তুত করতে নেওয়া হয় ১৭ সি. সি. ৩৩% হাইড্রোজেন পেরক্সাইড সলিউশন ও ৭ সি. সি. ১০০% ফর্মিক অম্ল। তারপর সেদুটিকে মিশিয়ে ১ ঘণ্টা ধরে তাকে রাখতে হয় রেফ্রিজারেটরে। তারপর তাতে ডিস্টিল্‌ড ওয়াটার বা ফুটানো জল ঢালা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত এই মিশ্রণের পরিমাণ ১ লি. না হচ্ছে।

সেরিগেলের সাহায্যে হাত নির্বীজিত করা। সেরিগেল হল রঙবিহীন, আঠালো, শক্তিশালী জীবাণুনাশক তরল পদার্থ যা হাওয়ায় থাকলে তাড়াতাড়ি জমে যায়। হাত নির্বীজিত করার জন্য সেরিগেল ব্যবহার করলে হাতের ওপর পড়ে এক পাতলা স্তর, হাত যেন জীবাণুবিহীন গ্লোভ্‌স-পরা। ব্যবহারের উপায়: শুক্‌নো হাতের তালুতে ঢালা হয় ৫ সি. সি. সেরিগেলের সলিউশন এবং ৮ থেকে ১০ মিনিট পর্যন্ত তা উৎসাহ সহকারে ঘষে ঘষে এমনভাবে হাতে মাখতে হয় যাতে সে সলিউশন ঢেকে ফেলে আঙ্গুল, হাত ও হাতের কব্জির গোটা উপরিভাগ। এর পর হাত শুকাতে হয় ২—৩ মিনিট ধরে এমনভাবে যাতে এক

আঙ্গুল অন্য আঙ্গুলের সাথে লেগে না থাকে। স্পিরিটে ভেজানো গজের টুকরো দিয়ে এই স্তর (গ্লোভ্‌স) হাত থেকে সহজেই ধুয়ে ফেলা যায়। শল্যচিকিৎসায় ব্যবহৃত হাতের গ্লোভ্‌স জীবাণুবিহীনতা বা ডিসইনফেকশনের নির্ভরশীলতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করে কিন্তু তাই বলে তা আগে হাত নির্বীজিত করে নেয়ার আবশ্যকতা দূর করেনা।

গ্লোভ্‌সেরও যথেষ্ট যত্ন করতে হয়: অস্ত্রোপচারের পর সেগুলিকে ভাল করে ধুতে হয় ও একই সঙ্গে পরখ করতে হয় তাতে ফুটো আছে কিনা, তার পর সেগুলিকে শুকোতে হয় ও তার ভেতর পাউডার ছিটাতে হয়। গ্লোভ্‌সে সামান্য ফুটো থাকলে আঠা দিয়ে তা আগে আট্‌কে নেওয়া দরকার। গ্লোভ্‌স নির্বীজিত করা হয় সেগুলিকে অটোক্লেভ করে বা জলে ফুটিয়ে। অটোক্লেভ করতে প্রতিটি গ্লোভ্‌সকে, আগে তার ভেতরে ও বাইরে পাউডার ছিটিয়ে নিয়ে গজ দিয়ে মুড়ে বিক্সের ভেতর পেতে রাখতে হয় এমন ভাবে যাতে গ্লোভ্‌স বিক্সের দেওয়ালের সঙ্গে সোজাসুজি সংস্পর্শে না আসে বা একটি গ্লোভ্‌সের সঙ্গে আর একটি গ্লোভ্‌সের ছোঁয়া না লাগে। এর জন্য বিক্সের তলদেশে পেতে নেওয়া হয় তোয়ালে বা কতগুলি গজ কাপড়ের স্তর। অটোক্লেভ করার পর গ্লোভ্‌সগুলিকে ঐ বিক্সেই জমা রাখা হয়। জলের ভেতর ফুটিয়ে গ্লোভ্‌স নির্বীজিত করতে তা করা হয় (সোডা বিহীন) জলে তাকে ১৫—২০ মিনিট ধরে ফুটিয়ে। তারপর সে গ্লোভ্‌সকে নির্বীজিত তোয়ালে দিয়ে ভাল করে মুছে তাতে ছিটানো হয় নির্বীজিত ট্যাল্ক পাউডার।

জলে না ফুটিয়েও, ঠাণ্ডা অবস্থাতেই গ্লোভ্‌স নির্বীজিত করা চলে: তার জন্য সেগুলিকে ডুবিয়ে রাখা হয় ২% ক্লোরামিন B সলিউশনে ১৫-২০ মিনিট ধরে বা ১-১·৫ ঘণ্টা ধরে সুলেমা সলিউশনে, তারপর সেগুলিকে ধোয়া হয় আইসোটনিক স্যালাইন সলিউশনে, শুকানো হয়, তাতে ট্যাল্ক পাউডার ছিটানো হয় ও জমা করে রাখা হয় নির্বীজিত করা বিক্সে।

জরুরী কেসে হাত নির্বীজিত করার ত্বরান্বীত উপায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান করতে উল্লিখিত কোন না কোন একটি উপায় অবলম্বন করে হাত যতদূর সম্ভব বীজাণু বিহীন করে নিতে হয় বিশেষ করে যদি আঘাতের ফলে দুর্ঘটনাগ্রস্তর চামড়া বা শ্লৈষ্মিক আবরণীর অটুটতা নষ্ট হয় (যা দেখা যায় চামড়া ছড়ে গেলে, পুড়ে গেলে, তুষারাঘাত হলে)। জরুরী কেসে হাত নির্বীজিত করা যায় আরও সহজ উপায়ে। প্রথমে সাবান দিয়ে কলের ধারাজলে হাত ধুয়ে পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে হাত মুছে তা শুকিয়ে নিতে হয়, তারপর হাতে এক টুকরো তুলো বা ব্যাণ্ডেজ নিয়ে, তা দলা করে, তাতে ৫ থেকে ৭ সি. সি. ট্যান করার বা নির্বীজিত করার সলিউশন ঢেলে, তাই দিয়ে হাত ও হাতের আঙুলগুলি এক থেকে দুই মিনিট ধরে ভাল করে ঘষে নিতে হয়।

চামড়া ট্যান করার জন্য ব্যবহার করা চলে ইথাইল এল-কোহল, ৫% টিংচার আয়োডিন, ৫% ট্যানিন সলিউশন; চামড়া ডিসইনফেক্ট করার জন্য — ৫% ফিনল (কার্বলিক

এসিড), মারকিউরিক ক্লোরাইড (সুলেমা) ১:১০০০ সলিউশন, ১:৫০০০ ডায়োসাইড সলিউশন, ০·৫% ক্লোরামিনB সলিউশন, ১% ডগ্মিন সলিউশন। হাতের কাছে যদি নির্বীজিত হাতের গ্লোভ্স থাকে, তাহলে হাত নির্বীজিত না করে সেটা হাতে পরেই কাজ করা চলে। চিকিৎসা সাহায্য দানের সময় হাত যদি নোংরা হয় তাহলে হাত দুটিকে তখন ঐ সব জীবাণুনাশক দিয়ে পুনর্বার ঘষে নির্বীজিত করে নিতে হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বন্ধনী বাঁধার কায়দা (ডেসমার্জি)

দেহের উপরিভাগে ক্ষত প্রভৃতি ঢেকে রাখার সামগ্রীগুলিকে বিশেষ ভাবে আটকে রাখার প্রক্রিয়ার নামই হল বন্ধনীবাঁধা। সবচেয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বন্ধনী বাঁধা হয় ক্ষতস্থান ঢাকা, তাতে জীবাণু প্রবেশ নিবারণ করা ও তা থেকে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য। ক্ষতস্থান বাঁধার প্রক্রিয়াকে বলে বন্ধনীবাঁধা বা ড্রেসিং করা।

চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভাগ, যা বিভিন্ন ধরনের বন্ধনী, তা বাঁধার কায়দা ও কি উদ্দেশ্যে সেসব বন্ধনী বাঁধা হয় — এই সব তথ্য অধ্যয়ন করে তাকে বলা হয় "ডেস্মার্জি"।

বন্ধনী বাঁধার উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর ক'রে বন্ধনীকে কয়েক ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন: — ক্ষতের রক্ষণীবন্ধনী, যা ক্ষতেকে শুষ্ক হয়ে যাওয়া বা তার ওপর চোট লাগার হাত থেকে রক্ষা করে; চাপ সৃষ্টিকারী বন্ধনী, যা দেহের কোন এক অঞ্চলে সর্বক্ষণের জন্য চাপ সৃষ্টি ক'রে রাখে (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এ বন্ধনী ব্যবহৃত হয় রক্তপাত বন্ধ করার জন্য); অনড় করার বন্ধনী, যা দেহের কোন জখম হওয়া অঞ্চলকে তার প্রয়োজনীয় নিশ্চলতা দান করে; টান লাগানো বন্ধনী, যা দেহের কোন অংশের ওপর

সর্বক্ষণের জন্য টান সৃষ্টি করে রাখে; অকুশন বা শক্ত করে দেহের কোন গহ্বরকে বন্ধ করে রাখার বন্ধনী; সংশোধনী বন্ধনী যা দেহের কোন অংশের পরিবর্তিত অবস্থান থেকে সঠিক অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে রোগীর চিকিৎসায় বিশেষ করে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানে বন্ধনীর সার্থকতা খুবই বড় ও বহুমুখী। বন্ধনীর জন্য ব্যবহৃত সামগ্রীর চরিত্র অনুযায়ী বন্ধনীকে ভাগ করা যায় নরম ও কঠিন বন্ধনীতে। নরম বন্ধনীর মধ্যে পড়ে সেই সব বন্ধনী যাতে ব্যবহার করা হয় গজব্যান্ডেজ, স্থিতিস্থাপক ব্যান্ডেজ, টিউবের মত জালি ব্যান্ডেজ, কাপড় প্রভৃতি। কঠিন বন্ধনী বাঁধতে প্রয়োগ করা হয় শক্ত দ্রব্য (কাঠ বা ধাতুর স্প্লিণ্ট) বা এমন দ্রব্য যা পরে শক্ত হয়ে ওঠে যেমন জিপসাম প্লাষ্টার, বিশেষ ধরনের প্লাস্‌মাস-স্টার্চ, আঠা। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে ব্যবহৃত হয় সব রকমের নরম বন্ধনী, আর কঠিন বন্ধনীর ভেতর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় স্প্লিণ্টের সাহায্যে ব্যান্ডেজ করা।

নরম বন্ধনী হয় খুবই বিভিন্ন ধরনের। কিন্তু সবচেয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বন্ধনী বাঁধা হয় ক্ষতের ওপর বা রুগ্ন স্থানের ওপর বন্ধনীর সামগ্রী (গজ, তুলো) ও নানা ওষুধ পত্র স্থাপন ক'রে তা সে জায়গায় ধরে রাখবার জন্য।

বন্ধনী বা ড্রেসিং-এর সামগ্রী দেহে কি ভাবে আটকে রাখা হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে তফাৎ করা হয়: আঠার সাহায্যে বন্ধনী, রুমালের সাহায্যে বন্ধনী, পটির সাহায্যে বন্ধনী, গড়নযুক্ত বন্ধনী, ব্যান্ডেজের সাহায্যে বন্ধনী।
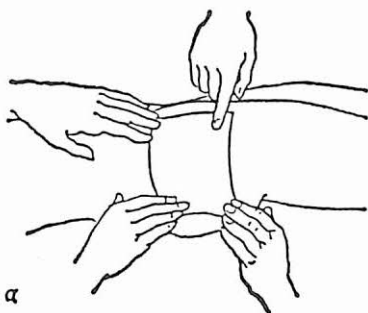
চিত্র — 4: আঠার সাহায্যে বন্ধনী আটকান
a — ক্লেইঅলের (কলডিয়ন) সাহায্যে আটকান বন্ধনী;
b — লিউকোপ্লাষ্টারের সাহায্যে আটকান বন্ধনী

আঠার সাহায্যে বন্ধনী সাধারণত ব্যবহার করা হয় ক্ষতকে বাইরের প্রকৃতির ক্রিয়া থেকে রক্ষা করে রাখার জন্য। এই রকম বন্ধনীতে ড্রেসিং-এর সামগ্রীগুলিকে চামড়ার ওপর ক্ষতের চতুর্দিকে আটকে রাখা হয় বিভিন্ন রকমের আঠা দিয়ে: ক্লেয়ল, কলোডিয়ন, লিউকোপ্লাষ্টার। ক্লেয়লের সাহায্যে বন্ধনী বাঁধার কায়দা খুবই সহজ। ক্ষতের ওপর পাতা হয় কয়েক স্তর গজ। তার চতুর্দিকে চামড়ার ওপর ক্লেয়ল দিয়ে অল্প পুরু করে লাইন আঁকা হয়। তারপর এক টুকরো গজ, টানা অবস্থায় পাতা হয় ঐ আঠার লাইনের ওপর ও তাকে কিছুক্ষণ ধরে রাখা হয় ঐ ভাবে। গজ এতে শক্ত করে এ°টে যায় চামড়ার সঙ্গে (চিত্র — ৪)।

কলডিয়নের সাহায্যে বন্ধনী প্রয়োগ করতে ঐ আঠালো পদার্থকে স্প্যাটুলার সাহায্যে, চামড়ার ওপর টেনে ধরে রাখা গজের ওপর লাগাতে হয়। ড্রেসিং-এর সামগ্রীকে লিউকো-প্লাষ্টারের সাহায্যেও আটকে রাখা যায় —

লিউকোপ্লাস্টারের বন্ধনী। বক্ষপিঞ্জরের ভেদ করা আঘাতে লিউকোপ্লাস্টারের সাহায্যে টালির আকারে সাজিয়ে রন্ধ্র বন্ধ করার অক্লুশন বন্ধনী বাঁধা হয়।

ক্ষতের উপরিভাগ ঢেকে দেওয়ার জন্য ব্যাক্টেরিওসাইড বা জীবাণু ধ্বংসকারী লিউকোপ্লাস্টারও ব্যবহার করা হয়, যার ভেতরকার সার্ফেসে লাগানো থাকে এণ্টিসেপ্টিক পদার্থ। ব্যাক্টেরিওসাইড প্লাস্টারের ভেতর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ফুটো থাকার দরুণ প্লাস্টারের নীচের চামড়া তাতে নরম হয়ে যায় না বা ক্ষত শুকিয়ে যাওয়ার পথে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না।

রুমালের বন্ধনী বাঁধা হয় কাপড় কেটে তৈরী করা রুমাল দিয়ে বা সমকোণী ত্রিভুজাকারে তা ভাঁজ করে। রুমালের বন্ধনীকে শক্ত ভাবে আটকে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয় সেপ্টিপিন বা রুমালের খোঁটগুলি বেঁধে দিয়ে। বাজারে বিক্রীত ঐ ত্রিকোণী রুমালগুলির সাইজ ১৩৫× ১০০×১০০ সেণ্টিমিটার। প্রাথমিক সাহায্যের জন্য স্যানিটারী ব্যাগ ও ওষুধপত্রের ভেতর থাকে রুমাল (ভাঁজ করা অবস্থায়) এবং তা দেখতে ইটের মত, সাইজ ৫×৩×৩ সেণ্টিমিটার।

পটির মত বন্ধনী মোটা ব্যাণ্ডেজ বা ৭৫-৮০ সেণ্টিমিটার লম্বা কাপড় থেকে তৈরী করে নেওয়া চলে। পটি কাপড়ের দুই অন্ত ভাগকে লম্বা লম্বি ভাবে কাটা হয় এমন হিসেব করে যাতে মাঝের অংশ লম্বায় অন্তত ১৫-২০ সেণ্টিমিটার অকর্তিত অবস্থায় থাকে। পটির অকর্তিত অংশ প্রয়োজনীয় অঞ্চলে আড়াআড়ি ভাবে পেতে কাটা অন্তর্ভাগের লেজগুলিকে কোনাকুনি ভাবে এমন

চিত্র — 5: রুমাল দিয়ে ত্রিকোণী বন্ধনী বাঁধা
a — মাথায়; b — কাঁধের অস্থিসন্ধির ওপর (২ রুমাল দিয়ে); c — শ্রোণী-উরত অস্থিসন্ধির ওপর; d — নিম্ন পদের; e — স্তনের ওপর; f — পুরোবাহু ও হস্তকে ধরে রাখার জন্য বন্ধনী

a

b

c

d

e

f
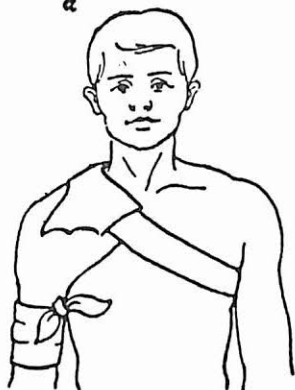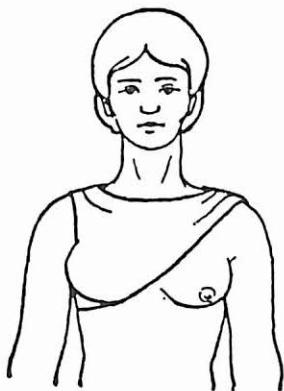
চিত্র — 6: চারপুচ্ছ পট্টি
a — নাকের ওপর; b — থুতনির ওপর; c — শিরনিম্নস্থ অঞ্চলের ওপর; d — রগাস্থি অঞ্চলের ওপর

ভাবে নিয়ে যাওয়া হয় যাতে তারা ক্রস আকার ধারণ করে ও নিচের লেজগুলি যায় ওপরে আর ওপরের লেজগুলি যায় নিচে এবং ওখানেই দুদিকের লেজগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা হয় — ওপরেরটিকে ওপরের সঙ্গে ও নিচেরটিকে নিচের সঙ্গে। নাক ও ওপরের ঠোঁট ব্যান্ডেজ করতে পটির লেজুড়গুলির দুটিকে নিয়ে যাওয়া হয় কানের পাতার ওপর দিয়ে ও বাঁধা হয় মাথার
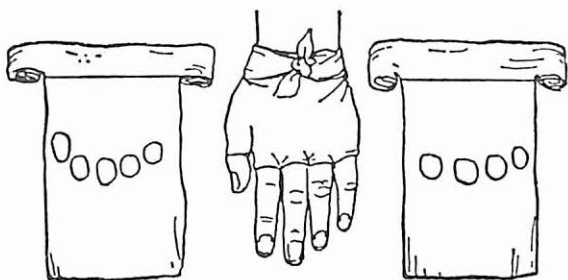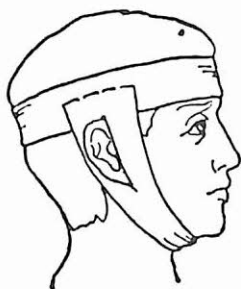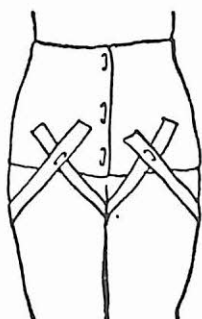
চিত্র — 7: বিশেষ আকৃতির বন্ধনী
a — কব্জির ওপর; b — গাল ও নিচের চোয়ালের ওপর;
c — ব্যাণ্ডেজ

পশ্চাতভাগে, আর দুটিকে নিয়ে যাওয়া হয় কানের নিচে দিয়ে ও বাঁধা হয় ঘাড়ে (চিত্র-৬*a*)।

থুতনিতে পটির ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে পটির অন্তর্ভাগের নীচের লেজুড় দুটিকে নিয়ে যাওয়া হয় কানের পাতার সামনের দিক দিয়ে ও বাঁধা হয় মধ্যিকপালের ওপর, আর

ওপরে লেজড় বা ফিতে দুটোকে দুই কানের পাতার নিচ দিয়ে পেছনে নিয়ে শিরনিম্নাস্থি অঞ্চলে পরস্পরকে ছেদ করে নিয়ে আসা হয় রগাস্থির ওপর দিয়ে ললাটাস্থি অঞ্চলে ও সেখানে দুটিতে গিট বাঁধা হয়। মাথার খুলির জখমেও পটি ব্যাণ্ডেজ ব্যবহৃত হয় (চিত্র — ৬ b, c ও d)।

গড়নযুক্ত বন্ধনী সেলাই করে নেওয়া হয় কাপড়ের ছাট কেটে, শরীরের যেখানে পরানো হবে তার আকৃতি অনুযায়ী। গড়নযুক্ত বন্ধনী বাঁধা হয় তাতে সেলাই করা ফিতেগুলি দিয়ে (চিত্র — ৭, a, b)।

গড়নযুক্ত বন্ধনীয় ভেতর ধরা হয় বাইণ্ডার ও সাস্পেন্সারিকে যেগুলি রোগীর মাপ নিয়ে কাপড় দিয়ে সেলাই করে নেওয়া হয়। আটকানোর জন্য তাতে সেলাই করা থাকে বেল্ট বা পরানো থাকে ডুরি। বাইণ্ডার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় পেটের সামনের দেওয়ালকে শক্ত করে ধরে রাখার জন্য (চিত্র — ৭, b)।

ব্যাণ্ডেজের বন্ধনী বাঁধা হয় ব্যাণ্ডেজ দিয়ে। এতে ব্যবহার করা হয় নানা রকমের ব্যাণ্ডেজ। সরু ব্যাণ্ডেজ (৫ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত চওড়া) ব্যবহার করা হয় দেহের সরু অংশে (আঙ্গুল ব্যাণ্ডেজ করতে); মাঝারি (৭ থেকে ১০ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত চওড়া) ব্যবহার করা হয় পুরোবাহু, নিম্নপদ, গ্রীবাদেশ, করোটি ব্যাণ্ডেজ করতে; চওড়া ব্যাণ্ডেজ (২০ সেণ্টিমিটার পর্যন্ত চওড়া) ব্যবহার হয় বুক, পেট, ঊরু ব্যাণ্ডেজ করতে। গজ থেকে তৈরী ব্যাণ্ডেজ বেশ স্থিতিস্থাপক তাই দেহের যে অঞ্চল ব্যাণ্ডেজ করা হয়, সহজে তা তার গড়ন ধারণ করে। ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক কারখানায় প্রস্তুত ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার
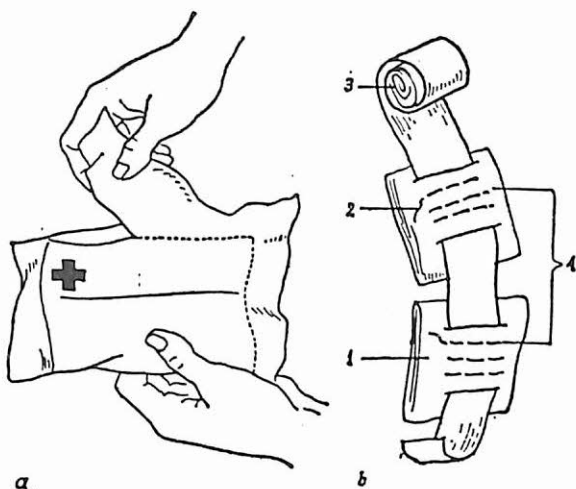
চিত্র — ৪: ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বন্ধনীর প্যাকেট
a — প্যাকেটের বাইরের আবরণী খোলার কায়দা; b — বন্ধনীর প্যাকেট উন্মুক্ত অবস্থায়; 1 — আটকানো গজের বালিশ; 2 — সচল গজের বালিশ; 3 — ব্যাণ্ডেজ; 4 — রঙ্গীন সুতো। ফুটকি ফুটকি দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে লাইন, যেখান দিয়ে ছিড়তে হবে প্যাকেটের আবরণী

করা। তৈরী ব্যাণ্ডেজ না থাকলে গজের টুকরো থেকে তা তৈরী করে নেওয়া যায়। গজ কাটা হয় সমান করে লম্বালম্বি ভাবে কতগুলি ছিলার মতন, তারপর সেগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে সেলাই করে নিয়ে তা জড়ানো হয় শক্ত রোল বা সিলিণ্ডার আকারে। ব্যাণ্ডেজের ধারগুলি খুব সমান হয় যদি গোটা কাপড়টাকে আড়াআড়ি ভাবে পেতে শক্ত করে প্রথমে লোহার কাঠির ওপর জড়ানো হয় ও তারপর লোহার কাঠিটাকে বের করে নিয়ে সেই গোল

করে জড়ানো কাপড়কে ধারাল ছুরি দিয়ে কাজের জন্য প্রয়োজনীয় মাপের আলাদা আলাদা ব্যাণ্ডেজে কেটে নেওয়া হয়।

বন্ধনীর জন্য বিশেষ প্যাকেট — বন্ধনীর জন্য আগে থেকে প্রস্তুত ব্যাণ্ডেজের বন্ধনী প্রাথমিক সাহায্য দানের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক (চিত্র — ৮)। প্যাকিটগুলিকে সরবরাহিত করা হয় নির্বীজিত করা অবস্থায় তাই সেগুলিকে সোজাসুজি ক্ষতের ওপর ব্যবহার করা চলে যে কোন জায়গায়। বন্ধনীর জন্য বিশেষ প্যাকেটে থাকে এক জড়ানো ব্যাণ্ডেজ যার মুক্ত অন্তভাগে সেলাই করা থাকে তুলো-গজে তৈরী করা ছোট এক বালিশ (কম্প্রেস)। জড়ানো ব্যাণ্ডেজ ও ঐ বালিশের মাঝখানে ব্যাণ্ডেজের ওপর থাকে আর একটি তুলো-গজের তৈরী বালিশ, যাকে ব্যাণ্ডেজের উপর দিয়ে ঠেলে এদিক থেকে ওদিকে সরানো যায়। ব্যাণ্ডেজ ছাড়াও ঐ প্যাকেটে থাকে একটি সেপ্টিপিন ও এক অ্যাম্পিউল টিংচার আয়োডিন। এই বন্ধনীর সমস্ত সামগ্রী মোড়া থাকে অয়েলপেপারে এবং রাখা থাকে রবারের সুতো দিয়ে আটকানো এক থলেতে, যা প্যাকেটের স্টেরাইল অবস্থা রক্ষা করে বহুদিন ধরে।

প্যাকেট ব্যবহার করতে একটা মূল নিয়ম পালন করতে হয় — তা হল ব্যাণ্ডেজের সেই স্থান যা ক্ষতের ওপর পাতা হবে, তাকে হাত দিয়ে না ছোঁয়া। প্যাকেটটিকে নেওয়া হয় বাঁ হাতে, আর ডান হাত দিয়ে জোরে প্যাকেটটিকে ছেঁড়া হয়। বের করে নেওয়া হয় তার থেকে অয়েল পেপারে মোড়া বন্ধনীর সামগ্রী। তারপর সাবধানে অয়েল পেপারের মোড়ক খুলে বাম হাতে ধরা হয়

ব্যাণ্ডেজের অন্তভাগ যাতে সেলাই করা গজ-তুলোর বালিশ (ধরতে হয় ব্যাণ্ডেজের সেই দিকটাকে যা রঙ্গীন সুতো দিয়ে চিহ্নিত), ডান হাতে ধরতে হয় জড়ানো ব্যাণ্ডেজটা ও দুই হাত দুদিক সরাতে হয়, যাতে মাঝখানে টানা অবস্থায় উন্মুক্ত হয় খানিকটা ব্যাণ্ডেজ ও তার কম্প্রেস লাগানো অংশ। শেষের অংশটিকে ক্ষতের উপরিভাগে স্থাপন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে তাকে আটকে রাখতে হয়। এফোঁড়-ওফোঁড় হওয়া জখমে একটি কম্প্রেস বসাতে হয় প্রবেশ-ক্ষতের, অপরটিকে নির্গমনের ক্ষতের উপরিভাগে। ব্যাণ্ডেজের আবর্তন শেষ করে ব্যাণ্ডেজের শেষ অংশকে আটকানো হয় সেফ্‌টিপিন দিয়ে।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধার নিয়মাবলী। ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় রোগীকে তার সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানভঙ্গিতে রাখতে হয় যাতে ব্যথা বৃদ্ধি না পায়। ব্যাণ্ডেজ করা সহজ হয় যদি ব্যাণ্ডেজ বাঁধার অংশটিকে, যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে তার বুকের অনুভূমিক স্তরে রাখা হয়। দেহের ব্যাণ্ডেজ বাঁধার অংশটিকে, বিশেষ করে তা যদি হয় দেহান্ত ভাগ, তাহলে তাকে ব্যাণ্ডেজ করতে হয় এমন অবস্থানভঙ্গিতে রেখে, যে ভঙ্গিতে তাকে রাখা হবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, হাতকে যদি বেঁধে কাঁধের সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখতে হয় তা হলে কনুই ব্যাণ্ডেজ করতে হাতকে টান-করা অবস্থায় রেখে ব্যাণ্ডেজ করা চলেনা। তেমনি হাঁটুকেও ভাঁজ করা অবস্থায় ব্যাণ্ডেজ করা চলেনা রোগীকে যদি ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পর হাঁটতে হয়। অনুরূপ আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া চলে।

অস্থিসন্ধিকে অনড় অবস্থায় ধরে রাখার ব্যাণ্ডেজ, অনেক

দিন ধরে না খোলা হলে তাতে অস্থিসন্ধিটির সচলতা কমে যায় বা একেবারে তা অচল হয়ে পড়ে (ankylosis)। তাই দেহান্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে দেহান্তটিকে তার কাজের দিক থেকে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় রেখে ব্যাণ্ডেজ করতে হয়, যাতে ব্যাণ্ডেজ খোলার পর অস্থিসন্ধির জড়তা সহজে দূর করা যায় বা অঙ্গটির কাজ যতদূর সম্ভব সুরক্ষিত হয়। নিম্ন দেহান্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হাঁটুকে সামান্য ভাঁজ-করা অবস্থায় ও পায়ের পাতাকে পায়ের সঙ্গে সমকোণ অবস্থায় রাখা হয়। হাত ব্যাণ্ডেজ করতে কনুইকে রাখতে হয় সমকোণে ভাঁজকরা অবস্থায় আর হাতের কব্জিকে সামান্য পেছনের দিকে টান-করা অবস্থায়। হাতের আঙ্গুলগুলিকে ব্যাণ্ডেজ করে অচল অবস্থায় রাখতে সেগুলিকে ব্যাণ্ডেজ করতে হয় সামান্য সামনের দিকে ভাঁজ করে, যাতে বুড়ো আঙ্গুল মুখ করে থাকে অন্য সমস্ত আঙ্গুলগুলির দিকে।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় রোগীর মুখের ভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময় নিজের ঝাঁকুনিতে রোগীকে নতুন করে ব্যথা না দেওয়া হয়। ব্যাণ্ডেজ যদি রোগীকে কষ্ট দেয় তা হলে তার পাকগুলি কিছুটা আল্গা করে দিতে হয় বা তার দিক পরিবর্তন করতে হয়। ব্যাণ্ডেজ করা দরকার দুই হাত ব্যবহার করে, একবার এক হাতে পাক দিতে হয় অন্যবার অন্য হাতে। ব্যাণ্ডেজ-করা অংশের চতুর্দিকে এক হাত যখন পাক দিচ্ছে অন্য হাত তখন ব্যাণ্ডেজের পাককে ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেবে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে ব্যাণ্ডেজের পেঁচ নিয়ে যেতে হয় বাম থেকে ডাইনে এবং পেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে জড়ানো ব্যাণ্ডেজটি যেন নিজে থেকেই খুলতে থাকে (চিত্র—৯) ও প্রত্যেকটি

চিত্র 9: ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সময়ে তা স্থাপনের সঠিক কায়দা

পাক যেন পূর্ববর্তী পাকের ১/২ থেকে ২/৩ আড়াআড়ি অংশ ঢেকে ফেলে। যে ধরনের ব্যাণ্ডেজ করা হচ্ছে, তার বৈশিষ্টসূচক সমস্ত নিয়ম পালন করে ব্যাণ্ডেজ করা দরকার। ঐ সব বৈশিষ্টসূচক নিয়মগুলি পালন করলে তাতে জখমের স্থান ভাল করে ঢাকা যায় ও ব্যাণ্ডেজকে ভাল করে আঁটা অবস্থায় রাখা যায় ও তাতে বন্ধনীর সামগ্রীর বাড়তি খরচ নিবারণ করা যায়। দেখা দরকার ব্যাণ্ডেজ যেন দেহপ্রান্তের রক্তচলাচল ব্যাহত না করে। তা বোঝা যায় ব্যাণ্ডেজের নিচে অঙ্গটির রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া ও নীলাভ রঙ ধারণ করা, অনুভূতি কমে যাওয়া ও দপ্‌দপানি ব্যথা প্রভৃতি দেখা দেওয়ার ভেতর দিয়ে। অনুরূপ ব্যাণ্ডেজকে অবিলম্বে ঠিক করা দরকার অথবা

নতুন করে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দরকার। ব্যাণ্ডেজের শেষ অংশ গিট দিয়ে বাঁধতে হয় বা সেফ্টিপিন দিয়ে আটকাতে হয় দেহের সুস্থ অংশের উপর।

ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বন্ধনী বাঁধার মূল ধরনগুলি

যে ব্যাণ্ডেজ বাঁধায় ব্যাণ্ডেজের সমস্ত পাক একই জায়গার ওপর স্থাপন করা হয় ও এক পাক অন্য পাককে পুরোপুরি ভাবে ঢাকে তাকে বলে চক্রাকারের ব্যাণ্ডেজ। অনুরূপ ব্যাণ্ডেজ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাঁধা হয় হাতের কব্জিতে ,নিম্ন পদের নিচের তৃতীয় অংশে, পেটে, গ্রীবাদেশে, ললাট দেশে স্পাইরাল বা ঘোরানো সিঁড়ি আকারের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয় যদি দেহের অনেকখানি জায়গা ব্যাণ্ডেজ করে ঢাকতে হয়। এ ব্যাণ্ডেজের প্রতিটি পাক দেওয়া হয় খানিকটা কোনাচে করে নিচ থেকে ওপরে এবং এর প্রতিটি পাক দিয়ে পূর্ববর্তী পাকের ২/৩ আড়াআড়ি অংশ ঢেকে ফেলা হয়। এ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আরম্ভ করতে হয় কয়েক বার চক্রাকারে পাক দিয়ে ব্যাণ্ডেজটিকে আগে শক্ত করে আটকে নিয়ে। ঘোরানো সিঁড়ি আকারের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সহজ হাত ও পায়ের সেই সব অংশে যার বেধ মোটামুটি এক মাপের। যদি দেহপ্রান্তের সেই সব জায়গায় এ ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হয়, যার বেধ বিভিন্ন যেমন, পুরোবাহুতে, তাহলে তার সমস্ত পাক একের ওপর এক শক্ত করে সেঁটে বসে না, তা জায়গায় জায়গায় ফুলে থাকে। সে সমস্ত জায়গায় বাঁধতে হয় মোচড়ানো স্পাইরাল ব্যাণ্ডেজ (চিত্র — ১০, a, b)। মোচড় দেওয়া হয় এইভাবে: — যে

জায়গায় আরম্ভ হয় দেহপ্রান্তের অধিকতর মোটা জায়গা, সেখানে মুক্ত হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরা হয় ব্যাণ্ডেজের শেষপাকের নিচের ধারটিকে। তারপর ব্যাণ্ডেজটি মোচড় দেওয়া হয় এমন ভাবে যাতে তার ওপরের ধার নিচের ধারে পর্য্যবসিত হয়। এই ভাবে কয়েকবার বসিয়ে দিতে হয়, এই মোচড়ানো পাক। জায়গাটির ব্যাসের তারতম্য যত বেশী তত বেশী মোচড় দিতে হয় ব্যাণ্ডেজটিকে।

বাংলায় চার (৪) আকারের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা — এ ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধায় পাকগুলি দিতে হয় চার আকারে। এই ভাবে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সুবিধাজনক দেহের সেই সমস্ত অংশে যার গড়ন জটিলতা পূর্ণ — পায়ের কব্জি (চিত্র — ১০ g), কাঁধের অস্থিসন্ধি, শিরনিম্নাস্থি অঞ্চল, হাতের পাতা, পেরিনিয়াম। চার আকারের ব্যাণ্ডেজ বাঁধার মতই আর এক রকম ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয় — গমের মঞ্জুরী আকারে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ও কাছে আসা ও দূরে সরে যাওয়ার পাক যুক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। গমের মঞ্জরী আকারে ব্যাণ্ডেজ করতে ব্যাণ্ডেজের বাঁকের জায়গাগুলিকে রাখা হয় এক সোজা লাইনের ওপর। কাছে আসা ও দূর সরে যাওয়ার ঢং যুক্ত ব্যাণ্ডেজে তার চার আকারে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পাকগুলি আস্তে আস্তে দূর থেকে কাছে আসে অথবা কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যায়, (চিত্র — ১০ b, e)।

সামনে-পেছনে উল্টানযোগ্য পাকযুক্ত ব্যাণ্ডেজ মাথার ওপরে অথবা হাত বা পায়ের এম্পুটেশন স্ট্রাম্পে বা আঙ্গুলের ওপরে (ড্রেসিং-এর) বা বন্ধনীর অন্যান্য
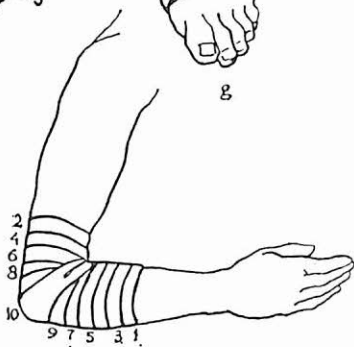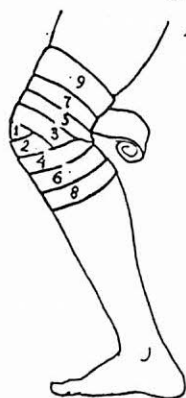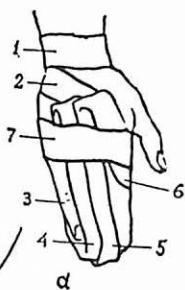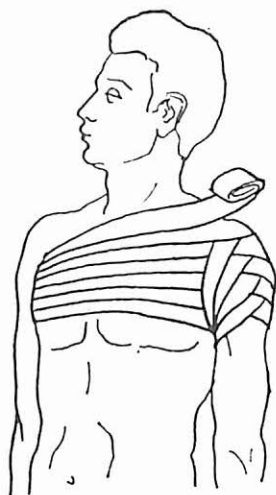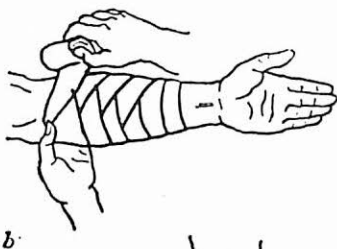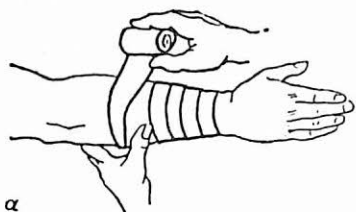
a
b
c
1
2
7
3
6
4
5
d
3
4
2
1
g
9
7
5
1
3
2
4
6
8
e
2
4
6
8
10
9
7
5
3
1
f

সামগ্রীকে শক্ত করে আটকে রাখতে সাহায্য করে। অনুরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে ব্যাণ্ডেজের পাকগুলিকে পরপর লম্বভাবে পাতা হয়। এরই জন্য প্রতিবার ব্যাণ্ডেজটির মোড় ফেরাতে হয় ৯০° কোণে ও মোড়ের জায়গাটিকে প্রতিবার ব্যাণ্ডেজের চক্রাকারের পাক দিয়ে আটকে রাখতে হয়। ব্যাণ্ডেজের মোড় ফেরাতে হয় বিভিন্ন লেভেলে যাতে একই জায়গায় বেশী চাপ পড়া নিবারণ করা যায়।

জালি জালি টিউবের মত ব্যাণ্ডেজ। আমাদের দেশের শিল্প, চিকিৎসায় ব্যবহারের জন্য উৎপাদন করে এক নতুন ধরনের ব্যাণ্ডেজ। এ ব্যাণ্ডেজ স্থিতিস্থাপক, জালি জালি, ঠিক টিউবের মতন দেখতে। এর কাজ দেহের যে কোন অংশে বন্ধনীর জন্য ব্যবহৃত সামগ্রীগুলিকে জায়গা মত আটকিয়ে রাখা। টিউবের মত দেখতে এই ব্যাণ্ডেজগুলিকে প্রস্তুত করা হয় স্থিতিস্থাপক সুতোয়

চিত্র — 10. বিভিন্ন ধরনের ব্যাণ্ডেজ (পৃঃ. ৭০) a — ঘোরানো সিঁড়ির মতন করে বন্ধনী বাঁধা ও তা বাঁধার সময় বাঁকের জায়গা, যে ভাবে ধরতে হয়; b — ঘোরানো সিঁড়ির মতন ব্যাণ্ডেজ করা ও যে ভাবে বাঁকানো পাক দিতে হয় নিম্নবাহু ব্যাণ্ডেজ করতে; c — ধানের শিষ আকারের ব্যাণ্ডেজ কাঁধের অস্থিসন্ধির ওপর; *d* — হস্তের ওপর কেন্দ্রগামী পেঁচের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; e — হাঁটুর ওপর অপকেন্দ্রিক পেঁচের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; f — কণুই-এর ওপর কেন্দ্রগামী পেঁচের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; g — পায়ের কব্জির ওপর বাংলায় চার (৪) আকারের ব্যাণ্ডেজ বাঁধা; 1, 2 ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা সূচিত করা হয়েছে কোন্ পেঁচ কোন্‌টার পর দেওয়া হয়

বোনা গেঞ্জীর মত জালি কাপড় থেকে আর এই ইলাষ্টিক সুতোগুলি তৈরী সিন্থেটিক আঁশ ও তুলোর আঁশ একত্রে পাকিয়ে। ব্যাণ্ডেজগুলি বেশীরকম ইলাষ্টিক হওয়ার জন্য তাকে পরানো যায় দেহের যে কোন অংশে এমনকি জটিল গড়ন যুক্ত অংশগুলিতেও। পরানোর পর তা সে জায়গাগুলির গায়ে শক্ত হয়ে লেগে যায়, অথচ রক্ত চলাচলের বা অস্থিসন্ধিগুলির সচলতার কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। এ ব্যাণ্ডেজের কোন জায়গা একটু কেটে গেলে অথবা ছিঁড়ে গেলে তার বোনা জাল খুলে পড়ে না। কাচার পর বা অটোক্লেভে ১·২ এটমসফিয়ার চাপে ৩০ মিনিট ধরে রাখার পরও এ ব্যাণ্ডেজ তার স্থিতিস্থাপকতা হারায় না। ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে জালি জালি টিউবের মত ব্যাণ্ডেজের ব্যবহার অনেক সময় সংক্ষেপ করে। এ বাণ্ডেজ পরানোর নিয়ম হল ব্যাণ্ডেজের ভেতর দুই হাত ঢুকিয়ে বা দুই হাতের আঙ্গুল ঢুকিয়ে, তাকে টেনে বর্দ্ধিত করে প্রয়োজনীয় স্থানে তাকে পরিয়ে দেওয়া। হাত বা আঙ্গুল দুটি বের করে নিয়ে এলেই ব্যাণ্ডেজটি সংকুচিত হয় ও দেহাংশটিকে শক্ত করে চেপে ধরে এবং নির্ভরযোগ্য ভাবে বন্ধনীর অন্যান্য সামগ্রীগুলিকে যথাস্থানে আটকে ধরে রাখে।

দেহের বিভিন্ন অংশের মাপ অনুসারে ৭ রকমের (১ নং থেকে ৭ নং) জালি জালি ব্যাণ্ডেজ প্রস্তুত করা হয়। ১ নং ব্যাণ্ডেজ (টানবিহীন অবস্থায় তার ব্যাস ১০ মিলিমিটার) ব্যবহার করা হয় বড়দের হাতের আঙ্গুলের জন্য, আর শিশুদের হাতের পাতা ও পায়ের পাতার জন্য; ২ নং (ব্যাস ১৭ মিলিমিটার) ব্যবহার করা হয় বড়দের
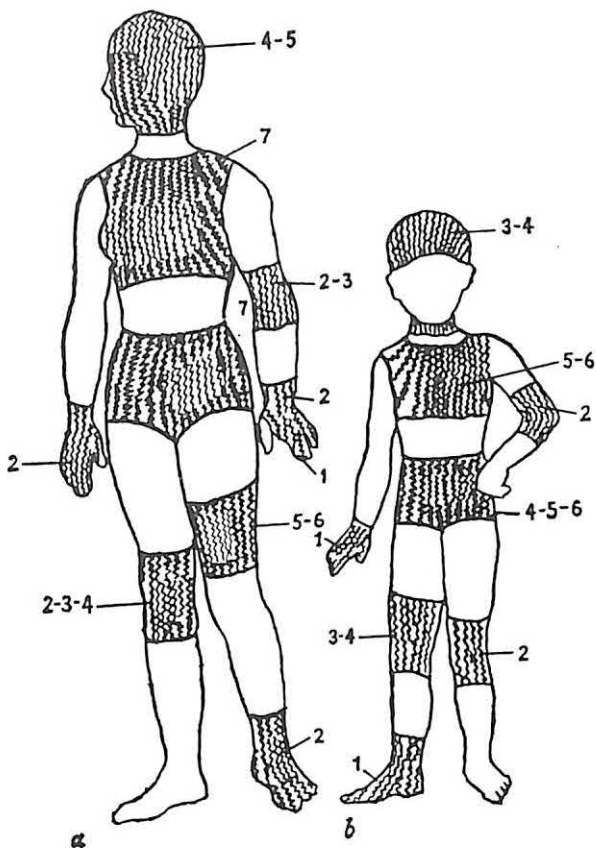
চিত্র — 11: যত রকম পাইপ জাতীয় জালি জালি স্থিতিস্থাপক ব্যাণ্ডেজ পরানো যায়, তার চিত্র এবং তাতে কোন্ কোন্ নম্বরের ব্যাণ্ডেজ ব্যবহৃত হয়েছে — বড়-দের ক্ষেত্রে ও ছোটদের ক্ষেত্রে — তাও দেওয়া হল।

হাতের পাতা, পুরোবাহু, পায়ের পাতা, কনুই, হাতের কব্জি, পায়ের কব্জির জন্য, আর শিশুদের উর্দ্ধবাহু, নিম্নপদ, হাঁটুর অস্থিসন্ধিতে পরানোর জন্য; ৩ নং ও ৪ নং (ব্যাস যথাক্রমে ২৫ ও ৩০ মিলিমিটার) ব্যবহার করা হয় বড়দের পুরোবাহু ও ঊর্দ্ধবাহু, **নিম্নপদ** হাঁটুর অস্থিসন্ধিতে পরানোর জন্য, আর শিশুদের ঊরু ও মাথায় ব্যবহারের জন্য; ৫ নং ও ৬ নং (ব্যাস যথাক্রমে ৩৫ ও ৪০ মিলিমিটার) ব্যবহার করা হয় বড়দের মাথা ও ঊরুতে পরানোর জন্য, আর শিশুদের বক্ষপিঞ্জর, পেট, কোমর ও পেরিনিয়ামে পরানোর জন্য; ৭ নং (ব্যাস ৫০ মিলিমিটার) ব্যবহার করা হয় বড়দের বক্ষপিঞ্জর, পেট, তলপেট ও পেরিনিয়ামের জন্য (চিত্র — ১১)।

ব্যাণ্ডেজগুলি নষ্ট হয় অম্ল, ক্ষার ও তেলের বিক্রিয়ার ফলে। ব্যাণ্ডেজগুলিকে কাচা হয় সাবানের ফেনায়, সিন্থেটিক সাবানের গুঁড়ো এ কাজে ব্যবহার করা চলে না। কাচার পর ব্যাণ্ডেজটিকে নিংড়ে জল ঝাড়া নিষেধ।

দেহের বিভিন্ন জায়গায় নরম ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কায়দা

মাথার ব্যাণ্ডেজ, মাথার চুলযুক্ত অংশকে ঢাকার জন্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় সাধারণ নির্ভরযোগ্য ব্যাণ্ডেজের বাঁধন — টুপির মতন ব্যাণ্ডেজ (চিত্র — ১২a)। লম্বায় ১ মিটারের অনধিক সরু ব্যাণ্ডেজের এক টুকরো মাথার ওপর এমনভাবে পাতা হয় যাতে তার মাঝখানটা থাকে শিরকুণ্ডাস্থির ওপর। তার দুই শেষাংশকে নিচে

আনা হয় দুই কানের পাতার সামনে দিয়ে ও টেনে রাখা হয় নিচের দিকে। টেনে রাখে রোগী নিজে বা ডাক্তারের সহকারী। মাথায় মূল ব্যাণ্ডেজ বাঁধার শেষে ব্যাণ্ডেজের এই টুকরোটিকে ব্যবহার করা হয় মূল ব্যাণ্ডেজকে ভালভাবে আটকে রাখার জন্য। মূল ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মাথার চতুর্দিকে প্রথমে দেওয়া হয় দুইবার চক্রাকারের পাক ললাটাস্থি ও শিরনিম্নাস্থির ওপর দিয়ে, তারপর ব্যাণ্ডেজ যখন তৃতীয় পাকে আসে আটকে রাখার ব্যাণ্ডেজের কাছে তখন সে ব্যাণ্ডেজটি দিয়ে আটকে রাখার ব্যাণ্ডেজটিকে প্রদক্ষিণ করিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় শিরনিম্নাস্থির ওপর দিয়ে উল্টো দিকের আটকে রাখার ব্যাণ্ডেজটির শেষ অংশের কাছে। এখানেও মূল ব্যাণ্ডেজটিকে দিয়ে পাততে হয় ললাটাস্থি-শিরকুণ্ডাস্থি অঞ্চলে এমনভাবে যাতে তা পূর্ববর্তী চক্রাকারের পাকের ২/৩ অংশ ঢেকে ফেলে। এই ভাবে প্রতিবার আটকে রাখার ব্যাণ্ডেজকে প্রদক্ষিণ করিয়ে নিয়ে মূল ব্যাণ্ডেজকে পাতা হয় শিরকুণ্ডাস্থির ওপর। এমনি করেই আস্তে আস্তে গোটা মাথার খুলি ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়। মূল ব্যাণ্ডেজের শেষ অংশ বাঁধা হয় আটকানোর ব্যাণ্ডেজের একটি ধারের সঙ্গে এবং তার পর আটকানেরে ব্যাণ্ডেজের দুই শেষ অংশকে নিয়ে খানিকটা টান করে বাঁধতে হয় থুতনির তলায়।

সামনে-পেছনের পাগড়ি ব্যাণ্ডেজ (চিত্র — ১২b)। এ ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে ব্যাণ্ডেজটির দুই পাক প্রথমে দেওয়া হয় চক্রাকারে, মাথাকে প্রদক্ষিণ করে, ললাট ও শিরনিম্নাস্থির ওপর দিয়ে। এই ভাবে ব্যাণ্ডেজটিকে মাথার সঙ্গে শক্তভাবে

1 3 5 7 9 11 13 14 12 10 8 6 4 2
a
6 9 12 14 11 8 5 2 3 15 4 1
b
5 3 1 6 4 2
c
d
e
1 2 3 4
f
g
h
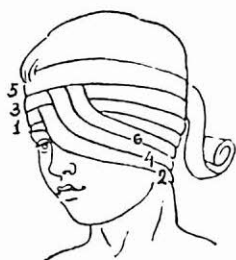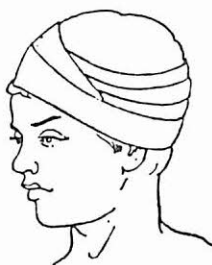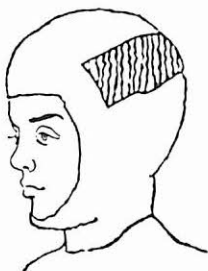
আটকে নিয়ে, পরের পাকে ব্যাণ্ডেজটিকে মাথার সামনে এনে তাকে ভাঁজ করে পেছনে শিরনিম্নাস্থির কাছে নিয়ে যাওয়া হয় মাথার পাশের অঞ্চল ঢেকে। সেখানে পেঁাছে আবার তাকে ভাঁজ করে পেছনে শিরনিম্নাস্থির কাছে নিয়ে যাওয়া হয় মাথার পাশের অঞ্চল ঢেকে। সেখানে পেঁাছে আবার তাকে ভাঁজ করে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয় মাথার সামনে মাথার অপর পাশ ঢেকে (ভাঁজ-করা জায়গাগুলিকে ডাক্তারের সহকারী ধরে রাখে)। তারপর ভাঁজ করা জায়গাগুলিকে শক্ত করে মাথার সঙ্গে আটকানো হয় ব্যাণ্ডেজের চক্রাকারের পাকের সাহায্যে, এই ভাবেই চালানো হয় বারে বারে ভাঁজ করে ব্যাণ্ডেজকে সামনে-পেছনে নেওয়া ও চক্রাকারে ব্যাণ্ডেজ করে ভাঁজগুলিকে আটকানো। প্রতিবারের পাকে সামনে-পেছনে যাওয়া ব্যাণ্ডেজটিকে একটু একটু করে মাথার মাঝখানের দিকে সরাতে হয় যতক্ষণ না গোটা মাথা ঢেকে যায়। এই ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করতে হয় কয়েকবার চক্রাকারের পাক দিয়ে। এই ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে দুটি পৃথক ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা সুবিধাজনক। একটি ব্যাণ্ডেজ লাগাবে চক্রাকারের পাক অপর ব্যাণ্ডেজের

চিত্র — 12: মস্তকের বন্ধনী

a — মাথার চুলযুক্ত স্থান ঢেকে দেওয়া বন্ধনী; c — এক চোখ ঢাকা বন্ধনী; d — দুই চোখ ঢাকা বন্ধনী; e — কান ও শিরনিম্নাস্থি অঞ্চল ঢাকা বন্ধনী; f — শিরনিম্নাস্থি অঞ্চল ও ঘাড় ঢাকা বন্ধনী; g — থুতনি ও নিচের চোয়াল ঢাকা বন্ধনী। সংখ্যা দ্বারা সূচিত করা হয়েছে ব্যাণ্ডেজের পেঁচের পরম্পরা।

পাকগ্নলিকে আটকানোর জন্য। অপর ব্যাণ্ডেজটির পাকগ্নলি দিতে হয় এমনভাবে যাতে ক্রমে ক্রমে মাথার প্নরো উপরিভাগ ঢেকে যায়।

চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আরম্ভ করা হয় ব্যাণ্ডেজের চক্রাকারের পাক দিয়ে ললাট-শিরনিম্ন অঞ্চলকে বেষ্টন করে। দ্বিতীয় পাক শিরনিম্ন অঞ্চলে এলে তাকে নামানো হয় ঘাড়ের কাছে ও তারপর নিয়ে যাওয়া হয় কানের নিচ দিয়ে ম্নখমণ্ডলে, চোখ অঞ্চলের ওপর দিয়ে ললাটে। তৃতীয় পাক, চক্রাকারের পাক যার কাজ আগের পাকগ্নলিকে স্বস্থানে ধরে রাখা। পরের পাক আবার বাঁকা পাক তবে তাকে শিরনিম্ন অঞ্চল থেকে নিয়ে যাওয়া হয় কানের ও চোখের ওপর দিয়ে ললাটে। এই ভাবে বন্ধনের প্ননরাবৃত্তি করতে হয় প্রতিবার বাঁকানো পাকগ্নলিকে একটু একটু করে ওপরে তুলে যতক্ষণ পর্যন্ত না চোখের জায়গা সম্প্নর্ণ ঢেকে যায়। এ ব্যাণ্ডেজটি বাঁধা শেষ করতে হয় চক্রাকারের পাক দিয়ে (চিত্র—১২c)। ডান ও বাম চোখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কায়দার তফাৎ আছে। ডান চোখের ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে ব্যাণ্ডেজের পাকগ্নলি যায় বাম থেকে ডান দিকে। দ্নই চোখ এক সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ করতে ব্যাণ্ডেজের প্রথম তিন পাক প্রয়োগ করা হয় ডান চোখ ব্যাণ্ডেজ করার মতন করে, অর্থাৎ বাঁকা পাক যায় কানের পাতার নিচ দিয়ে, চোখের সামনে দিয়ে ললাটে। পরবর্তী দ্নই পাক বন্ধ করে বাম চোখ। এতে ব্যাণ্ডেজটিকে নিয়ে যাওয়া হয় ওপর থেকে নিচের দিকে, অর্থাৎ ডান শিরকুণ্ডাস্থি অঞ্চল থেকে ললাটের ওপর দিয়ে, চোখের সামনে দিয়ে, কানের পাতার নিচ দিয়ে শিরনিম্ন অঞ্চলে। তারপর দেওয়া হয় চক্রাকারের

পাক ও পরে ডান চোখের পাক। এমনি করেই কয়েকবার পাকগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হয় (চিত্র — ১২d)। কানের অঞ্চল ব্যাণ্ডেজ করা বেশী সুবিধাজনক, যাকে বলে নেয়াপোলিতানের ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কায়দা (চিত্র — ১২e)। এ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আরম্ভ করা হয় ললাট-শিরনিম্ন অঞ্চল দিয়ে মাথা প্রদক্ষিণ করা চক্রাকারের ব্যাণ্ডেজের পাক দিয়ে। পরবর্তী পাকগুলিকে আস্তে আস্তে ওপর থেকে নামিয়ে আনা হয় রুগ্ন স্থানের দিকে। এই ভাবে কান ও ম্যাষ্টয়েড উদ্‌গত অংশের অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণ ঢেকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করতে হয় তাকে জোরদার করে আটকে রাখার জন্য কয়েকবার চক্রাকারের পাক দিয়ে। শিরনিম্ন অঞ্চল (মাথার অক্সিপিটাল অঞ্চল) ও গ্রীবাদেশ ব্যাণ্ডেজ করতে প্রয়োগ করা হয় বাংলা চার (৪) আকারের ব্যাণ্ডেজের পাক। প্রথমে দুইবার মাথা প্রদক্ষিণ করা চক্রাকারের পাক দিয়ে পরবর্তী পাকটিকে বাম কানের ওপর দিয়ে নিয়ে তারপর একটু নিচে নামিয়ে শিরনিম্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে কোনাকুনি ভাবে নিয়ে যাওয়া হয় নিচের চোয়ালের ডান দিককার কোণের নিচ দিয়ে গলার সামনে ও তারপর সেখান থেকে নিচের চোয়ালের বাম কোণের তলা দিয়ে তাকে খানিকটা ওপরে তুলে শিরনিম্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে ও ডান কানের ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ললাটদেশে। এই পাকের পুনরাবৃত্তি করতে হয় (চিত্র — ১২f)। ব্যাণ্ডেজের বাঁকা পাকগুলিকে ছেদবিন্দুতে তাদের আস্তে আস্তে একটু করে সরিয়ে ঢেকে ফেলা হয় গোটা শিরনিম্ন অঞ্চল। গ্রীবাদেশ ঢেকে দিতে হলে এই চার (৪) আকারের
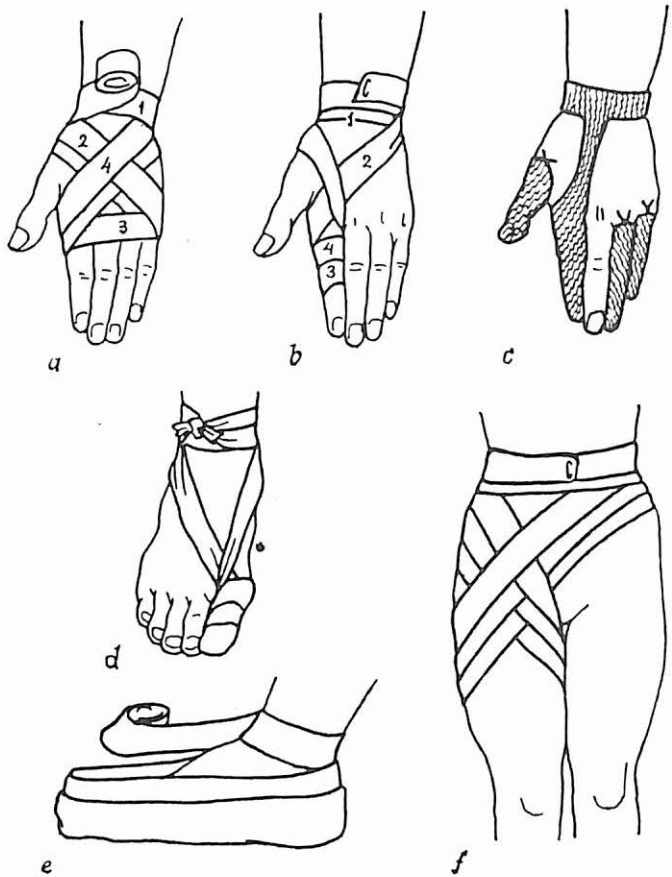
চিত্র — 13: ঊর্দ্ধ ও নিম্ন দেহপ্রান্তের বন্ধনী
a — হস্ত ও হাতের কব্জির উপর বন্ধনী; b — হস্তের দ্বিতীয় আঙ্গুলের বন্ধনী; c — হাতের আঙ্গুলের ওপর টিউব আকারের জালি বন্ধনী; d — চরণের এক আঙ্গুলের বন্ধনী; e — গোটা চরণ ঢাকা বন্ধনী; f — ঊরু, নিতম্ব ও পেটের মিশ্র বন্ধনী।

পাকের সঙ্গে মাঝে মাঝে যোগ করতে হয় গ্রীবাদেশ প্রদক্ষিণকারী কতগুলি চক্রাকারের পাক।

নিচের চোয়াল নির্ভরযোগ্য ভাবে ব্যাণ্ডেজ করতে ব্যবহার করা হয় তথাকথিত "লাগামের" মত দেখতে ব্যাণ্ডেজ (চিত্র — ১২৪)। ললাট-শিরনিম্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে চক্রাকারের পাক দিয়ে ব্যাণ্ডেজকে আগে শক্ত করে আটকে দ্বিতীয় পাককে শিরনিম্ন অঞ্চলে এনে কোনাকুনি নিচে নামিয়ে নিয়ে যেতে হয় উল্টো দিকে নিচের চোয়ালের কোণের নিচে। তারপর দিতে হয় কতগুলি ভার্টিক্যাল বা ওপর-নিচ পাক, যাতে ব্যাণ্ডেজ কানের সামনে দিয়ে গিয়ে রগাস্থি, শিরকুণ্ডাস্থি ও থুতনি অঞ্চল ঢেকে দেয়। এই ভাবে নিচের চোয়ালকে শক্ত করে আটকে পরের পাককে নিয়ে যেতে হয় চোয়ালের তলায় (তার উল্টো দিকে) তারপর শিরনিম্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে পাকটিকে নিয়ে যেতে হয় কোনাকুনি ওপর দিকে ও আরম্ভ করতে হয় কতগুলি হরাইজণ্টাল বা অনুভূমিক চক্রাকারের পেঁচ ললাট ও শিরনিম্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে। নিচের চোয়ালকে পুরোপুরি ঢেকে ফেলার জন্য পরের পাককে আবার নিয়ে যাওয়া হয় শিরনিম্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে কোনাকুনি ও নিচ দিকে, কিন্তু উল্টোদিকের গ্রীবাদেশের পাশ পর্যন্ত ও সেখান থেকে নিচের চোয়াল ও গ্রীবাদেশের অপর পাশের ওপর দিয়ে দেওয়া হয় কয়েক পাক অনুভূমিক পেঁচ। এরপর বাণ্ডেজকে আবার চোয়ালের নিচে এনে দেওয়া হয় কতগুলি ওপর-নিচ পেঁচ; থুতনি ও শিরকুণ্ড অঞ্চলকে বেষ্টন করে। এ ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করতে হয় মাথাকে বেষ্টন করে কয়েকবার পাক দিয়ে, যার জন্য ব্যাণ্ডেজকে

আবার উপরে নিতে হয় কোনাকুনি ভাবে শিরনিম্ন অঞ্চলের ওপর দিয়ে।

জালি জালি টিউবের মত দেখতে ইলাষ্টিক ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মাথা ও মুখমণ্ডলের যে কোন জায়গায় ড্রেসিং সামগ্রীকে নির্ভরযোগ্য ভাবে আটকে রাখা যায় (চিত্র — ১২h)।

নাক, ওপরের ঠোঁট, থুতনি ও মাথার চাঁদির জন্য সুবিধাজনক ও সহজ ভাবে ব্যবহার করা চলে রুমাল, পট্টি ও গড়নযুক্ত ব্যাণ্ডেজ (চিত্র — ৫, ৬, ৭)।

উর্দ্ধ ও নিম্ন দেহপ্রান্তে ব্যাণ্ডেজ বাঁধার কায়দা। হাতের পাতা ও হাতের কব্জিতে সাধারণত বাঁধা হয় বাংলার চার (৪) আকারের পেঁচযুক্ত ব্যাণ্ডেজ (চিত্র — ১২a)। হাত ও আঙ্গুলের বিস্তৃত ক্ষত ব্যাণ্ডেজ করে ঢাকার জন্য ব্যবহৃত হয় প্রত্যাবর্তনকারী পাকযুক্ত ব্যাণ্ডেজ (চিত্র — ১০d)। ব্যাণ্ডেজটিকে শক্ত করে আটকানো হয় হাতের কব্জির কাছে কয়েকবার চক্রাকারের পাক দিয়ে। তারপর ব্যাণ্ডেজটিকে হাতের তালুর পেছন দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তর্জণী বা হাতের ২য় আঙ্গুলের শেষ পর্যন্ত। তার পর ব্যাণ্ডেজটিকে আঙ্গুলের ওপর দিয়ে নিয়ে আসা হয় হাতের পাতার দিকে ও হাতের পাতা ঢাকা হয়। এই ভাবে কয়েকবার সামনে-পেছনে প্রত্যাবর্তনকারী পাক দিয়ে গোটা হাত ও ৪টি আঙ্গুল ঢেকে পাকগুলিকে স্বস্থানে আটকে রাখার জন্য দেওয়া হয় কতগুলি হরাইজণ্টাল পাক (ঘোরানো সিঁড়ির মত পাক) আঙ্গুলগুলির ডগা থেকে আরম্ভ করে হাতের কব্জি পর্যন্ত ও সেখানেই ব্যাণ্ডেজ শেষ করতে হয়। এক আঙ্গুল ব্যাণ্ডেজ করা আরম্ভ করতে হয় হাতের

কব্জির ওপর কয়েক পাক দিয়ে ব্যাণ্ডেজ ভালভাবে আটকে নিয়ে। তারপর ব্যাণ্ডেজটিকে নিয়ে যাওয়া হয় হাতের পিঠের দিক দিয়ে আঙ্গুলটির ডগা পর্যন্ত এবং তারপর ঘোরানো সিঁড়ির মত ব্যাণ্ডেজের পাক দিয়ে আঙ্গুলটিকে ঢেকে ফেলা হয় তার গোড়া পর্যন্ত। এই ভাবে গোটা আঙ্গুলকে ঢেকে ব্যাণ্ডেজটিকে দুই আঙ্গুলের ফাঁকের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হাতের পিঠের দিকে ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করতে হয় হাতের কব্জির চতুর্দিকে কয়েক পাক ঘুরিয়ে (চিত্র — ১৩b)। পুরোবাহুকে ব্যাণ্ডেজ করে ঢাকার পক্ষে সবচেয়ে ভাল ঘোরানো সিঁড়ির মত পাক দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। কনুইকেও ঘোরানো সিঁড়ির মত পাক দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা চলে। এ ভাবে ব্যাণ্ডেজ করার আগে হাতের কনুই-এর অস্থিসন্ধিকে খানিকটা ভাঁজ করে নেওয়া হয়। এতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা আরম্ভ করা হয় কনুই-এর কাছে পুরোবাহুতে কয়েকবার চক্রাকারের পাক দিয়ে ব্যাণ্ডেজটিকে আটকে। তারপর আস্তে আস্তে পাক দিতে দিতে ব্যাণ্ডেজটিকে নেওয়া হয় কনুই ও উর্দ্ধবাহুতে, যেখানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করা হয় কয়েকবার চক্রাকারের পাক দিয়ে। কনুই-এর অস্থিসন্ধিকে ভাঁজ করা অবস্থায় ধরে রাখতে হলে নেওয়া হয় বাংলায় চার (৪) আকারের কেন্দ্রাভিমুখী ব্যাণ্ডেজের পাক (চিত্র — ১০f) কাঁধের অস্থিসন্ধি অঞ্চলের যথেষ্ট জটিল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয় নিম্নলিখিত উপায়ে: উর্দ্ধবাহুতে বগলতলার খুবই কাছে দেওয়া হয় ৩-৪ বার চক্রাকারের পাক। ৫ম পাককে বগলতলা থেকে নিয়ে যাওয়া হয় কোনাকুনি ভাবে ও একটু ওপরে কাঁধের বাইরের দিকে, সেখান থেকে তাকে নেওয়া

6*

হয় পিঠে ও সেখান থেকে বুক প্রদক্ষিণ করে আনা হয় আবার সেখানে, যেখান থেকে পাকটি আরম্ভ করা হয়েছিল। ষষ্ঠ পাক দেওয়া হয় ঊর্দ্ধবাহুকে বেষ্টন করে, আগের পাকের প্রথম অংশকে খানিকটা ঢেকে। বগলতলার ভেতর দিয়ে ব্যাণ্ডেজটিকে আনা হয় সামনের দিকে ও সেখান থেকে কোনাকুনি ও ওপর দিকে অস্থিসন্ধির ওপর দিয়ে তাকে নেওয়া হয় পিঠে। এই ভাবে পাকগুলির পুনরাবৃত্তি করা হয়। পাকগুলি পেঁচানো হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না স্কন্ধসন্ধি অঞ্চল সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে (চিত্র — ১০c)। আঙ্গুল ব্যাণ্ডেজ করতে সুবিধাজনক, ১নং জালি জালি পাইপ জাতীয় ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা (চিত্র — ১৩c)।

পায়ে কেবলমাত্র বুড়ো আঙ্গুলকে আলাদা ভাবে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। ব্যাণ্ডেজ করা আরম্ভ করতে হয় পায়ের কব্জির কাছ থেকে। তারপর ব্যাণ্ডেজটিকে নিয়ে যাওয়া হয় পায়ের পিঠের ওপর দিয়ে আঙ্গুলটির ডগা পর্যন্ত। এই পাকটিকে তারপর ঘোরানো সিঁড়ির মত ব্যাণ্ডেজের পাক জড়িয়ে জড়িয়ে নামিয়ে নিয়ে আসা হয় আঙ্গুলটির গোড়া পর্যন্ত। তারপর ব্যাণ্ডেজটিকে দুই আঙ্গুলের ফাঁকের ভেতর দিয়ে এনে পায়ের পিঠের ওপর দিয়ে নিয়ে চক্রাকারের পাকের সাহায্যে নিম্ন পদে আটকানো হয় (চিত্র — ১৩d)।

পা সম্পূর্ণ ভাবে ঢেকে ফেলা যায় সহজ ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে। নিম্ন পায়ের চতুর্দিকে পাক দিয়ে ব্যাণ্ডেজকে নিশ্চলভাবে আটকে পা-কে মুড়ে ফেলা হয় কতগুলি চক্রাকারের আল্গা পাক দিয়ে ও গোঁড়ালি থেকে আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত কতগুলি সামনে-পেছনে প্রত্যাবর্তনকারী পেঁচ দিয়ে পায়ের দুপাশ ঢেকে ফেলে। তারপর আঙ্গুল

থেকে আরম্ভ করে পায়ের ওপর দেওয়া হয় কতগর্লি ঘোরানে সি'ড়ির মত ওপরে ওঠানো পাক ও এই ভাবেই ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করা হয় ব্যান্ডেজটিকে নিম্ন পা পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে। হাঁটুতে সবচেয়ে ভাল অপসারী ব্যান্ডেজের পাক দেওয়া (চিত্র — ১০e)।

পেটের নিম্নার্দ্ধের ও উর্রর উর্দ্ধ-তৃতীয়াংশের ব্যান্ডেজ

ঐ জায়গাগর্লির ব্যান্ডেজ সহজে স্থানচ্যুত হয় বলে ব্যবহার করা হয় সংযর্ক্ত বন্ধনী, যাতে একই সঙ্গে ব্যান্ডেজ করে ঢাকা হয় পেট, নিতম্ব ও উর্র। ইলিয়াম অস্থির উর্দ্ধ উদ্গত অংশের ঠিক ওপরে দেওয়া হয় ব্যান্ডেজের কয়েকটি চক্রাকারের পাক। ব্যান্ডেজকে যদি নিশ্চল করে আটকাতে হয় দক্ষিণ উর্রর সঙ্গে, তাহলে চক্রাকারের পাকগর্লি দিতে হয় বাম থেকে ডাইনে, আর যদি আটকাতে হয় বাম উর্রর সঙ্গে তাহলে ডান থেকে বামে। শেষের চক্রাকারের পাককে কোমর থেকে কোনাকুনি নিচের দিকে নিয়ে যেতে হয় ত্রিকাস্থি, নিতম্ব ও উর্রর অস্থির বৃহৎ ঢিবির ওপর দিয়ে উর্রর সামনের উপরিভাগে। সেখান থেকে ব্যান্ডেজকে কোনাকুনি নিচমর্খি নিয়ে ঢাকা হয় উর্রর সম্মর্খ ও ভেতরের সারফেস এবং তারপর তাকে উর্রর পেছনদিক ঘর্রিয়ে আবার সামনে এনে বাঁকা ভাবে নিয়ে আসা হয় ওপর দিকে, সিম্ফাইসিস পিউবিসের ওপর দিয়ে ইলিয়াম অস্থির ওপর দিয়ে কোমর ও তারপর কোমরকে বেষ্টন করে। এর পরবর্তী পাকগর্লি পর্নরাবৃত্তি করে পর্ববতী
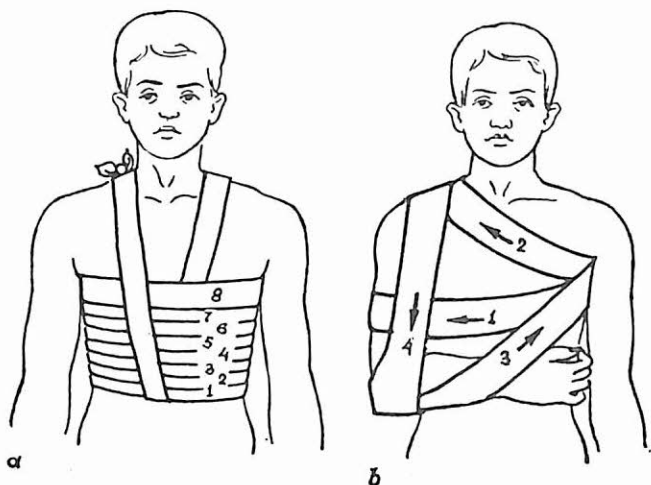
চিত্র — 14: ব্ুকের ওপর বাঁধা বন্ধনী
a — ঘোরানো সি'ড়ির মত পে'চ দেওয়া বন্ধনী; b — ডেজো'র বন্ধনী। সংখ্যা দিয়ে স্ূচিত করা হয়েছে ব্যাণ্ডেজের পে'চগ্ুলির পরম্পরতা।

পাকের বাঁকা পথ তবে প্রতিবারেই তাকে একটু একটু ওপরে সরিয়ে। ঘোরানো এই রকম সি'ড়ির মত পাক ও গমের মঞ্জরীর মত পরতে পরতে পাক একত্রে দেওয়ার ফলে উর্ু, নিতম্ব, কুচ্কি ও তলপেটের অঞ্চলে যথেষ্ট শক্ত ও নিশ্চল ব্যাণ্ডেজ বাঁধা সম্ভব হয় (চিত্র — ১৩f)।

বক্ষপিঞ্জরের ব্যাণ্ডেজ। বক্ষপিঞ্জরের ওপর যে সব ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয় তার মধ্যে সবচেয়ে সহজ ব্যাণ্ডেজ হল ঘোরানো সি'ড়ির মত ব্যাণ্ডেজ। ১·৫ মিটার লম্বা ঠিক তার মাঝখানটি পাতা হয় এক কাঁধের ওপর আর তার

দুই প্রান্ত ঝোলে সামনে ও পেছনে। বক্ষপিঞ্জরের ওপর সেই ঝোলানো ব্যাণ্ডেজের ওপর দিয়ে বুকের দেওয়ালে জড়ানো হয় আর এক প্রস্ত রোলার ব্যাণ্ডেজ নিচ থেকে ওপরে ,বগলতলা পর্যন্ত। ঝোলানো ব্যাণ্ডেজের শেষ অংশ দুটিকে তখন, বুক বেষ্টন করে বাঁধা ব্যাণ্ডেজকে আটকে ধরে রাখার জন্য অন্য কাঁধের উপর তুলে গিঁট বাঁধতে হয়। ধরে রাখার এই ব্যাণ্ডেজ বুকের ওপরকার সিঁড়ির মত ঘোরানো ব্যাণ্ডেজকে ভাল করে ধরে রাখে ও তাকে নিশ্চল করে (চিত্র — ১৪a)।

যে সব বিভিন্ন কায়দার ব্যাণ্ডেজ বন্ধন নির্ভরযোগ্য ভাবে স্কন্ধবৃত্ত ও উর্দ্ধ বাহুকে বুকের সঙ্গে আটকে নিশ্চল করে রাখে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রচলিত ডেজো'র ব্যাণ্ডেজ (চিত্র — ১৪b)। উর্দ্ধবাহুর অস্থিভঙ্গে, অক্ষকাস্থি ভঙ্গে ও স্কন্ধের অস্থিসন্ধির সন্ধিচ্যুতি সেট করার পর প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে এ ব্যাণ্ডেজ ব্যবহার করা হয়। এই ব্যাণ্ডেজ বাঁধার আগে হাতের কণুই ভাঁজ করে নিতে হয় সমকোণ রচনা করে, বগলতলায় আটকাতে হয় একটি তুলোর বালিশের মত পুটুলি। কয়েক বার চক্রাকারে ব্যাণ্ডেজের পাক দিয়ে উর্দ্ধবাহুকে আটকানো হয় বক্ষপিঞ্জরের সঙ্গে — পাকগুলি দিতে হয় দেহের সুস্থ দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত উর্দ্ধবাহুর দিকে (যাকে বাঁধতে হবে)। এর পরবর্তী ব্যাণ্ডেজের পাক দেওয়া হয় ব্যাণ্ডেজটিকে সুস্থ দিককার বগলতলার তলা দিয়ে বুকের সামনের উপরিভাগে এনে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত দিকের কাঁধের ওপর দিয়ে পেছনে নিয়ে গিয়ে নামানো হয় সোজা নিচে কণুই-এর তলা পর্যন্ত। সেখানে পুরোবাহুকে নিচ দিক থেকে আটকে ধরে

রাখার ব্যবস্থা করে ব্যাণ্ডেজের পাকটিকে এর পরের পাকে নিয়ে যাওয়া হয় সুস্থ দিকের বগলতলা দিয়ে পিঠে। পিঠ দিয়ে তারপর ব্যাণ্ডেজটিকে নিয়ে যাওয়া হয় ক্ষতিগ্রস্ত দিকের কাঁধে ও সেখান থেকে খাড়া ভাবে ঊর্দ্ধ বাহুর সামনে দিয়ে কনুই-এর নিচ পর্যন্ত নামিয়ে আবার তাকে পিঠ দিয়ে কোনাকুনি ভাবে নিয়ে যাওয়া হয় সুস্থ দিকের বগলতলায় ও তার তলা দিয়ে বুকের সামনে। এর পর ঐ (২নং, ৩নং, ৪নং) বাঁকা পাকগুলির বারকয়েক পুনরাবৃত্তি করা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত স্কন্ধবৃত্তকে পুরোপুরি ভাবে না আটকানো যাচ্ছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, ডেজো'র ব্যাণ্ডেজের পেঁচগুলি কখনই সুস্থ কাঁধের ওপর দিয়ে যায় না, আর তার বুকের সামনেকার ও পিঠের বাঁকা পেঁচগুলি সমবাহু ত্রিভুজ রচনা করে।

বক্ষপিঞ্জরের ওপর সহজে ব্যাণ্ডেজের সামগ্রী ধরে রাখা যায় জালি জালি পাইপ আকারের স্থিতিস্থাপক ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে। আপন স্থিতিস্থাপকতার গুণে পাইপ আকৃতি ব্যাণ্ডেজ ড্রেসিং-এর সমস্ত সামগ্রী ভাল করে আটকে রাখে অথচ শ্বাস-প্রশ্বাসের কোন কষ্ট সৃষ্টি করে না।

শক্ত ব্যাণ্ডেজ

'প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস' ব্যাণ্ডেজ। শক্ত ব্যাণ্ডেজগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভাল হল প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস ব্যাণ্ডেজ যা ব্যবহারে প্রয়োগ করেন ন. ই. পিরগভ ১৮৫৪ সালে। অস্থিভঙ্গ ও অস্থিরোগ চিকিৎসায়, ট্রম্যাটোলজি ও অর্থোপেডি বিভাগে এ ব্যাণ্ডেজ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

প্ল্যাষ্টার করার জন্য ব্যবহার করা হয় বিশেষ প্ল্যাস্টার অফ প্যারিস-এর প্ল্যাষ্টার ব্যাণ্ডেজ বা শুকনো জিপসাম পাউডার মাখানো গজের টুকরো। প্ল্যাষ্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজের বেশী রকম নমনীয়তার জন্য তাকে দেহের যে কোন অংশে, সে অংশটিকে অনড় ভাবে আটকে রাখার জন্য ব্যবহার করা সম্ভব।

প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস — সাদা গুঁড়ো, জলের সঙ্গে মেশালে তা নমনীয় জিনিষে পরিবর্তিত হয় কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তা শুকিয়ে কাঠের মত শক্ত হয়। প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজ কারখানায় তৈরী করে বিক্রী হয়, কিন্তু নিজেও তা বানিয়ে নেওয়া যায়।

প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজ তৈরী করার কায়দা। টেবিলের ওপর পাতলা করে প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর গুঁড়ো ছাড়ানো হয়, যার ওপর তারপর পাতা হয় ২-৩ মিটার লম্বা গজের ব্যাণ্ডেজ ও তার ওপর আবার পাতলা করে ছড়ানো হয় প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস ও জোরে জোরে হাতের ঘষায় ব্যাণ্ডেজের ফাঁকগুলিকে ভর্তি করা হয় প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর গুঁড়ো দিয়ে। এর পর প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস মাখানো ব্যাণ্ডেজের ঐ অংশটিকে হাল্কা করে গুটিয়ে এই ভাবেই আবার তার বাকি অংশে প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস মাখানো হয় ও গুটানো হয়।

প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজ দেহের নগ্ন চামড়ার ওপরও বাঁধা যায় বা কিছু (তুলো গজ কাপড় প্রভৃতি) একটা পেতে নিয়ে তার ওপর বাঁধা হয়। অস্থিভঙ্গের চিকিৎসায় কিছু না পেতে, নগ্ন চামড়ার ওপরই তা বাঁধা

হয়। প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয় কয়েক ভাবে:

(১) সোজা চক্রাকারে ব্যাণ্ডেজ করে, যাতে ব্যাণ্ডেজের চক্রাকারের পেঁচ বসানো হয়; (২) প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজের টুকরো বা পট্টি বসানো, যার সাহায্যে দেহের অন্তর্ভাগটিকে আগে অনড় করে নিয়ে তাকে আটকানো হয় দেহের সঙ্গে নরম ব্যাণ্ডেজের চক্রাকারের পাকের সাহায্যে; (৩) প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজের টুকরো বা পট্টি লাগিয়ে তাকে আটকানো, তার ওপর প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজের চক্রাকারের পাক দিয়ে।

প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজ বাঁধার পদ্ধতি। যখন প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজ বাঁধার জন্য সব প্রস্তুত, অর্থাৎ দেহপ্রান্তটিকে নগ্ন করা হয়েছে, অস্থিভঙ্গের জায়গাটিকে বেদনাবিহীন করা হয়েছে, ভাঙ্গা হাতের টুকরাগুলিকে জায়গা মত বসানো হয়েছে, দেহপ্রান্তটিকে প্রয়োজনীয় অবস্থানভঙ্গিতে রাখা হয়েছে, ইত্যাদি — সব প্রস্তুত, তখন ভিজানো হয় প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যাণ্ডেজ। একটি গামলায় ঢালা হয় ঘরের ভেতরকার উত্তাপযুক্ত জল ততখানি পরিমাণ যাতে ব্যাণ্ডেজটিকে পুরোপুরি ডোবানো যায়। ব্যাণ্ডেজ যখন পুরোপুরি ভিজে ওঠে (সেটা বোঝা যায়, ব্যাণ্ডেজ-চোবানো জলে আর গ্যাসের বুদ্‌বুদ্ ওঠে না) তখন তাকে জল থেকে তুলে নিয়ে দু'হাতে চাপা হয় বাড়তি জল বের করে দেওয়ার জন্য। ব্যাণ্ডেজকে চাপা হয় তার ধারগুলি থেকে মাঝখানের দিকে যাতে প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর পদার্থ ব্যাণ্ডেজ

থেকে বেরিয়ে না যায়। ব্যান্ডেজ বাঁধা শুরু করতে হয় দেহপ্রান্তটির অন্তভাগ থেকে।

ব্যান্ডেজের চক্রাকারের পাকের সাহায্যে দেহের প্রয়োজনীয় অংশটিকে ধারাবাহিক ভাবে ঢেকে ফেলা হয়। যাতে ব্যান্ডেজের পাকগুলি পরস্পরের সঙ্গে ভালভাবে আটকায় ও ব্যান্ডেজ করার পর ব্যান্ডেজটি অঙ্গের সঠিক আকৃতি বজায় রাখে, তার জন্য ব্যান্ডেজ করার সময় সব সময় তার পাকগুলিকে পালিশ করে দিতে হয় ও প্লাস্টার অফ্ প্যারিস দিয়ে আকৃতি দান করতে হয়। এতে ব্যান্ডেজ দেহের গোটা অংশটিকে শক্ত করে আটকে ধরে ও অস্থিভঙ্গের জায়গাটিকে নড়াচড়া করতে দেয় না।

প্লাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যান্ডেজ সাধারণত বাঁধা হয় দীর্ঘ দিনের জন্য (সাধারণত যতদিন পর্যন্ত না ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগছে), তাকে বদল করা হয় কেবলমাত্র তখনই যখন দেখা যায় যে ব্যান্ডেজ নষ্ট হয়ে গেছে অথবা তাকে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

প্লাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্য বিশেষ অবস্থার পরিবেশের দরকার আর প্ল্যাষ্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যান্ডেজ পুরোপুরি শুকোতেও দরকার হয় কয়েক ঘণ্টা সময়। তাই, প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে প্লাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যান্ডেজ বলতে গেলে আদৌ ব্যবহার করা হয় না। এক এক সময় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের প্রয়োজন হয় সেই সমস্ত রোগীদের যাদের চিকিৎসা সাহায্যের বহির্বিভাগ চক্রাকারের প্লাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যান্ডেজ করা হয়েছে (যেমন পুরোবাহুর ও হাতের প্লাস্টার)। যদি সে ব্যান্ডেজ করা হয়ে থাকে বেশী রকম চেপে বা জখমের

দরুণ দেহপ্রান্তের স্ফীতি বাড়তে থাকে তবে এতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যাতে স্নায়ুগুলির ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে এবং তার চেয়েও যা বেশী বিপদজনক, তা হচ্ছে এই যে, চাপ পড়ে রক্তবাহী শিরাগুলির ওপর। শেষেরটির কারণে দেহপ্রান্তের পচন বা গ্যাংগ্রীন আরম্ভ হয়ে যেতে পারে। এই অবস্থায় দেখা দেয় দেহপ্রান্তের উত্তরোত্তর বেদনা ও যন্ত্রণা বৃদ্ধি ও প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস'-এর নিচের অংশ ঠান্ডা হয়ে যাওয়া। চিকিৎসার এই জটিলতায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে এক্ষেত্রে প্রথম কাজ হল অবিলম্বে রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। যদি তা সম্ভব না হয়, অথবা দেখা যায় যে, হাসপাতালে নিয়ে যেতে হলে ১ থেকে ২ ঘন্টার বেশী সময় লেগে যাবে তা হলে দরকার, প্ল্যাস্টার অফ্ প্যারিস-এর ব্যান্ডেজ কেটে তাকে সেই দেহপ্রান্ত থেকে না সরিয়ে নিয়ে তারই ওপর সর্পিল নরম ব্যান্ডেজ করে দেওয়া। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে আরও কম ব্যবহৃত হয় সেই সব শক্ত ব্যান্ডেজ যাতে ব্যান্ডেজকে শক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয় আঠা, জিলাটিনল, ডেক্সট্রিন ও অন্যান্য পদার্থ। ইদানীং এ কাজের জন্য বিশেষ ভাবে সুসজ্জিত জরুরী সাহায্যের এ্যাম্বুলেন্সে রাখা হয় তাড়াতাড়ি শক্ত হয়ে যায় — এমন প্লাস্টিকের ব্যবস্থা। অনুরূপ প্লাস্টিকের তৈরী স্প্লিন্ট বা অস্থিধারক খুব শক্ত অথচ রোগীর কোন খারাপ অনুভূতি সৃষ্টি করে না অন্যদিকে দেহ প্রান্তকে নিশ্চল করে ধরে রাখতে ভাল সাহায্য করে।

শক্ত বন্ধনী বাঁধার জিনিষের মধ্যে ধরা হয়, রোগীকে গাড়ীতে করে স্থানান্তরিত করার সময় ব্যবহৃত সমস্ত ধরনের

স্প্লিণ্ট — কাঠের তৈরী, মোটা তারে তৈরী, হাওয়া দিয়ে ফোলানো যায়—এমন জিনিষে তৈরী সমস্ত স্প্লিণ্ট, তাছাড়াও হাতের কাছে পাওয়া বিভিন্ন জিনিষে তৈরী সমস্ত অস্থিধারক ব্যবস্থা পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত স্প্লিণ্টগুলি সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত আলোচনা দেখুন তৃতীয় পরিচ্ছেদে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের সাধারণ নিয়মাবলী

দুর্ঘটনা, আকস্মিক রোগ অনেক সময় এমন অবস্থার পরিবেশে দেখা দেয় যখন না আছে হাতের কাছে ওষুধ-পত্র, না আছে ব্যান্ডেজ বাঁধার সামগ্রী, না আছে ভাল আলো, না আছে কোন সাহায্যকারী লোকজন, না আছে আহত অঙ্গকে নিশ্চল করে বেঁধে দুস্থকে পরিবহণ করার ব্যবস্থা। এমতাবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদানকারীর পক্ষে, আত্মহারা না হয়ে নিজের সমস্ত উদ্যোগ ও কার্যক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আহতের বা আকস্মিক রোগাক্রান্তের জীবন বাঁচানোর জন্য নিজের সাধ্যমত ও সুযোগ মত যতদূর সম্ভব করনীয় ব্যবস্থাদি অবলম্বন করার মূল্য খুবই বেশী। এর জন্য বিভিন্ন ধরনের আঘাত সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা ও বিভিন্ন রোগের উপসর্গগুলি জানা এবং কিভাবে তাতে প্রাথমিক সাহায্য দান করতে হয়, সে সব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা অতি প্রয়োজন।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান করতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা দরকার: — ১) সাহায্যকারীর সমস্ত পদক্ষেপ হতে হবে অবস্থার উপযোগী, সুচিন্তিত, দ্বিধাহীন, দ্রুত ও অচঞ্চল; ২) সবচেয়ে আগে দরকার অবস্থার

পরিস্থিত বোঝা ও সে অনুযায়ী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাতে যে কারণে দুর্দশাগ্রস্তের ক্ষতি হয়েছে সে কারণগুলির ক্রিয়া দূর করা যায় (জল থেকে টেনে তোলা, আগুন-লাগা ঘর থেকে বের করে নিয়ে আসা, গ্যাস-জমা ঘর থেকে দুর্দশাগ্রস্তকে উদ্ধার করা, আগুন লাগা জামা-কাপড়ের আগুন নেভানো ইত্যাদি); ৩) তাড়তাড়ি ও সঠিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তের অবস্থার মূল্যায়ন করা দরকার। কোন্ অবস্থার পরিবেশে লোকটির চোট লেগেছে বা তার আকস্মিক রোগ দেখা দিয়েছে, কখন ও কোথায় সে চোট লেগেছে — তা জানা বিশেষ দরকার যদি দুর্দশাপন্ন বা রোগগ্রস্ত লোকটি অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। দুর্দশাপন্নকে পরীক্ষা করে ঠিক করতে হয়, লোকটি বেঁচে আছে না মরে গেছে, কি ধরনের তার চোট ও চোট কতটা সাংঘাতিক, রক্তপাত হয়েছিল কি না এবং এখনও তা চলছে কি না;

৪) দুর্দশাপন্নকে পরীক্ষা করে তার ভিত্তিতে ঠিক করা, কি কি উপায়ে ও কোন পরম্পরায় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে;

৫) বাস্তব অবস্থা, স্থান ও সুযোগ বিচার করে ঠিক করতে হয় প্রাথমিক চিকিৎসা দানে কি কি করতে হবে ও তা সম্পূর্ণ ভাবে পালন করা;

৬) প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান করে রোগীকে পরিবহণের জন্য তৈরী করা;

৭) রোগীকে পরিবহণ করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা সংগঠিত করা;

৮) আহত বা আকস্মিক রোগাক্রান্ত রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর আগ পর্যন্ত তার ওপর নজর রাখা;

৯) শুধু যে ঘটনাস্থলেই যতদূর সম্ভব সাহায্য দান করা তা নয়, হাসপাতালে পরিবহণের পথেও সে সাহায্য দান করা।

রোগী জীবিত না মৃত তা নির্ণয়ের উপসর্গগুলি। ভীষণ চোট লাগলে, বৈদ্যুতিক আঘাতপ্রাপ্ত হলে, ডুবে গেলে, দম আটকে গেলে, বিষক্রিয়া হলে এবং আরও নানা অসুখে রোগী জ্ঞান হারাতে পারে, অর্থাৎ এমন অবস্থা আসতে পারে যখন রোগী নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকে, প্রশ্ন করলে সাড়া দেয় না ও পারিপর্শ্বিক অবস্থার প্রতি তার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। এ অবস্থা ঘটে কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের ক্রিয়াকলাপের ব্যতিক্রমের ফলে।

মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপে ব্যতিক্রম দেখা দেওয়া সম্ভব যদি:—১) সোজাসুজি মস্তিষ্কে আঘাত লাগে (মাথায় কোন কিছুর আঘাত, মস্তিষ্কের কংকাশন, মস্তিষ্ক-পদার্থ থেৎলে যাওয়া, মস্তিষ্কের রক্তপাত, বিদ্যুৎ-আঘাত), বিষক্রিয়া হয় তথা অত্যধিক মদ্যপানের বিষক্রিয়ায় ও অন্যান্য কারণে;

২) মস্তিষ্কের রক্তসরবরাহের ব্যতিক্রম ঘটে (রক্তপাত, মূর্ছা যাওয়া, হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধ হওয়া বা তার ক্রিয়াকলাপে বড় ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া);

৩) দেহে অম্লজান প্রবেশ করা বন্ধ হয় (গলাটিপে ধরা, ডুবে যাওয়া, ভারী জিনিষ দিয়ে বক্ষপিঞ্জর চেপটে দেওয়া);

৪) রক্তের অম্লজানে সংপৃক্ত হওয়ার ক্ষমতা কমে যায় (বিষক্রিয়া, পদার্থ বিনিময়ের ব্যতিক্রম — যেমন ডাইয়াবেটিসে, ভীষণ জ্বরে);

৫) বেশী রকম ঠান্ডা বা বেশী রকম গরমে অনেকক্ষণ

চিত্র — 15: কোন্ কোন্ বিন্দুতে ধমনীর ওপর নাড়ী অনুভব করা যায়; কাটা দাগ দিয়ে দেখানো হয়েছে কোন্ স্থানে হৃৎপিন্ডের আওয়াজ শোনা হয়
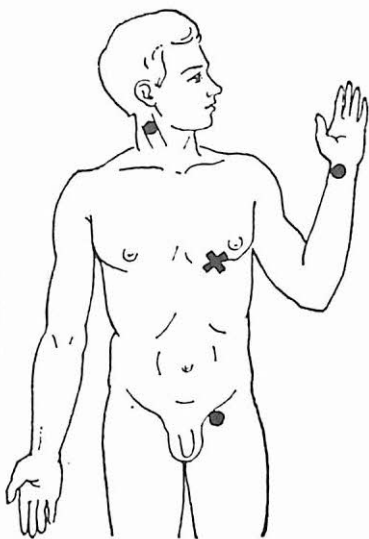
চিত্র — 16: আয়না ও তুলোর পোল্‌তের সাহায্যে জীবিত থাকার লক্ষণ নির্ধারণ করা। বিশদ বিবরণ এই পরিচ্ছেদে দেওয়া হয়েছে।
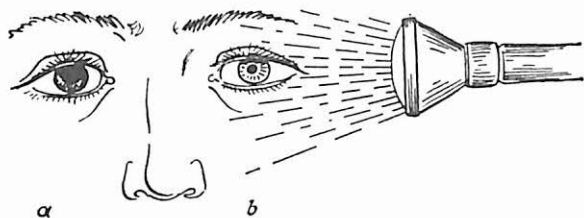
চিত্র — 17: আলোর প্রতি চোখের তারার প্রতিক্রিয়া নির্ধারণ। ব্যাখ্যা রয়েছে টেক্সটে।

থাকা যায় (বরফে জমে যাওয়া, তাপ-আঘাত, বিভিন্ন অসুখের অতিমাত্রার জ্বর)।

সাহায্যদানকারীকে সম্পূর্ণ সঠিক ভাবে ও তাড়াতাড়ি জ্ঞান হারানো অবস্থাকে মৃত্যু থেকে তফাৎ করতে হবে। যদি বেঁচে থাকার সামান্যতম উপসর্গও পাওয়া যায়, তাহলে প্রয়োজন অবিলম্বে প্রাথমিক সাহায্য দেওয়া এবং সর্বাগ্রে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা।

জীবন যে আছে তার উপসর্গগুলি: —

১) হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি বজায় থাকা। হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি আছে কিনা তা নির্ণয় করা হয় হাতের বা কানের সাহায্যে, তা বুকের বাম অংশের ওপর পেতে;

২) ধমনীগুলিতে নাড়ীর স্পন্দন সুরক্ষিত থাকা। নাড়ী আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয় গলায় (ক্যারটিড ধমনীর ওপর), হাতের কব্জিতে (বহিঃপ্রকোষ্ঠ ধমনীর ওপর) কুচকিতে (উরতের ধমনীর ওপর) (চিত্র—১৫);

৩) শ্বাস-প্রশ্বাস বজায় থাকা। শ্বাস প্রশ্বাস চলছে কি না তা নির্ণয় করা হয় বক্ষপিঞ্জরের ও পেটের ওঠানামা থেকে।

চিত্র — 18: অবধারিত মৃত্যুর লক্ষণ
a — জীবিত লোকের চোখ; b — মৃতের ঘোলাটে অচ্ছোদপটল; c — "বেড়াল চোখ" উপসর্গ

রোগীর মুখের ও নাকের রন্ধ্রের কাছে আয়না নিলে তাতে শ্বাসের জলীয় বাষ্পে কাচ ঘোলাটে হয়ে যায়, নাকের রন্ধ্র দুটির কাছে এক টুকরো তুলো বা ব্যান্ডেজের সুতো ধরলে তা নড়তে থাকে (চিত্র — ১৬);

৪) চোখের তারারন্ধ্রে আলোর প্রতিক্রিয়া সুরক্ষিত থাকা। যদি চোখে আলোর রশ্মি ফেলা হয় (যেমন টর্চলাইটের আলো) তবে দেখা যায় যে চোখের তারারন্ধ্র সংকুচিত হয়েছে — একে বলে চোখের তারারন্ধ্রের ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া। দিনের বেলার আলোতে এই প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা

করা চলে এ ভাবে: কিছুক্ষণের জন্য হাত দিয়ে চোখ ঢেকে দেওয়া হয়, তারপর হাত তাড়াতাড়ি এক পাশে সরিয়ে নিলে লক্ষ্য করা যায় তারারন্ধ্রের সংকোচন (চিত্র — ১৭)।

বেঁচে থাকার উপসর্গগুলি রক্ষিত থাকলে, অবিলম্বে দুর্দশাগ্রস্তকে উজ্জীবিত করার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার।

মনে রাখা দরকার যে, হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি, নাড়ীর স্পন্দন, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ও তারারন্ধ্রের আলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া না থাকা মানেই এই নয় যে, দুর্দশাগ্রস্তের জীবন একেবারে শেষ হয়ে গেছে। অনুরূপ উপসর্গগুলি ক্লিনিক্যাল মৃত্যুতেও দেখা দিতে পারে (পরে দেখুন), যখন একান্ত প্রয়োজন সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে দুর্দশাগ্রস্তকে পূর্ণভাবে সাহায্য করা।

সাহায্য দানের কোন অর্থ হয় না যদি দেখা যায় যে মৃত্যুর লক্ষণগুলি পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। সে লক্ষণগুলি হল: —

১) চোখের অচ্ছোদপটলের রঙ ঘোলাটে হওয়া ও তা শুষ্ক হওয়া;

২) "বেড়াল চোখ"র উপসর্গ দেখা দেওয়া, যাতে চোখে চাপ দিলে চোখের তারারন্ধ্রের আকৃতি এমনভাবে বিকৃত হয় যে তা মনে করিয়ে দেয় বেড়ালের চোখের কথা;

৩) দেহ ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া ও তাতে মৃত্যুর ছোপ-ছোপ দাগ আবির্ভূত হওয়া। এই সব নীলাভ-বেগুনী রঙের ছোপ-ছোপ দাগ চামড়ার উপর আবির্ভূত হয়। মৃত দেহ যদি চিৎ-করা অবস্থায় থাকে তা হলে সে দাগগুলি দেখা দেয় অংসফলক, কোমর ও নিতম্ব অঞ্চলে। আর যদি

মৃতদেহ উপুড়-করা অবস্থায় থাকে তবে তা দেখা দেয় মুখমণ্ডলে, গ্রীবাদেশে, বুক ও পেট অঞ্চলে;

৪) দেহ শক্ত হয়ে যাওয়া। এ উপসর্গ হল মৃত্যুর নির্ভুল লক্ষণ এবং তা দেখা দেয় মৃত্যুর ২ থেকে ৪ ঘণ্টা পরে।

দুর্দশাগ্রস্তের বা রোগাক্রান্তের অবস্থা মূল্যায়ন করে তারপর আরম্ভ করতে হয় প্রাথমিক সাহায্য দান, যার চরিত্র নির্ভর করে, কী ধরনের আঘাত লেগেছে, কী পরিমাণ জখম হয়েছে এবং দুর্দশাগ্রস্তের সাধারণ অবস্থা কী, তার ওপর। বিভিন্ন ধরনের জখমে ও বিভিন্ন অসুখে সাহায্য দিতে কী কী করতে হয় ও কিসের পর কী করতে হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে এ পুস্তকের যথাযথ পরিচ্ছেদে।

প্রাথমিক সাহায্য দান করতে শুধু সে সাহায্যের পদ্ধতিগুলি জানাই যথেষ্ট নয়। তার সঙ্গে এও জানা দরকার, দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য দিতে কী করে ঠিক ভাবে এগুতে হয়, যাতে তাকে কোন উপরিআঘাত সহ্য করতে না হয়। ক্ষতের ওপর ব্যাণ্ডেজ করে রক্তপাত বন্ধ করা, উচ্চ উত্তাপে পুড়ে যাওয়া ঘা ঢেকে দেওয়া, রাসায়নিক পদার্থে পুড়ে যাওয়া চামড়ায় ওষুধ-পত্রাদি ব্যবহার করা প্রভৃতি সমস্ত কিছুর আগে দুর্দশাগ্রস্তের জামা-কাপড় খুলে নেওয়ার প্রয়োজন হয়।

ঠিক মত দুর্দশাগ্রস্তের জামা-কাপড় খুলে দেওয়ার কায়দা জানা থাকা খুব দরকার। যদি জখম হয় ঊর্দ্ধ দেহপ্রান্ত, তা হলে জামা খোলা আরম্ভ করতে হয় প্রথমে সুস্থ হাত থেকে। তারপর জখম হওয়া হাতটিকে যত্ন করে ধরে তা

থেকে জামা খুলে দিতে হয় সাবধানে জামার হাতা ধরে টেনে। যদি দুর্দশাগ্রস্ত চিৎ হয়ে শায়িত অবস্থায় থাকে ও তাকে উঠিয়ে বসানো সম্ভব না হয় তাহলে দেহের উপরের অর্দ্ধ ও হাত থেকে জামা খুলে দিতে হয় নিম্নলিখিত ক্রমপর্যায় পালন করে: খুব সাবধানে সার্টের (গাউনের, ওভারকোটের ও অন্য পোশাকের) পেছনের অংশ ধরে আস্তে আস্তে তা টেনে তুলতে হয় গলা পর্যন্ত ও তারপর মাথা গলিয়ে তাকে আনতে হয় বুকের ওপর। তারপর হাতা থেকে খুলে নিয়ে আসতে হয় সুস্থ হাত। সবশেষে মুক্ত করা হয় জখম হওয়া হাত, পোশাকের হাতা ধরে হাতের ওপর দিয়ে তাকে টেনে (পোশাককে না উল্টে)। ঐ একই ক্রমপর্যায় পালন করে দেহের নিম্নার্দ্ধ থেকে জামা-কাপড় খুলে দেওয়া হয়। বেশী রকম রক্তপাতে ও সাংঘাতিক ভাবে পুড়ে গেলে জামা-কাপড় বা পোশাক খোলার চেষ্টা না করে তাকে কেটে খুলে দিতে হয়।

জানা দরকার যে, জখম হওয়া, অস্থিভঙ্গ হওয়া, আগুনে পুড়ে যাওয়া, রোগীদের বেশী রকম নড়াচড়া করালে, এখান থেকে ওখানে নিয়ে গেলে, উপুড়, চিৎ বা এপাশ-ওপাশ করালে, বিশেষ করে তা যদি করানো হয় রোগীর ভাঙ্গা বা সন্ধিচ্যুত দেহপ্রান্ত ধরে, তাতে তার বেদনা বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে তার সাধারণ অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়তে পারে। দেখা দিতে পারে সক্, হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধ হওয়া, শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া। তাই জখম হওয়া দেহপ্রান্তকে তুলতে বা আহতকে তুলতে হয় খুব সাবধানে, দেহের আঘাতপ্রাপ্ত জায়গাটিকে নিচ থেকে ধরে রেখে।

ইম্মবিলাইজেশন বা নিশ্চলকরণ। প্রাথমিক সাহায্য দান

করতে বেশীর ভাগ কেসে দেহের জখম হওয়া অংশটিকে নিশ্চল করে রাখতে হয়। কোন কোন কেসে আবার এটাই প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের মূল কাজ। নিশ্চলকরণ, জখম হওয়া জায়গাটিকে শান্ত অবস্থায় রাখে যার ফলে ব্যথা কমে। এরই ফলে নিশ্চলকরণ হল সক্‌বিরোধী ব্যবস্থা, বিশেষ করে অস্থিভঙ্গে ও অস্থিসন্ধি জখমে। তা ক্ষতস্থানের ধারগুলির স্থানচ্যুতি রোধ করে ও ক্ষতস্থানে ইনফেকশণ প্রবেশ করা নিবারিত করে। নিশ্চলকরণ, ভাঙ্গা হাড়ের টুকরোগুলিকে স্বস্থানে মুখোমুখি ধরে রাখতে সাহায্য করে যাতে এ সবকেসে পরবর্তী শল্যচিকিৎসা সহজ হয়। অস্থিভঙ্গ কেসে রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর সময় ভাঙ্গা হাড় ঠিক মত নিশ্চল করে রাখতে পারলে হাড় জোড়া লাগে অনেক তাড়াতাড়ি।

নিশ্চলকরণ, জটিলতা সৃষ্টির বিপদ হ্রাস করে — ভাঙ্গা হাড়ের ধারাল ধারগুলির খোঁচায় রক্তবাহী শিরা, স্নায় জখম হওয়া এবং মাংসপেশী জখম হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।

পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত স্প্লিণ্ট বা অস্থিধারক। নিশ্চলকরণের জন্য ব্যবহৃত হয় কতগুলি বিশেষ জিনিষ, যেগুলিকে বলা হয় স্প্লিণ্ট বা অস্থিধারক। স্প্লিন্টগুলিকে দেহের জখম হওয়া জায়গায় পরিয়ে সেগুলিকে আটকে দেওয়া হয় ব্যাণ্ডেজ, বেল্ট, ফিতে বা অন্যান্য জিনিষের সাহায্যে।

কারখানায় তৈরী নানা রকমের স্প্লিণ্ট বা অস্থিধারক পাওয়া যায়: কাঠের তৈরী, মোটা তারের তৈরী, জালি পাতের তৈরী, প্লাস্টিকের তৈরী। ইদানীং হাওয়াভর্তি বেলুনের স্প্লিণ্টও ব্যবহৃত হচ্ছে, যেগুলি তৈরী রবার ও

প্লাস্টিকের সাহায্যে। জর্‌রী চিকিৎসা সাহায্যের সব এম্ব্‌লেন্সেই আজকাল রাখা হয় সমস্ত রকমের, পরিবহণের জন্য প্রচলিত স্প্লিণ্ট বা অস্থিধারক। ওগ্‌লিকে রাখা উচিত সমস্ত প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য সেটে, সমস্ত প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে, সমস্ত বহিঃচিকিৎসা কেন্দ্রে ও ওষ্‌ধের ডিস্পেন্সারিতে। নিশ্চলকরণের আদর্শ ব্যবস্থা না থাকলে তা করতে হয় তৎক্ষণাৎ উদ্ভাবিত স্প্লিণ্টের সাহায্যে, যা তৈরী করে নেওয়া চলে হাতের কাছে পাওয়া শক্ত জিনিষ দিয়ে: — কাঠের তক্তা, স্কি-করার কাঠের ফালি, লাঠি, বন্দ্‌ক, ছাতা প্রভৃতি।

ঊর্‌র অস্থিভঙ্গে পরিবহণ কালে ব্যবহৃত সবচেয়ে ভাল স্প্লিণ্ট বা অস্থিধারক হল ডিটেরিক্‌স-এর স্প্লিণ্ট যার সাহায্যে পায়ের কব্জি, হাঁটু ও কোমরের অস্থিসন্ধির ফলপ্রস্‌ নিশ্চলকরণের ব্যবস্থা করা যায়। এই স্প্লিণ্টে থাকে দ্‌টি পৃথক কাঠের তক্তা, যার দৈর্ঘ্য সহজে বদলানো যায় এবং একটি কাঠের পা-দানী। তার সঙ্গে যুক্ত থাকে মোচড় দেওয়ার ব্যবস্থাযুক্ত দড়ি।

এই স্প্লিণ্টকে পরানো হয় জামা-কাপড়ের ওপর দিয়ে আর কাঠের পা-দানীকে ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে আটকানো হয় রোগীর পায়ের সঙ্গে (জ্‌তো খ্‌লতে হয় না)। স্প্লিণ্ট আহতের উচ্চতা অন্‌যায়ী সেট করে নেওয়া হয় এমনভাবে যাতে তার বাইরের দিককার অংশটুকু (সেটাই বেশী লম্বা) ঠেকে গিয়ে বগলতলায় আর তার উল্টোদিকের শেষ অংশটি যেন চলে যায় পা-দানীর ১২-১৫ সেণ্টিমিটার নিচে; স্প্লিণ্টের ভেতর দিককার অংশ (লম্বায় ছোট) একদিকে গিয়ে ঠেকবে (ক্রাচের দিকে) দ্‌ই নিতম্বের মাঝখানে আর
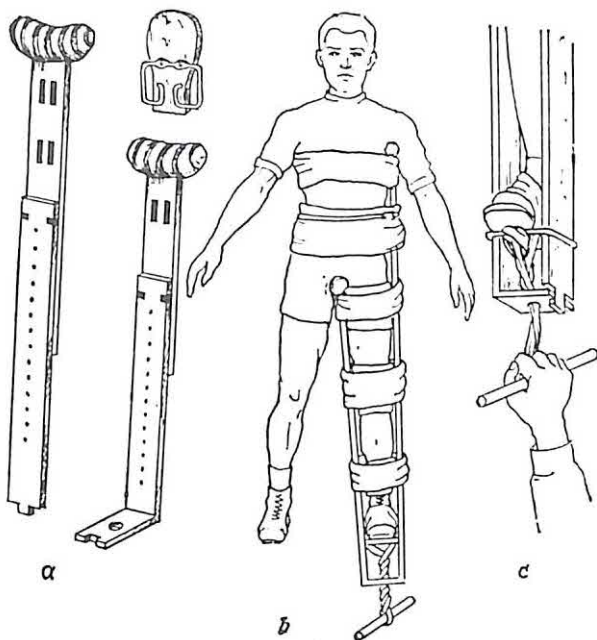
চিত্র — 19: ডিটেরিক্সে'র সাধারণ স্প্লিণ্ট
a — স্প্লিণ্টের বিভিন্ন অংশ; b — ফিট্-করা অবস্থায় স্প্লিণ্টের চেহারা; c — অন্তভাগে ঘ্ুরিয়ে ঘ্ুরিয়ে টানা দেওয়ার ব্যবস্থা

উল্টো দিকের শেষ অংশ চলে যাবে পা-দানীর থেকে ১২-১৫ সেণ্টিমিটার নিচে। দ্ুই পাশের এই স্প্লিণ্টের অংশ দ্ুটিকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় পা-দানীর দ্ুই পাশের কড়ার ভেতর দিয়ে গলিয়ে, তারপর সেগ্ুলিকে পরান হয় বগলতলা ও কুচাকির নিচে। কাঠের পা-দানীর নিচে

স্প্লিন্টের দুই পাশের অংশ দুটিকে কব্জাযুক্ত প্লেট দিয়ে আটকানো হয়। গোটা স্প্লিন্টকে আটকানো হয় বুক, ঊরু ও নিম্ন পায়ের সঙ্গে ফিতে দিয়ে, ব্যান্ডেজ দিয়ে ও অন্যান্য জিনিষ দিয়ে। কাঠের পা-দানী থেকে দুই পাশ যুক্ত করার প্লেটের ভেতর দিয়ে নিয়ে আসা হয় শক্ত দুভাজ করা দড়ি, যাকে পাক দিয়ে দেহপ্রান্তটির ওপর খানিকটা টান সৃষ্টি করা যায় (চিত্র — ১৯)।

পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য স্প্লিন্টগুলির ভেতর বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছে মোটা তার দিয়ে সিঁড়ির মত করে তৈরী স্প্লিন্ট — ক্রামারের স্প্লিন্ট। তার দৈর্ঘ্য ১ মিটার, আড়াআড়ি মাপ — ১০ থেকে ১৫ সেণ্টিমিটার (চিত্র — ২০)। স্প্লিন্টটিকে যে কোন আকারের রূপ দেওয়া চলে এদিক-ওদিক বাঁকিয়ে, আর যদি আরও লম্বা স্প্লিন্টের প্রয়োজন হয় তাহলে ২-৩টা অনুরূপ স্প্লিন্টকে এক সঙ্গে জুড়ে দেওয়া চলে। পুরোবাহু, হস্ত, চরণ নিশ্চল করতে ব্যবহার করা হয় জালি-জালি স্প্লিন্ট, যা তৈরী করা নরম পাতলা তার দিয়ে। ফলে এই স্প্লিন্টকে যে কোন আকার দান করা চলে। জালি-জালি স্প্লিন্টকে অনেক সময় অন্য স্প্লিন্টের সঙ্গে বাড়তি স্প্লিন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই সব স্প্লিন্ট ছাড়াও রয়েছে প্লাস্টিক, প্লাই-উড ও পিচবোর্ড দিয়ে তৈরী স্প্লিন্টের সেট। ওগুলি তারের স্প্লিন্টের চেয়ে কম সুবিধাজনক হলেও পুরোবাহু ও হস্ত নিশ্চল করার জন্য অনায়াসে ব্যবহার করা চলে। দেহের নিশ্চল করে রাখা অংশের কলায় যাতে চোট না লাগে তার জন্য তারের তৈরী স্প্লিন্টগুলিকে দেহের সঙ্গে আটকানোর আগে তার ওপর ভাল করে তুলোর প্যাড পেতে নেওয়া ভাল।

চিত্র — 20: তারের তৈরী পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত স্প্লিণ্ট

a

b
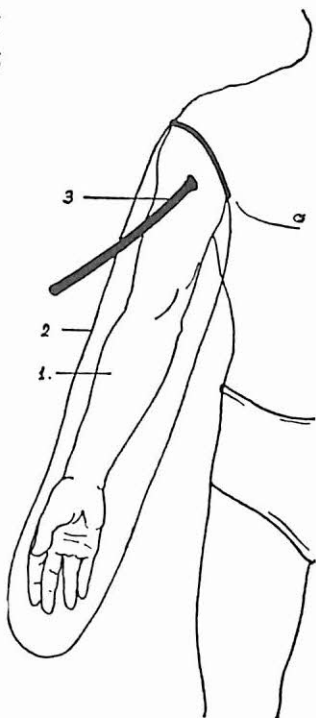
চিত্র — 21: ঊর্দ্ধবাহুকে নিশ্চল করে রাখার জন্য হাওয়া দিয়ে ফুলানো স্প্লিণ্ট 1 — স্প্লিণ্টের ভেতর দিককার দেওয়াল; 2 — স্প্লিণ্টের বাইরের দিককার দেওয়াল; 3 — টিউব, যার ভেতর দিয়ে স্প্লিণ্টে পাম্পের সাহায্যে হাওয়া প্রবেশ করানো হয়

বিশেষ সুবিধাজনক হল হাওয়া দিয়ে ফোলানো স্প্লিন্ট, যা প্রকৃতপক্ষে দুই দেওয়াল যুক্ত কক্ষের মত জিনিস। ভেতরের দেওয়াল রবারের, যা সহজেই দেহপ্রান্তের ওপর বসে গিয়ে তারই আকৃতি গ্রহণ করে, আর বাইরের দেওয়াল শক্ত প্লাষ্টিকের স্প্লিণ্টে হাওয়া প্রবেশ করানোর পর দেহপ্রান্তকে তা নির্ভরযোগ্য ভাবে নিশ্চল করে ধরে রাখতে সাহায্য করে (চিত্র — ২১)।

দুর্দশাগ্রস্তকে পরিবহণের ব্যবস্থা। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের মূল্যবান কাজ হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সঠিকভাবে রোগীকে বা দুর্দশাগ্রস্তকে যান-বাহনে করে হাসপাতালে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা। পরিবহণ কার্য হতে হবে দ্রুত, বিপদমুক্ত ও সরল। মনে রাখা দরকার যে, পরিবহণ কালে রোগী যদি ব্যথা পেতে থাকে, তাতে হৃৎপিন্ড ও ফুসফুসের কাজের গন্ডগোল ও সক্ প্রভৃতি নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। আহত বা রোগগ্রস্তকে কী উপায়ে পরিবহণ করতে হবে তা নির্ভর করে রোগীর অবস্থা, আঘাত বা অসুখের চরিত্র এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানকারীরসামনে পরিবহণের কি সুবিধা আছে বা নেই — তার ওপর।

শহরে ও বড় বড় জনপূর্ণ লোকালয়ে দুর্দশাগ্রস্তকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পরিবহণ করার সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হল জরুরী চিকিৎসা সাহায্যের ষ্টেশনের সাহায্য নেওয়া। প্রথম সংকেতেই (টেলিফোনে খবর পেয়ে, লোক মারফৎ খবর পেয়ে বা পুলিশ পোষ্ট ইত্যাদি থেকে খবর পেয়ে) তারা অবিলম্বে দুর্ঘটনাস্থলে পাঠায় নানা যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত বিশেষ এম্বুলেন্স গাড়ী। সাধারণত

তা হল হাল্কা মোটরগাড়ী বা ছোট বাস, যার ভেতর থাকে বসার সিট ও স্ট্রেচার রাখার জায়গা। স্ট্রেচার সহজে গাড়ীতে ঢোকানো যায় তার বডির পেছনে অবস্থিত দরজা দিয়ে। স্ট্রেচার রাখা হয় গাড়ীর ভেতর অবস্থিত একটি চাকা যুক্ত টেবিলের ওপর, যাকে গাড়ীর মেঝেতে পাতা লাইনের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে সামনে-পেছনে ঠেলা যায়। টেবিলের সাথে যুক্ত করা থাকে কতগুলি বিশেষ স্প্রিং, যা গাড়ী চলা কালে ঝাঁকি লাগা থেকে রক্ষা করে। জরুরী চিকিৎসা সাহায্যের ষ্টেশনে থাকে আরও নানা রকমের এ্যাম্বুলেন্স — বিশেষ যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত বাস। সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যাপক প্রচলিত এ্যাম্বুলেন্স-বিমানের ব্যবহার। পৃথক পৃথক অঞ্চল থেকে রোগী পরিবহণ, এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টারের সাহায্যেও করা চলে।

যে সব কেসে এ্যাম্বুলেন্স ডাকা সম্ভব হচ্ছে না বা তার কোন ব্যবস্থা নেই, সে সব কেসে পরিবহণ করতে হয় যে কোন যান-বাহনের সাহায্যে (লরি, ঘোড়ার গাড়ি, ঠেলাগাড়ি, ঘোড়ার পিঠে স্ট্রেচারের মত ব্যবস্থা বেঁধে, শ্লেজগাড়িতে করে, জলযানে করে ইত্যাদি)।

কোন রকম যান-বাহনের ব্যবস্থা না থাকলে দুর্দশাগ্রস্তকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করতে হয় স্ট্রেচারে করে, জিনের স্ট্রাপের সাহায্যে বা কোলে করে।

চিকিৎসায় ব্যবহৃত স্ট্রেচার আহত বা রোগগ্রস্তকে সবচেয়ে শান্ত ও আরামপ্রদ অবস্থায় রেখে তাকে যান-বাহনে তুলে দিতে এবং সেখান থেকে নামাতে ও নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিতে, হাসপাতালর ঠেলাগাড়িতে স্থানান্তরিত করতে বা

অপারেশন টেবিলে নামিয়ে শ্বইয়ে দিতে যথেষ্ট সাহায্য করে। স্ট্রেচারে করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দরকার ২ থেকে ৪ জন লোক।

স্ট্রেচারে রোগীকে কি অবস্থায় বা কোন ভঙ্গীতে রাখতে হবে তা নির্ভর করে রোগীর জখম বা অস্বখের চরিত্রের ওপর। রোগীকে স্ট্রেচারে তোলার আগে, বালিশ, কম্বল ও জামা-কাপড় প্রভৃতি দিয়ে স্ট্রেচারের উপরিভাগে সেই অবস্থার সৃষ্টি করতে হয় যে অবস্থানভঙ্গিতে রেখে রোগীকে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে সবচেয়ে স্ববিধাজনক ও আরামপ্রদ।

রোগীকে স্ট্রেচারে তোলা হয় নিম্নলিখিত উপায়ে: — স্ট্রেচারটিকে রোগীর কাছে নেওয়া হয় তার আহত স্থানের দিক থেকে (যদি কশেরুকার বা কশেরুকাস্তম্ভের জখম হয় তাহলে তাকে নেওয়া হয় যে দিক থেকে স্ববিধাজনক — সে দিক থেকে)। ২-৩ জন লোক রোগীর স্বস্থ দিকে এসে হাঁটু গেড়ে বসে রোগীর দেহের তলায় হাত ঢুকিয়ে সকলে এক সঙ্গে রোগীকে ওপরে তোলে, আর সেই সময় ৩য় বা ৪র্থ লোকটি আগে থেকে স্বসজ্জিত স্ট্রেচারটিকে সরিয়ে রোগীর ঠিক তলায় পেতে দেয় এবং যারা রোগীকে তুলে ধরেছিল তারা তাকে সাবধাণে স্ট্রেচারের ওপর স্থাপন করে বিশেষ নজর রেখে, রোগীর জখমের জায়গাটিতে যেন কোন ঝাঁকি না লাগে। রোগী যদি টানেলে বা সর্ব জায়গায় পড়ে থাকে ,তাহলে স্ট্রেচার মাথার দিক থেকে বা পায়ের দিক থেকেও এগিয়ে দেওয়া চলে রোগীর দেহের তলায়। বছরের ঠান্ডার দিনে রোগীকে পরিবহণ করতে তাকে গরম কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয়।

স্ট্রেচারে করে বহন করে নিয়ে যেতে কতগুলি নিয়ম পালন করতে হয়। সমতল ভূমির ওপর দিয়ে বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় রোগীর পা সামনের দিকে রাখতে হয়। রোগীর অবস্থা যদি খুব বিপদজনক হয় (অজ্ঞান অবস্থা, অধিক রক্তপাত ইত্যাদি) তাহলে তার মাথা সামনের দিকে রেখে বহন করা দরকার যাতে পেছনের দিকের বহনকারী দুর্দশাগ্রস্তের মুখমণ্ডল দেখতে পায় ও লক্ষ্য করতে পারে রোগীর অবস্থা খারাপ হচ্ছে কি না ও খারাপ হলে পরিবহণ স্থগিত রেখে সেখানেই রোগীকে সাহায্য দিতে হবে। স্ট্রেচার বহনকারীদের পায়ে পা মিলিয়ে যাওয়া উচিত এবং বহন করে নিয়ে যেতে হয় তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে, ছোট ছোট পা ফেলে এবং অসমতল ভূমি এড়িয়ে। অধিকতর লম্বা বহনকারীদের স্ট্রেচারের পায়ের দিক বহন করতে দেওয়া উচিত।

আরোহণকালে বা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে রোগীকে তার মাথার দিকটা সামনে করে বহন করে নিয়ে যেতে হয় আর উঁচু স্থল থেকে নিচে নামাতে মাথা রাখা দরকার স্ট্রেচারের পেছন দিকে। নিম্ন দেহপ্রান্তের অস্থিভঙ্গ হওয়া রোগীদের চড়াই-এর দিকে নিয়ে যেতে হলে, পা সামনের দিকে করে নিয়ে যাওয়া ভাল, আর উৎরাই-এর দিকে যেতে হলে পা পেছনের দিকে করে। চড়াই বা উৎরাই যে দিকেই যাওয়া হোক না কেন স্ট্রেচারকে সব সময় রাখা দরকার অনুভূমিক অবস্থায়। তা সহজে করা যায় এভাবে: চড়াই বেয়ে উঠতে যারা স্ট্রেচারের পায়ের দিক ধরে আছে তারা স্ট্রেচারকে কাঁধের কাছে তুলে নেবে আর উৎরাই

a
b
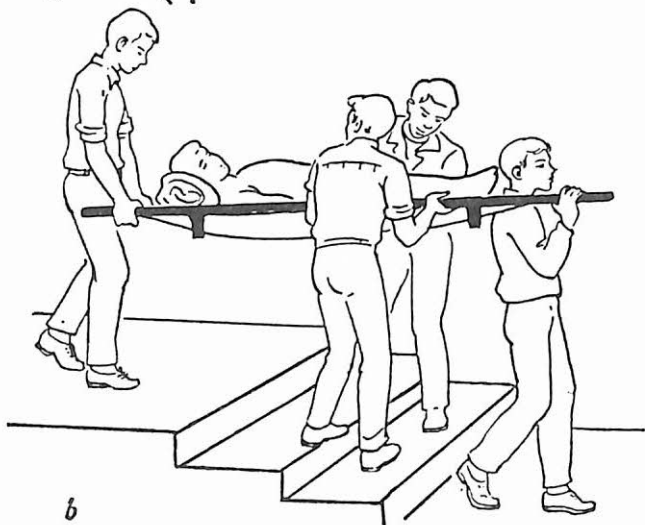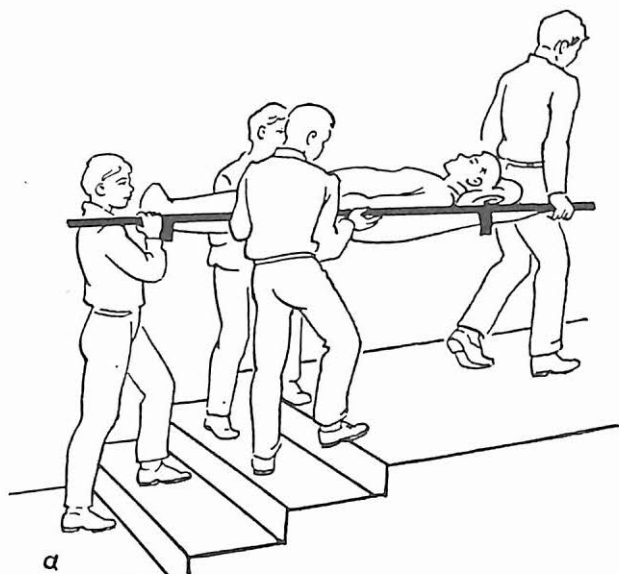
বয়ে উঠতে হলে যারা সামনের দিক ধরে আছে তারা একাজটা করবে (চিত্র — ২২)।

রোগীদের স্ট্রেচারে করে অনেকদূর বহন করে নিয়ে যেতে হলে স্ট্রেচার বহনের বেল্ট ব্যবহার করা অনেক সুবিধাজনক। তা হাতের ওপর অত্যধিক চাপ হ্রাস করে।

স্ট্রেচারের বেল্ট হল ত্রিপল বা ক্যানভাসের স্ট্র্যাপের বেল্ট — লম্বায় ৩·৫ মিটার, চওড়ায় ৬·৫ সেণ্টিমিটার, যার একদিকে থাকে ধাতুর তৈরী দাঁতওয়ালা কব্জা এবং এই কব্জার ভেতর অন্যদিককার প্রান্তকে এনে আটকানো যায়। স্ট্রেচার বহনের জন্য বেল্টটিকে বাংলার চার (৪) আকারে এক ফাঁসের রূপ দেওয়া হয়, ফাঁসের মাপ হতে হবে স্ট্রেচার বহনকারীর উচ্চতা অনুযায়ী — স্ট্রেচার বহনকারীর দুই পাশে ছড়ানো হাতের মাপের সমান (চিত্র — ২৩a, b)। ফাঁসটাকে পরানো হয় দুই কাঁধের ওপর এমনভাবে যাতে তার ক্রসের জায়গাটি এসে পড়ে পিঠে আর ঝোলা দুই ফাঁস বুকের দুই পাশ দিয়ে যায় ঝোলানো হাত দুটির দুই মুঠি পর্যন্ত। এই ফাঁস দুটিতে পরানো হয় স্ট্রেচারের হাতল দুটি। স্ট্রেচার বহনকারীদের মধ্যে যে সামনে থাকে সে স্ট্রেচারের হাতল ধরবে বেল্টের সামনে, আর পেছনের বহনকারী স্ট্রেচারের হাতল ধরবে বেল্টের পেছনে (চিত্র — ২৩c, d)।

স্ট্রেচার যদি না থাকে তা হলে হাতের কাছে পাওয়া

চিত্র — 22: রোগীকে ওপরে ওঠানোর সময় (a) ও নিচে নামানোর সময় (b) স্ট্রেচারের অবস্থান
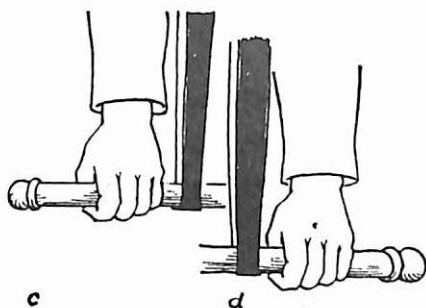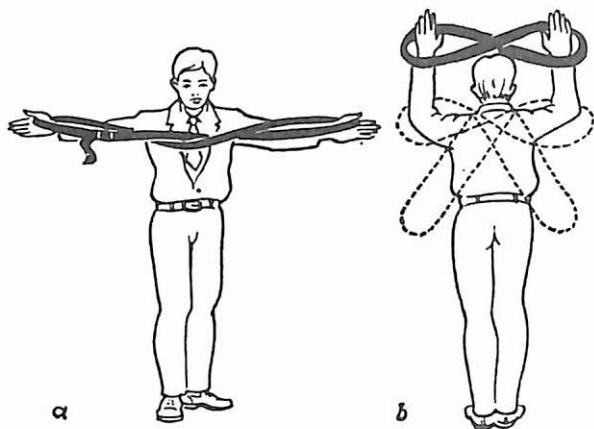
চিত্র — 23 : স্ট্রেচার বহন করার কাজে চামড়ার স্ট্র্যাপ ব্যবহার করা

a — বহনকারীর উচ্চতা অনুসারে স্ট্র্যাপ ছোট-বড় করা ; b — স্ট্র্যাপ পরিধান করা, c — স্ট্র্যাপ যে অবস্থায় পরাতে হয়, স্ট্রেচারের হাতল ও সামনের স্ট্রেচার বাহকের হাত যেখানে থাকা উচিত ; d — স্ট্র্যাপ ও পেছনের স্ট্রেচার বাহকের হাতের অবস্থান।

সাধারণ জিনিষ-পত্র দিয়েও তা তৈরী করে নেওয়া যায় (লাঠি, লগি, তক্তা, ওভারকোট, কম্বল, ছালা এবং আরও অন্যান্য জিনিষ)। অবস্থার পরিবেশে ঐভাবে নিজে তৈরীকরা বহনব্যবস্থাকে হতে হবে যথেষ্ট শক্ত যা রোগীর দেহের ওজন সহ্য করতে পারে (চিত্র—২৪)। যদি রোগীকে হাতে-তৈরী শক্ত স্ট্রেচার বা বহনব্যবস্থার ওপর শুইয়ে বহন করতে হয়, তাহলে বোগীর নিচে কোন নরম জিনিষ (খড়, জামা-কাপড়, ঘাস প্রভৃতি) বিছিয়ে নেওয়া দরকার। স্ট্রেচারের বেল্টও তৈরী করা চলে ২-৩টি বেল্ট যুক্ত করে, কয়েক টুকরো ত্রিপল, বিছানার চাদর, তোয়ালে, মোটা দড়ি ও অন্যান্য জিনিষ দিয়ে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য অনেক সময় দিতে হয় এমন অবস্থার পরিবেশে যখন হাতের কাছে কিছুই নেই বা সময় নেই, যাতে পরিবহণের স্ট্রেচার বানিয়ে নেওয়া যায়। সে সব ক্ষেত্রে দরকার রোগীকে কোলে করে বহন করা। এক জন লোক রোগীকে কোলে করে, পিঠে করে, কাঁধে করে বহন করতে পারে (চিত্র — ২৫)। রোগীকে (সামনের দিকে কোলে করে নিয়ে ও কাঁধে করে) বহন করার কায়দা ব্যবহার করা হয় যদি রোগী খুব দুর্বল বা অজ্ঞান অবস্থায় থাকে। রোগীর যদি ধরে থাকার ক্ষমতা থাকে তাহলে বেশী সুবিধাজনক তাকে পিঠ করে নিয়ে যাওয়া। এই সব কায়দায় রোগীকে বহন করার জন্য শরীরে খুব শক্তি থাকা দরকার এবং এই সব কায়দা ব্যবহার করা হয় যদি রোগীকে খুব দূরে না নিয়ে যেতে হয়। দুই জন বহনকারী মিলে হাতে করে বহন করা অনেক সহজ। দুর্দশাগ্রস্ত, যে অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে তাকে বহন করার সবচেয়ে সুবিধাজনক

উপায় হল "একজনের পেছনে অপরজন" ধরার কায়দা। রোগী যদি স্বজ্ঞানে থাকে ও নিজে ধরে থাকতে পারে তাহলে রোগীকে বহন করার অধিকতর সহজ উপায় হল ৩ বা ৪ হাতের ধরাধরি-করা স্থানে বসিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া (চিত্র — ২৬)। বহন করা অনেক সহজ হয় যদি কোলে বা পিঠে করে নিতে বহনকারী বেল্ট বা স্ট্র্যাপ ব্যবহার করে (চিত্র — ২৭)।

কোন কোন ক্ষেত্রে সাহায্যকারীর সহায়তায় রোগী নিজেই সামান্য দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। সাহায্যকারী রোগীর এক হাত টেনে ধরে থাকে নিজের কাঁধে ও আর এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে থাকে রোগীর কোমর বা বুক। চলার
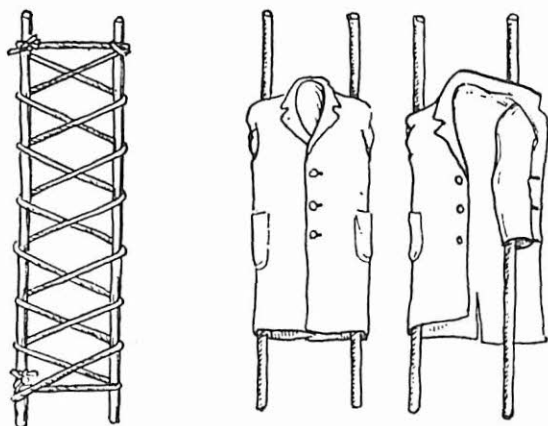
চিত্র — 24: হাতের কাছে পাওয়া জিনিষ দিয়ে তৈরী করে নেওয়া স্ট্রেচার

চিত্র — 25: একা দুর্দশাগ্রস্তের পরিবহণ
a — কোলে করে বহন করা; b — পিঠে করে বহন করা;
c — কাঁধে করে বহন করা

সময় রোগী তার মুক্ত হাত দিয়ে লাঠির ওপর ভর করে হাঁটতে পারে (চিত্র — ২৮)।

রোগীর যদি নিজে চলার ক্ষমতা না থাকে এবং কাউকে সহকারী হিসাবে না পাওয়া যায় তাহলে তাকে ত্রিপল, বর্ষাতি, তাঁবুর ওপর শুইয়ে ছেচড়েও টেনে নিয়ে যাওয়া যায় (চিত্র — ২৯)।

কাজেই, বিভিন্ন অবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যকারী রোগীকে পরিবহণ করে স্থানান্তরিত করার কাজে বিভিন্ন উপায় বেছে নিতে পারে। কিন্তু ঠিক কোন্ উপায়ে এবং কোন্ অবস্থানভঙ্গিতে জখম-হওয়া বা রোগগ্রস্ত লোকটিকে পরিবহণ বা বহন করতে হবে তা স্থির করতে প্রধান
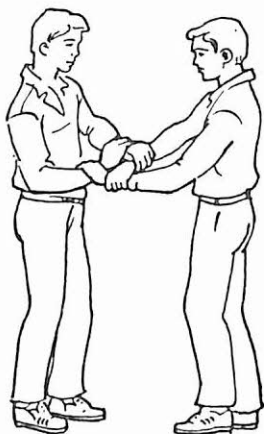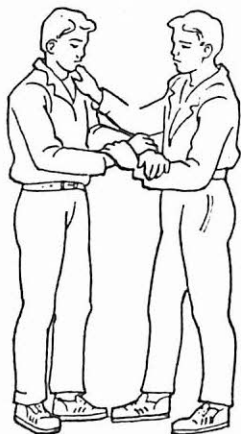
চিত্র — 26 : দুর্দশাগ্রস্তকে বহন করার বিবিধ উপায়
a — একজনের পেছনে আর এক জন; b — তিন হাতের কব্জির ওপর; c — চার হাতের কব্জির ওপর

a b

চিত্র — 27 : স্ট্র্যাপের সাহায্যে দুর্দশাগ্রস্তকে একা বহন করা (a) এবং দুইজন মিলে বহন করা (b)
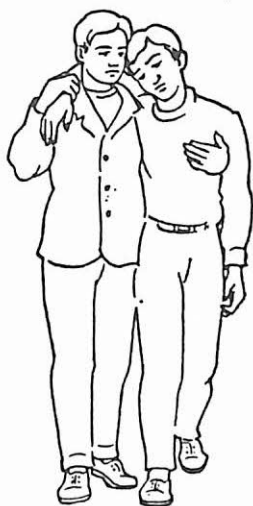
চিত্র — 28 : এক জন লোকের সাহায্য নিয়ে হেঁটে যাওয়া

চিত্র — 29: ত্রিপল বা বর্ষাতির ওপর রেখে, দুর্দশাগ্রস্তকে টেনে নিয়ে যাওয়া

বিচার্য্য বিষয় হল জখমের ধরন, স্থান অথবা অসুখের চরিত্র।

পরিবহণকালে দুর্দশাগ্রস্তের অবস্থানভঙ্গি। পরিবহণের সময় দুর্ঘটনাগ্রস্তের যাতে কোন জটিলতা না দেখা দেয় তার জন্য তার জখম অনুযায়ী তাকে বিশেষ অবস্থানভঙ্গিতে রেখে পরিবহণ করতে হয়। অনেক সময় ঠিক অবস্থানভঙ্গিতে রাখার জন্যই আহতের জীবন রক্ষা পায় এবং তারই জন্য সাধারণত তাড়াতাড়ি আরোগ্যলাভে সাহায্য হয়। কাজেই, পরিবহণের সময় আহতকে প্রয়োজনীয় অবস্থানভঙ্গিতে রেখে পরিবহণ করা প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদানের সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দুর্দশাগ্রস্তকে পরিবহণ করা হয় শোয়ানো অবস্থায় এবং জখম বা অসুখের চরিত্র বিচারে শোয়ানোর নানা রকম ভঙ্গিতে। আহতদের পরিবহণ করা হয় চিৎ করে শুইয়ে, চিৎ অবস্থায় হাঁটু ভাঁজ করে, চিৎ করে মাথার দিকটা নিচু ও পায়ের দিকটা উঁচু করে, উপুড়

করে, কাত করে (সেই সব অবস্থান ভঙ্গিতে যা নির্ভরযোগ্য ভাবে আটকে রাখার ব্যবস্থা করে) (চিত্র ৩০a, b, c, d, e)। চিৎ করে শুইয়ে পরিবহণ করা হয় মাথার আঘাতে, মাথার খুলির জখমে ও মস্তিষ্কের জখমে। কশেরুকা ও সুষুম্নাকাণ্ডের জখমে, শ্রোণীচক্রের ও নিম্ন দেহপ্রান্তের অস্থিভঙ্গে। এই অবস্থানভঙ্গিতেই পরিবহণ করতে হয় সমস্ত রোগীদের, যাদের জখমের সঙ্গে সকের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে, বেশী রকম রক্তপাত হয়েছে, যারা অল্পক্ষণের জন্য হলেও জ্ঞান হারিয়েছিল, যাদের জরুরী শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন এবং যাদের পেটের ভেতরকার দেহাঙ্গ জখম হয়েছে (এপেণ্ডিসাইটিস, স্ট্র্যাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া, পার্ফোরেটেড গ্যাস্ট্রিক আল্সার ইত্যাদি)।

আহত ও আকস্মিক রোগে আক্রান্ত, যারা অজ্ঞান অবস্থায় রয়েছে, তাদের পরিবহণ করা হয় পেটের ওপর উপুড় করে শুইয়ে, কপালের নিচে ও বুকের নিচে প্যাড রেখে (বালিশ রেখে)। অনুরূপ অবস্থানভঙ্গির প্রয়োজন যাতে দম আটকে না যায়। অনেক রোগীকে বসা-অবস্থায় পরিবহণ করা চলে, আবার কোন কোন রোগীকে কেবল মাত্র বসা ও আধা-বসা অবস্থায় পরিবহণ করতে হয় (চিত্র — ৩০f, g)।

ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় পরিবহণ করতে হয় যেন ঠাণ্ডা না লাগে — এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কেননা, প্রায় সমস্ত রকম জখমে ও আকস্মিক রোগে, ঠাণ্ডা আবহাওয়া রোগীর অবস্থার ভীষণ অবনতি ঘটায় ও জটিলতা সৃষ্টি করে। এদিক থেকে বিশেষ নজর দিতে হয় তাদের ওপর, যাদের আঘাত জনিত রক্তবন্ধের টুর্নিকেট বাঁধা হয়েছে এবং যারা

চিত্র — 30: পরিবহণ কালে দুর্দশাগ্রস্তের অবস্থানভঙ্গি a — পিঠের ওপর; b — পিঠের উপর, হাঁটু ভাঁজ করে; c — পিঠের উপর, মাথা নিচে হেলিয়ে দিয়ে ও নিম্ন দেহপ্রান্ত খানিকটা উঁচুতে তুলে রেখে; d — পেটের ওপর উপুড় হয়ে; e — পাশ ফিরে শয়নভঙ্গি; f — আধা-বসা অবস্থায়; g — আধা-বসা, হাঁটু ভাজ করা অবস্থায়
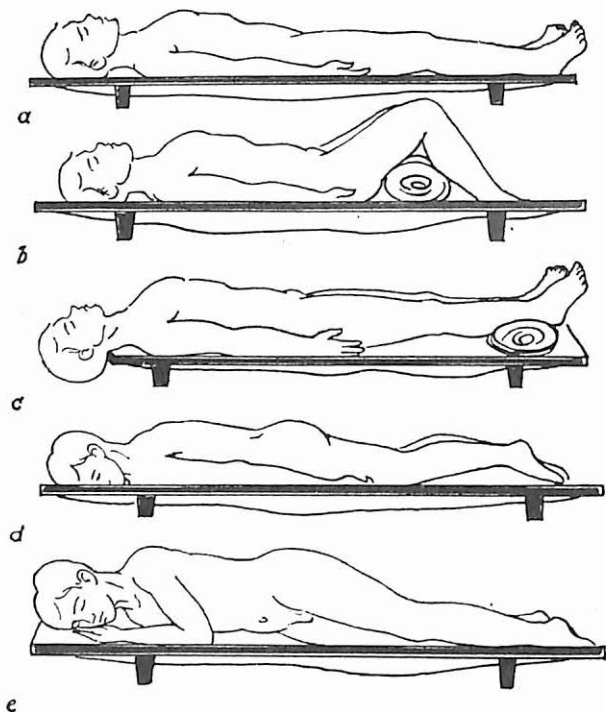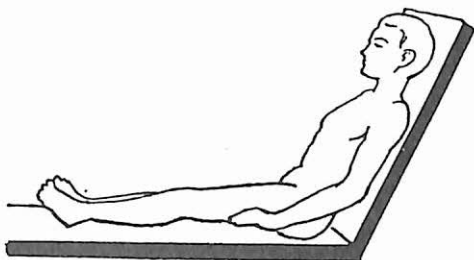
অজ্ঞান হয়ে আছে ও সক্ অবস্থায় রয়েছে, যাদের তুষারাঘাত হয়েছে।

পরিবহণ কালে রোগীদের ওপর সব সময় তীক্ষ্ন নজর রাখা দরকার, লক্ষ্য রাখা দরকার তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস ও নাড়ীর ওপর। নজর রাখা দরকার যাতে বমি হয়ে বমির পদার্থ শ্বাসের পথে প্রবেশ করতে না পারে।

খুবই প্রয়োজনীয়, প্রাথমিক সাহয্যদানকারী যেন নিজের আচরণে, নিজের ক্রিয়াকলাপে, কথাবার্তায় রোগীর মন থেকে যতদূর সম্ভব ভয় দূর করে ও তার মনে বিশ্বাস জাগায় যে, তার অসুখ সেরে যাবে।

ব্যাপক দুর্ঘটনায় আহতদেরকে পরিবহণের ধারাবাহিকতা

বিচারের নীতি। বহুলোককে একই সঙ্গে আহত হতে দেখা যায় ভূমিকম্পে, মোটরগাড়ী বা বাস দুর্ঘটনায়, রেল দুর্ঘটনায়, আগুন লাগলে বা বিস্ফোরণ ঘটলে। সে সব ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের সাফল্য নির্ভর করে তার সংগঠন ও নিয়মানুবর্তীতার ওপর। প্রথমে ঠিক করা প্রয়োজন, কাদের প্রথমে চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া দরকার। নিয়মটা হওয়া উচিত — এই রকম ধারাবাহিকতায় চিকিৎসা সাহায্য দান করা: প্রথমে চিকিৎসা সাহায্য দিতে হয় তাদের, যাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের কষ্টে দম আটকে আসছে, তারপর সেই সব আহতদের যাদের আঘাত — বুক বা পেট ছেদা করা গভীর আঘাত, তারপর সেই সব আহতদিগকে সাহায্য দেওয়া উচিত যাদের ক্ষত থেকে অধিক রক্তপাত হয়েছে, তারপর সাহায্য দিতে হয় সেই সব আহতদেরকে যারা অজ্ঞান হয়ে আছে বা যাদের সকের অবস্থা দেখা দিয়েছে, তারপর সেই আহতদের যাদের বড় হাড় ভেঙ্গেছে ও সবশেষে তাদের, যাদের জখম বা ক্ষত সামান্য এবং ছোট হাড় ভেঙ্গেছে।

জখমের গুরুত্বের ওপর নির্ভর করে পরিবহণের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী দুর্দশাগ্রস্তদের কয়েকটা গ্রুপে ভাগ করে ফেলা হয়।

যাদের প্রথমে পরিবহণ করে পাঠানোর গ্রুপে নেওয়া হয় তাদের মধ্যে পড়ে: বক্ষপিঞ্জর ও পেটগহ্বরের ভেদ করা জখমে আহত রোগীরা; যারা অজ্ঞান হয়ে আছে বা যাদের সক্ হয়েছে; যাদের মাথায় ভারী চোট লেগেছে, আঘাতের ফলে যাদের অভ্যন্তরীণ রক্তপাত হচ্ছে; যাদের কোন দেহপ্রান্ত বিচ্ছিন্ন হয়েছে; যাদের উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গ হয়েছে;

যারা অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় গ্রুপে পাঠানোর জন্য নেওয়া হয় তাদের, যাদের দেহ প্রান্তের অস্থিভঙ্গ ঘটেছে কিন্তু সে অস্থিভঙ্গ অনুন্মুক্ত অস্থিভঙ্গ; যাদের জখমের ফলে অধিক রক্তপাত হয়েছে কিন্তু এখন বাইরে থেকে রক্তপাত বন্ধ। তৃতীয় গ্রুপে পাঠানোর জন্য নেওয়া হয় তাদের, যাদের জখমে তেমন বেশী রক্তপাত হয় নি; যাদের ছোট হাড়ের অস্থিভঙ্গ ঘটেছে, আঘাতে যাদের কোন জায়গা ফুলে উঠেছে।

এই সব গ্রুপে যদি কম বয়সের শিশু থাকে তবে তাদের পরিবহণ করে পাঠাতে হয় সকলের আগে ও সম্ভব হলে তাদের বাপমায়ের সঙ্গে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সক্

দেহের বেশী জায়গা জুড়ে জখম হলে, পুড়ে গেলে, ভারী আঘাতে ও কঠিন অসুখের ফলে সৃষ্টি হয় এমন কতগুলি উপসর্গ যা গোটা দেহের সঞ্জীবনী শক্তির ওপর খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। সেগুলি হল ব্যথা, রক্তপাত, কলা বিনষ্ট হওয়া জনিত সৃষ্ট কতগুলি বিষাক্ত পদার্থ। এই সমস্ত উপসর্গগুলি একত্রে, গোটা দেহের ক্রিয়াকলাপ পরিচালক মস্তিষ্ক ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির কাজে এমন গভীর ব্যাঘাত সৃষ্টি করে যে, দেখা দেয় এক রকম খুবই জটিল প্রক্রিয়া, যার নাম সক্।

সকের বৈশিষ্ট্য এই যে, তাতে দেহের সমস্ত সঞ্জীবনী ক্রিয়াকলাপ উত্তরোত্তর অবদমিত হয় কেন্দ্রীয় ও বর্দ্ধনশীল (ভেজিটেটিভ) স্নায়বিক তন্ত্রের কাজ, ব্যাহত হয় রক্তপ্রবাহ, শ্বাস-প্রশ্বাস এবং পদার্থ বিনিময়ের কাজ, নষ্ট হয় যকৃত ও বৃক্কের ক্রিয়াকলাপ।

সক্ হল জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের অবস্থা এবং এতে কেবলমাত্র সঠিক ও সময়মত চিকিৎসাই রোগীর জীবন রক্ষা করতে পারে। সক্ সৃষ্টির জন্য দায়ী কারণগুলির ওপর নির্ভর করে সক্‌কে বিভক্ত করা হয়: ট্রমাটিক বা

আঘাতজনিত সক্, দহনজনিত সক্, রক্তপাত জনিত সক্, সহ্য না করতে পারা ওষুধ ব্যবহার জনিত এনাফাইল্যাকটিক সক্, কার্ডিওজেনিক সক্ — যা দেখা দেয় হৃৎপিন্ডের ইনফার্কশন হলে, সেপ্টিক সক্ — যা দেখা দেয় গোটা দেহ জীবাণুদুষ্ট হলে (সেপ্‌সিস) ও অন্যান্য সকে।

ট্রমাটিক সক্ বা আঘাতজনিক সক্। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সক্ সৃষ্টি হয় দেহে গভীর ও বিস্তৃত জখম হলে যার সঙ্গে অনেক রক্তপাত হয়। আঘাত জনিত সক্‌কে ত্বরান্বীত করে ও তা সৃষ্টিতে যে সব জিনিষ সাহায্য করে তা হল দেহের পরিশ্রান্ত অবস্থা, ভীতি, ঠান্ডায় জমে যাওয়া অবস্থা, বিভিন্ন দীর্ঘকাল স্থায়ী পুরনো অসুখ (যক্ষ্মা, হৃদরোগ, পদার্থ বিনিময়ের গন্ডগোল প্রভৃতি)। সক্ বেশী দেখা দেয় শিশুদের মধ্যে, যারা রক্তক্ষয় একেবারে সহ্য করতে পারে না ও বৃদ্ধদের মধ্যে যারা যন্ত্রণার অনুভূতিতে খুবই কাতর হয়ে পড়ে।

আঘাত জনিত সক্ অধিক রক্তপাতবিহীন আঘাতেও দেখা দিতে পারে, বিশেষত অধিক স্পর্শকাতর জায়গাগুলিতে যদি আঘাত লাগে, যেগুলিকে রিফ্লেক্স-জেনাস অঞ্চল (বক্ষগহ্বর, মাথার খুলি, পেটের গহ্বর, পেরিনিয়াম) বলা হয়।

আঘাতের ঠিক পরেই সক্ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু বিলম্বিত সক্ হওয়াও সম্ভব (২ থেকে ৪ ঘণ্টা পর), বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সক্‌বিরোধী ব্যবস্থা পুরোপুরি গ্রহণ না করার ফলে বা তা নিবারণের ব্যবস্থা না গ্রহণ করার ফলে। আঘাত জনিত সকের নিদানিক চিত্র সম্বন্ধে প্রথম বিবরণ দান করেন রুশ শল্যচিকিৎসক পিরগভ।

আঘাত জনিত সকের প্রবাহকে দুই পর্যায়ে ভাগ করা হয়: ঊর্দ্ধগামী পর্যায় শুরু হয় আঘাতের মুহূর্ত থেকে। জখম হওয়া জায়গাগুলি থেকে উত্থিত যন্ত্রণার তাড়না পেঁছনোর ফলে স্নায়বিক তন্ত্রে সৃষ্টি হয় ভীষণ উত্তেজনা, বৃদ্ধি পায় পদার্থ বিনিময়, রক্তের ভেতর বেড়ে যায় এড্রিনালিনের পরিমাণ, বর্দ্ধিত হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, পরিলক্ষিত হয় রক্তবাহী শিরাগুলির নালীর সংকোচন, জোরদার হয় অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিগুলির, পিটুইটারি ও বৃক্কউপরি গ্রন্থির কাজ। সকের এই পর্যায় খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং প্রকাশ পায় মানসিক গতি উত্তেজনার ভেতর দিয়ে। দেহের প্রতিরোধ ক্ষমতা তাড়াতাড়ি ক্ষয় পায়, ভারসাম্য রক্ষার ক্ষমতাও স্তিমিত হয়, সৃষ্টি হয় দ্বিতীয় পর্যায় — সুপ্ত পর্য্যায় (টর্পিড ফেজ) — যাকে বলে অবদমনের পর্যায়। এই পর্যায়ে দেখা দেয় স্নায়ুতন্ত্র, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস, যকৃত ও বৃক্কের ক্রিয়াকলাপের অবদমিত অবস্থা। রক্তে জমা হতে থাকা বিষবৎ পদার্থগুলি রক্তবাহী শিরা ও কৈশিক শিরাগুলিকে অবশ করে। নেমে যায় ধমনীর রক্তের চাপ, দেহাঙ্গগুলিতে রক্ত পেঁছানো ভীষণ ভাবে কমে যায়, বৃদ্ধি পায় অম্লজানের অভাব — এই সমস্তই খুব তাড়াতাড়ি স্নায়ু কোষগুলির মৃত্যু ঘটিয়ে আহতের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

সকের সুপ্ত পর্যায়ের প্রবাহকে বিপদের গভীরতার দিক থেকে ৪টি মাত্রাতে (ডিগ্রী) ভাগ করার যায়: প্রথম (I) ডিগ্রীর সক্ (হাল্কা সক্)। এতে রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে, জ্ঞান পরিষ্কার ভাবে সংরক্ষিত, এক এক সময় দেখা যায় সামান্য অবদমিত ভাব, প্রতিবর্তন ক্রিয়া

দুর্বল, শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত, নাড়ীর গতি দ্রুত (৯০ থেকে ১০০ প্রতি মিনিটে), ধমনীর রক্তের চাপ ১০০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভের কম নয়।

দ্বিতীয় (II) মাত্রার সক্ (মাঝারী ধরনের বিপদজনক সক্) — এতে রোগীর অবস্থা স্পষ্ট অবদমিত, রোগী নিস্তেজ, চামড়া ও শ্লৈষ্মিক আবরণীর রঙ ফ্যাকাশে, নখ ও ঠোঁটের রঙ নীলাভাযুক্ত, চামড়া মৃদু ঘামে আবৃত, শ্বাস দ্রুত ও অগভীর, তারারন্ধ্র স্ফীত, নাড়ী ১২০ থেকে ১৪০ প্রতি মিনিটে, ধমনীর রক্তের চাপ ৮০-৭০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভ।

তৃতীয় মাত্রার (III) সক্ (বিপদজনক অবস্থা) — এতে রোগীর অবস্থা বিপদজনক, জ্ঞান সংরক্ষিত কিন্তু রোগী পারিপার্শ্বিকদের বোঝবার ক্ষমতাবিহীন, ব্যথার অনুভূতির প্রতি প্রতিক্রিয়াহীন, চামড়ার চেহারা ধূসর মেটে রঙের এবং তা আঠালো ঘামে আবৃত, ঠোঁট, নাক ও নখের ডগা নীলাভা যুক্ত, নাড়ীর গতি মিনিটে ১৪০ থেকে ১৬০, ধমনীর রক্তের চাপ ৭০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ, শ্বাস অগভীর ও দ্রুত, এক এক সময় বিলম্বিত। এ সময় বমি হতে পারে ও অসাড়ে মূত্র ও মলত্যাগ হতে পারে।

চতুর্থ (IV) মাত্রার সক্ (মৃত্যুসন্নিধ্ধ বা মৃত্যুপূর্ব অবস্থা) — রোগী অজ্ঞান, নাড়ী ও ধমনীর বক্তের চাপ মাপা যায় না, হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ কষ্টে শোনা যায়, শ্বাসের ধরন মৃত্যুপূর্ব অবস্থার মত — রোগী যেন হাওয়া গলাধঃকরণের চেষ্টা করছে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য। কঠিন আঘাতে আহত রোগীকে সময়মত প্রাথমিক চিকিৎসা দান করলে তা সক্

সৃষ্টি নিবারিত করে। সক্ হলে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য যত আগে দেওয়া যায় তত তা ফলপ্রসূ হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য পরিচালিত করা দরকার সকের কারণগুলি নিবারিত করার জন্য (ব্যথা সম্পূর্ণ দূর করা বা কমানো, রক্তপাত বন্ধ করা, ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাতে রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার উন্নতি হয় এবং তার ঠাণ্ডা না লাগে)।

রোগীর বা আহতের ব্যথা কমানো যায়, জখম হওয়া দেহপ্রান্তকে এমন অবস্থানভঙ্গিতে রেখে যে অবস্থানে ব্যথা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা কম, দেহের জখম হওয়া অংশকে নির্ভরযোগ্য ভাবে নিশ্চল করে রেখে। ব্যথার উগ্রতাও কমানো দরকার ব্যথাহারী ওষুধ, ঘুমের ওষুধ, শান্ত করার ওষুধ দিয়ে (যদি তার সুযোগ থাকে)। এনালজিন, এমিডোপাইরিন, ভ্যালেরিয়ানের নির্যাস, বার্বামিল, সেডালজিন, ডাইআজেপাম (সেডুক্সেন), এলেনিয়াম, ট্রাইঅক্সাজিন প্রভৃতি রোগীকে দেওয়া যেতে পারে।

ব্যথা কমানোর ওষুধ না থাকলে ২০ থেকে ৩০ সি. সি. ইথাইল এলকোহল দেওয়া যেতে পারে (এলকোহল যে দেওয়া হয়েছে তা জানাতে হয় এ্যাম্বুলেন্সের কর্মীদের বা হাসপাতালের কর্মীদের বা হাসপাতালের কর্মীদের যেখানে রোগীকে পাঠানো হবে)।

রক্তপাত বন্ধ না করে সকের বিরুদ্ধে লড়াই সফল হয় না। তাই, অবশ্য প্রয়োজন — টুর্নিকেট বাঁধা, চেপে ব্যাণ্ডেজ করা প্রভৃতির সাহায্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রক্তপাত বন্ধ করা। খুব বেশী রক্তক্ষয় হলে আহতকে এমন অবস্থানভঙ্গিতে রাখতে হয় যাতে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ

উন্নত হয় — রোগীকে এর জন্য অনুভূমিক ভাবে বা এমনভাবে শোয়াতে হয় যাতে মাথা থাকে ধড়ের তুলনায় নিচে (দেখুন চতুর্থ পরিচ্ছেদ)। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ উন্নত করার জন্য প্রয়োজন জামার বোতাম খুলে দেওয়া যাতে নিশ্বাসের কোন বাধা সৃষ্টি না হয় (যদি প্রয়োজন হয়), খোলা হাওয়ার ব্যবস্থা, রোগীকে এমন অবস্থানভঙ্গিতে রাখা যাতে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া সহজ হয়। যদি সুযোগ থাকে তা হলে দিতে হয় এমন ওষুধ যা হৃৎপিন্ড ও রক্তবাহী শিরা তন্ত্রের কাজ উন্নত করে, যেমন ল্যাণ্টোসিড ২০ থেকে ৩০ ফোঁটা, বেখ্‌টেরেভে'র মিক্সচার ১ থেকে ২ টেবিল-চামচ, এডোনিজিড ১৫ থেকে ২০ ফোঁটা (বা ১ ট্যাবলেট), লাণ্ডিশ-এর নির্যাশ বা লাণ্ডিশ ভালেরিয়ানের ফোঁটা বা কর্ভালনের ফোঁটা — ১৫ থেকে ২০ ফোঁটা।

আহত ব্যক্তি, যার সক হয়েছে, তাকে গরমে রাখতে হয়। এ জন্য তাকে কম্বল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়, যথেষ্ট পরিমাণে পান করতে দেওয়া হয় গরম চা, কফি ও জল (অবশ্য যদি সন্দেহ না থাকে যে পেটের কোন দেহাঙ্গ জখম হয়েছে)।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের পরবর্তী সবচেয়ে বড় কাজ হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুর্দশাগ্রস্তকে হাসপাতালে পরিবহণ করার ব্যবস্থা করা। সক্ হয়েছে এমন দুর্দশাগ্রস্তকে পরিবহণ করতে হয় অতি সাবধাণে, যাতে তাকে নতুন করে ব্যথা অনুভব করতে না হয় ও তার সকের অবস্থা আরও গভীর হয়ে না পড়ে। সবচেয়ে ভাল, বিশেষ পুনরুজ্জীবিতকরণের এ্যাম্বুলেন্সে করে পরিবহণ করা যার ভেতর পরিবহণ কালে স্নায়ু তন্ত্রের গন্ডগোল

দূর করার সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলে ও ব্যথার উপশম করানোর জন্য দেওয়া চলে ন্যার্কটিক — মর্ফিন, অম্নাপোন, প্রোমেডল; অজ্ঞান করার জন্য প্রয়োগ করা চলে নাইট্রাস অক্সাইডের গ্যাস এনেস্থেসিয়া; ব্যথা দূর করার জন্য করা যায় নোভোকেইন ব্লকাড এবং আরও অনেক কিছু।

সকে, রক্ত চলাচলের গণ্ডগোলের মূল চিকিৎসা হল প্রবহমান রক্তের পরিমাণের ঘাটতি পূরণ করা। রক্তক্ষয় পরিপূরণ করা হয় রক্তের বদলে ব্যবহারযোগ্য তরল পদার্থ (পলিগ্লুকিন, হিমোডেজ, জেলাটিনল) দিয়ে; রক্ত, গ্লুকোজ সলিউশন, সোডিয়াম ক্লোরাইডের আইসোটনিক সলিউশন প্রভৃতি পরিসঞ্চালন করে। এই সব কাজ পুনরুজ্জীবিত করার এ্যাম্বুলেন্সের (রিএনিমবিল্) ভেতরই আরম্ভ করা চলে। সকে এড্রিনালিন, নরএড্রিনালিন, মেসাটোন দেওয়া উচিৎ নয়, এমনকি তা বিপদজনক। কারণ, রক্তবাহী শিরার নালী সংকীর্ণ করে এই ওষুধগুলি রক্তক্ষয়ের ঘাটতি পরিপূর্ণ করার আগেই মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, বৃক্ক ও যকৃতে রক্ত সরবরাহের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। রিএনিমবিলে শ্বাসপ্রশ্বাসের অক্ষমতার চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকে, ব্যবহার করা হয় অম্লজানের সাহায্যে চিকিৎসা, আর সাংঘাতিক কেসে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা যায়।

সকের শেষ অবস্থায় রোগীকে পুনরুজ্জীবিতকরণের ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগেরও আবশ্যকতা দেখা দিতে পারে। এর মধ্যে পড়ে হৃৎপিণ্ডের মালিশ, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা।

মনে রাখা দরকার যে, সকের চিকিৎসার চেয়ে সক্ নিবারণ করা অনেক সহজ, তাই আঘাতে জখম হওয়া রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে পালন করা দরকার সক্ নিবারণের ৫ টি নীতি: রোগীর ব্যথা কমানো, দেহে জলীয় পদার্থ প্রবেশ করানো, রোগীকে গরমে রাখা, তাকে শান্ত ও শব্দবিহীন পরিবেশে রাখা, সাবধাণে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পরিবহণ করা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পুনরুজ্জীবিতকরণের নীতি ও উপায়

আবহমান কাল থেকে মানুষ মৃত্যুমুখীকে সঞ্জীবিত করে তোলার চেষ্টা করে আসছে। জলে-ডোবা মানুষকে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার প্রথম উল্লখ দেখতে পাওয়া যায় অতি পুরাতন হস্তলিপিতে।

রেনেসাসের যুগের নামকরা চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী ভেসালিয়াস ও হার্ভে মৃত্যুর প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করে কৃত্রিম উপায়ে মানুষের জীবন বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহলেও কেবলমাত্র শেষের কয়েক দশক বৎসরে বিজ্ঞান ও কারিগরীবিদ্যার অগ্রগতির ফলেই বিকশিত করা সম্ভব হয়েছে নতুন বিজ্ঞান — **রিএনিম্যাটোলজি** (ল্যাটীন re — পুনরায়, anima জীবন, শ্বাস-প্রশ্বাস) — পুনরুজ্জীবিত করার বিজ্ঞান। সোভিয়েত বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে ভ. আ. নেগভস্কি ও তাঁর সহকর্মীদের অবদানের ফলে আজ রিএনিম্যাটোলজি চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক প্রধান অধ্যয়নের বিষয় হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছে আর তার উপায়গুলি ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষ চিকিৎসা কাজে প্রয়োজিত হচ্ছে। রিএনিম্যাটোলজি বা পুনরুজ্জীবিতকরণের বিজ্ঞান, ফিজিওলজি বা দেহের ক্রিয়াকলাপের বিজ্ঞান, প্যাথোএ-

নাটমি বা দেহের রোগজনিত পরিবর্তনের বিজ্ঞান, শল্য চিকিৎসার বিজ্ঞান ও ভেষজ চিকিৎসা বিজ্ঞানের আরও অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এ বিজ্ঞানের কাজ মৃত্যুর সময় বা মৃত্যুপূর্ব অবস্থা সৃষ্টি হলে দেহে যে সব পরিবর্তন ঘটে থাকে তার প্রক্রিয়া ও কারণগুলি অধ্যয়ন করা ও তারই ভিত্তিতে তৈরী করা ও প্রত্যক্ষ কার্যে ব্যবহার করা মৃত্যুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যবস্থাগুলি।

অন্তিম অবস্থা

প্রমাণ করা গেছে যে মানুষের দেহ, শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার পরও বেঁচে থাকে। যদিও মৃত্যুর পর দেহের কোষগুলিকে অম্লজান পেঁাছন বন্ধ হয় যা ব্যতিরেকে জীবিত দেহ বেঁচে থাকতে পারে না। দেহের বিভিন্ন কলা, তাতে রক্ত ও অম্লজান না পেঁাছলে, প্রতিক্রিয়া করে বিভিন্ন রূপে আর তাদের মৃত্যুও এক সঙ্গে হয় না। তাই, সময়মত বিভিন্ন জটিল ব্যবস্থাদি অবলম্বন করে (যাকে বলে রিএনিমেশন), রক্তচলাচল ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারলে রোগীকে অন্তিম অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।

অন্তিম অবস্থাকে ভাগ করা হয় তিনটি পর্যায়ে বা তিনটি ধাপে: ১) প্রি-এগোনাল অবস্থা; ২) এগোনি; ৩) ক্লিনি-ক্যাল মৃত্যু।

'প্রি-এগোনাল' অবস্থায় চেতনা সংরক্ষিত থাকে তবে তা এলোমেলো হয়ে যায়, রক্তের চাপ নেমে যায় শূন্যতে,

নাড়ী ভীষণ দ্রুত হয়ে সূতোর মত রূপ পরিগ্রহণ করে, শ্বাস প্রশ্বাস হয় অগভীর ও কষ্টযুক্ত, চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে আকার ধারণ করে।

এগোনির সময় রক্তের চাপ নির্ণয় করা যায় না, নাড়ী অনুভব করা যায় না, চোখের প্রতিবর্তন ক্রিয়াগুলি (অচ্ছোদপটলের রিফ্লেক্স, তারারন্ধ্রের রিফ্লেক্স) অন্তর্হিত হয় শ্বাস-প্রশ্বাস পরিগ্রহণ করে হাওয়া গলাধঃকরণের রূপ।

ক্লিনিক্যাল মৃত্যু হল জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানের অল্প সময়ের অন্তর্বর্তী পর্যায়, যার মেয়াদ ৩ থেকে ৬ মিনিট। শ্বাস-প্রশ্বাস নেই, হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ, তারারন্ধ্র স্ফীত, চামড়া ঠাণ্ডা, সমস্ত রিফ্লেক্স বা প্রতিবর্তন অন্তর্হিত। এই সামান্য সময়ের মধ্যে রিএনিমেশনের সাহায্যে জীবন পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। আরও দেরী হলে দেহের বিভিন্ন কলাতে সৃষ্টি হয় অপরিবর্তনীয় অবস্থা এবং ক্লিনিকাল মৃত্যু পর্যবসিত হয় জৈবিক বা প্রকৃত মৃত্যুতে।

অন্তিম অবস্থায় দেহের পরিবর্তন

কারণ নির্বিশেষে অন্তিম অবস্থায় দেহে যে সব সাধারণ পরিবর্তন ঘটে সেগুলিকে পরিষ্কার করে না বুঝলে পুনরুজ্জীবিতকরণের উপায়গুলির মর্ম ও সার্থকতা বোঝা অসম্ভব। সেই সব পরিবর্তন বিস্তৃতি লাভ করে দেহের সমস্ত দেহাঙ্গে ও দেহাঙ্গ তন্ত্রে (মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, পদার্থ বিনিময়, ইত্যাদি)। কোন কোন দেহাঙ্গে পরিবর্তনগুলি দেখা দেয় আগে, কোন কোন দেহাঙ্গে পরে। শ্বাস-প্রশ্বাসের ও হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যাবার পরও কিছু সময়

পর্যন্ত দেহাঙ্গগুলি বেঁচে থাকে বলেই আধুনিক রিএনিমেশনের সাহায্যে রোগীকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা সফল হয়।

হাইপোক্সিয়া (রক্তে ও কলায় অম্লজানের পরিমাণ কম) অবস্থায় সবচেয়ে বেশী কাতর হয় মস্তিষ্ক-কর্টেক্স, তাই অন্তিম অবস্থায় সবচেয়ে আগে কাজ বন্ধ হয় কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের সর্বোচ্চ বিভাগ — মস্তিষ্ক-কর্টেক্সের, ও মানুষ জ্ঞান হারায়। যদি অম্লজানের অভাব ৩-৪ মিনিটের বেশীক্ষণ ধরে চলে তাহলে কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের এই বিভাগের কাজ আর পুনরুদ্ধার করা যায় না। কর্টেক্সের কাজ বন্ধ হওয়ার পরই মস্তিষ্কের কর্টেক্স-নিম্ন অঞ্চলে পরিবর্তন দেখা দেয়। সবচেয়ে শেষে নষ্ট হয় মস্তিষ্কের সুষুম্নাশীর্ষ যাতে থাকে শ্বাস-প্রশ্বাসের ও রক্ত সরবরাহের স্বয়ংপরিচালিত কেন্দ্রগুলি, দেখা দেয় মস্তিষ্কের অপুনরুজ্জীবনশীল মৃত্যু।

অন্তিম অবস্থায় বর্দ্ধনশীল হাইপোক্সিয়া (অম্লজানের অভাব) ও মস্তিষ্কের কাজের গন্ডগোল, হৃৎপিন্ড ও রক্তবাহী শিরা তন্ত্রের কাজ ব্যাহত করে। প্রিএগোনাল অবস্থায় হৃৎপিন্ডের রক্ত পাম্প করার ক্ষমতা ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে, হৃৎপিন্ড কর্তৃক নিক্ষিপ্ত রক্তের পরিমাণ কমে যায় (অর্থাৎ ১ মিনিটে হৃৎপিন্ডের নিলয় থেকে নিক্ষিপ্ত হয় যে পরিমাণ রক্ত)। দেহাঙ্গগুলিতে বিশেষ করে মস্তিষ্কে রক্ত সরবরাহ কমে যায় ও সেখানে দ্রুততর সৃষ্টি হতে থাকে অপরিবর্তনশীল অবস্থা। হৃৎপিন্ডের নিজস্ব স্বয়ংক্রিয়তার গুণ তার সংকোচন আরও অনেকক্ষণ ধরে চলতে পারে কিন্তু সে সংকোচন যথোপযুক্ত নয়, তাতে

কোন কাজ হয় না। নাড়ীর রক্তপূর্ণতা কমে যায় — তা সূতোর আকার ধারণ করে (থ্রেডি পাল্স), রক্তের চাপ ভীষণ ভাবে কমে যায় ও তারপর আর তা মাপা যায় না। এর পর হৃৎপিন্ডের সংকোচনের তাল বা রিথ্ম খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয় ও হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যায়।

অন্তিম অবস্থার প্রারম্ভে প্রিএগোনাল পর্যায়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি দ্রুত ও গভীর হয়। কিন্তু এমনি পর্য্যায়ে রক্তের চাপ পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাস এলোমেলো ও অগভীর হয়ে পড়ে এবং শেষে একেবারে বন্ধ হয় দেখা দেয় শেষ নিশ্বাসের পূর্ববর্তী বিরতি।

হাইপোক্সিয়া যকৃৎ ও বৃক্কের ওপরও ক্রিয়া করে, অনেকক্ষণ ধরে অম্লজানের অভাবে সেগুলিতেও সৃষ্টি হয় অপরিবর্তনশীল অবস্থা।

অন্তিম অবস্থায় দেহে পদার্থ বিনিময়ের তীব্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সর্বাগ্রে তা প্রকাশ পায় জারণ প্রক্রিয়া হ্রাসের ভেতর দিয়ে, যার ফলে দেহে জমে ওঠে জৈবিক অম্ল (ল্যাকটিক ও পাইরুভিক অম্ল) ও কার্বন ডাই অক্সাইড। ফলে দেহে ব্যাহত হয় অম্ল-ক্ষার ভারসাম্য। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্ত ও কলার বিক্রিয়া নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ। কিন্তু জারণের কাজ নিস্তেজ হওয়ার দরুণ অন্তিম অবস্থা কালে তার বিক্রিয়া অম্লের দিকে ঝুঁকে পড়ে — সৃষ্টি হয় অম্লাধিক্য। যত বেশীক্ষণ ধরে চলে মৃত্যুর প্রক্রিয়া ততই বেশী করে বিক্রিয়া ঝুঁকে পড়ে অম্লের দিকে।

দেহ ক্লিনিকাল মৃত্যুর পর্য্যায় থেকে উদ্ধার পেলে প্রথমে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় হৃৎপিন্ডের কাজ, তারপর নিজে নিজে

শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া, তারপর যখন পদার্থ বিনিময়ের তীব্র পরিবর্তনগুলি চলে যায় ও অম্লভিত্তিক অবস্থা চলে যেতে থাকে তখন পুনরুজ্জীবিত হয় মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ।

মস্তিষ্কের কর্টেক্সের ক্রিয়াকলাপ সম্পূর্ণ ফিরে আসতে লাগে সব চেয়ে বেশী সময়। এমনকি ক্ষণস্থায়ী হাইপোক্সিয়া ও ক্লিনিকাল মৃত্যুতে (এক মিনিটের চেয়ে কম সময়ের জন্য) রোগী অনেকক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে।

রিএনিমেশনের প্রক্রিয়া

ক্লিনিকাল মৃত্যুর অবস্থায় থাকা রোগীকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে প্রধান কাজগুলি হল — হাইপোক্সিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও দেহের স্তিমিত হয়ে যাওয়া ক্রিয়াকলাপগুলিকে উত্তেজিত করা। জরুরীর মাত্রা অনুযায়ী পুনরুজ্জীবিতকরণের ব্যবস্থাগুলিকে ভাগ করা যায় দুই ভাগে: ১) কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ও কৃত্রিম রক্ত প্রবাহ পরিচালনা করা এবং ২) স্বাধীন ভাবে রক্তপ্রবাহ ও শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য ইণ্টেন্সিভ বা প্রবলভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা এবং কেন্দ্রীয় স্নায়ু তন্ত্র, যকৃত, বৃক্ক ও পদার্থ বিনিময়ের ক্রিয়াকলাপকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ বন্ধে পুনরুজ্জীবিতকরণ

কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা বা আরও সঠিক করে বলতে গেলে, কৃত্রিম উপায়ে ফুসফুসে হাওয়া

প্রবেশ করানো ও নিষ্কাশন করানোর প্রয়োজন দেখা দেয় কোন বাইরের জিনিষ শ্বাসপথে ঢুকে আটকে যাওয়ার জন্য এসফিক্সিয়া হলে বা দম আটকে গেলে, জলে ডুবে গেলে, ইলেকট্রিক কারেণ্টের আঘাত লাগলে, বিভিন্ন বিষাক্ত জিনিষের ও ওষুধ পত্রের বিষক্রিয়া হলে, মস্তিষ্কে রক্তপাত হলে, আঘাত জনিত সক্ হলে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা হল সেই সব অবস্থার একমাত্র চিকিৎসার উপায় যাতে রোগী নিজে নিজে নিশ্বাস নিয়ে তার রক্তে অম্লজানের যথেষ্ট সংপৃক্তি সৃষ্টি করতে অপারগ।

প্রবল শ্বাসকষ্ট ও তার চরম পর্যায় — শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া, তা সে যে কারণেই হোক না কেন, একদিকে সৃষ্টি করে দেহের অম্লজান স্বল্পতা (হাইপক্সিয়া) অন্যদিকে রক্তে ও কলায় অত্যধিক পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড জমা হতে (হাইপারক্যাপনিয়া) সাহায্য করে। হাইপোক্সিয়া ও হাইপারক্যাপনিয়ার ফলে দেহে দেখা দেয় সমস্ত দেহাঙ্গের ক্রিয়াকলাপের গন্ডগোল যা দূর করতে পারে একমাত্র সময়মত আরম্ভ করা রিএনিমেশন — কৃত্রিম উপায়ে ফুসফুসের শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা।

কৃত্রিম উপায়ে ফুসফুসে হাওয়া প্রবেশ ও নিষ্কাশন করানোর নানা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। বর্তমানে সিল্‌ভেস্তারের ও শেফেরের উপায় দুটি কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়। ওগুলি কৃত্রিম উপায়ে হাওয়া দিয়ে ফুসফুস ফোলানো ভিত্তিক কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনার উপায়গুলির তুলনায় কম কার্যকরী ও ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত কেসে যাদের মুখমন্ডলে জখম হয়েছে। বক্ষপিঞ্জর জখম হলে
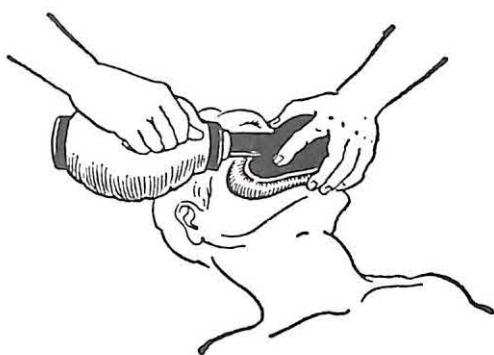
চিত্র — 31. রেস্পিরেটরের সাহায্যে ফুসফুসে কৃত্রিম উপায়ে বায়ুসঞ্চালন

সিল্‌ভেস্তার ও শেফেরের উপায় ব্যবহার করা নিষেধ। সিল্‌ভেস্তারের উপায়, ডুবে যাওয়া জনিত শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ রুদ্ধ হলে, ব্যবহার করা চলে না।

হাওয়া দিয়ে ফুসফুস ফুলিয়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনার কয়েক রকম উপায় আছে। তার ভেতর সবচেয়ে সহজ হল — মুখে মুখ রেখে বা নাকে মুখ রেখে ফুসফুসে কৃত্রিম উপায়ে হাওয়া প্রবেশ করানো। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনার জন্য তৈরী হয়েছে কয়েক প্রকার যন্ত্র,যাতে থাকে মুখোসযুক্ত রবারের স্থিতিস্থাপক ব্যাগ (চিত্র — ৩১)। এই সব শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনার ব্যাগ (রেস্পিরেটর) থাকা উচিৎ সমস্ত রকমের চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র এবং চিকিৎসক সহকারী — ধাত্রী সাহায্য কেন্দ্রে। হাসপাতালে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হয় এক রকমের বিশেষ জটিল যন্ত্র, যেগুলিকে বলে রেস্পিরেটার।
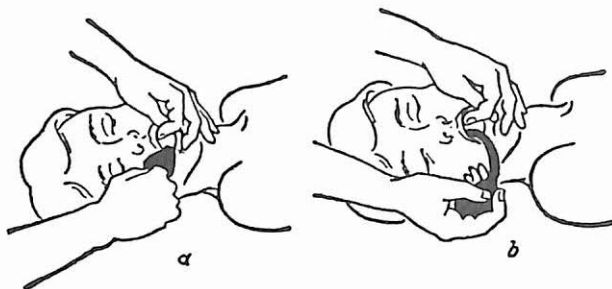
চিত্র — 32: মুখগহ্বর ও ফ্যারিংক্স থেকে বহিরাগত বস্তু, শ্লেষ্মা ও বমন পদার্থ দূর করা
a—হাতের আঙ্গুলের সাহায্যে; b—রবারের বলযুক্ত শুষে নেওয়ার নলের সাহায্যে

এ্যাম্বুল্যেন্স গাড়ীগুলি ও চানের ঘাটের ত্রাণকেন্দ্রগুলিতে রাখা হয় সহজে বহনশীল রেস্পিরেটার (পোর্টিব্‌ল রেস্পিরেটার)।

কৃত্রিম উপায়ে, মুখ থেকে মুখ বা মুখ থেকে নাকের ভেতর দিয়ে ফুসফুসে হাওয়া সঞ্চালনের কায়দা। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করতে হলে দরকার রোগীকে পিঠের ওপর চিৎ করে শোয়ানো, জামার বোতাম খুলে দেওয়া ও শ্বাস চলাচলের পথ মুক্ত করে দেওয়া। যদি মুখে ও গলায় কোন কিছু জমে থাকে তা হলে তাড়াতাড়ি আঙ্গুল, গজের টুকরো, রুমাল বা যে কোন রকম শুষে বের করে নিয়ে আসার ব্যবস্থার সাহায্যে তা পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার (চিত্র—৩২)। এর জন্য ব্যবহার করা চলে রবারের নল — পালিভউরিজাটর, ব্যবহারের পূর্বে তার সরু অগ্রভাগ কেটে ফেলে। শ্বাসের পথ মুক্ত করার জন্য দুর্দশাগ্রস্তের মাথা পেছনের দিকে
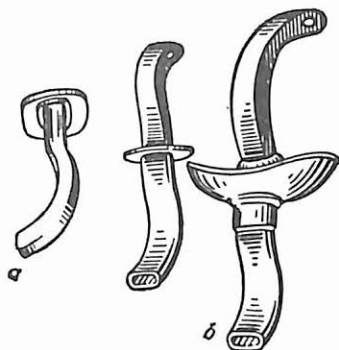
চিত্র — 33. হাওয়া প্রবেশের টিউব যা ব্যবহার করা হয় কৃত্রিম উপায়ে ফুসফুসে হাওয়া প্রবেশ করানোর জন্য
a — সাধারণ টিউব; b — দুই বাঁক যুক্ত টিউব, মুখ থেকে মুখে হাওয়া প্রবেশ করানোর জন্য

খানিকটা বাঁকানো দরকার। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, মাথা বেশীরকম পেছনের দিকে বাঁকালে তাতে শ্বাসের পথ সরু হয়ে যায়। শ্বাসের পথ ভাল করে খোলার জন্য নিচের চোয়ালটিকে সামনের দিকে ঠেলে ধরতে হয়। যদি হাতের কাছে থাকে কোন এক প্রকারের হাওয়া ঢোকানোর টিউব (চিত্র — ৩৩) তা হলে তাকে আগে গলায় পরিয়ে নিতে হয় যাতে জিহ্বা পেছন দিকে না চলে যায় (চিত্র — ৩৪)। যদি হাওয়া ঢোকানোর টিউব না থাকে তাহলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করার সময় দরকার পেছনে বাঁকানো অবস্থায় মাথাকে সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া অবস্থায় নিম্ন চোয়ালকে হাত দিয়ে ধরে রাখা।

মুখ থেকে মুখের ভেতর দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করতে দুর্দশাগ্রস্তের মাথা ধরে রাখা হয় বিশেষ
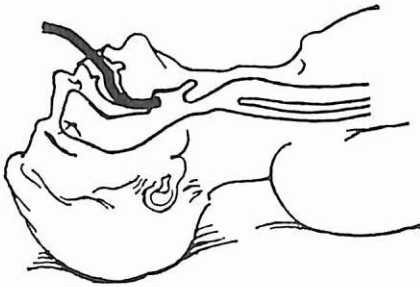
চিত্র — 34 ; মুখ ও ফ্যারিংক্সে সঠিক ভাবে টিউব লাগানোর কায়দা (a) এবং পরানো টিউবের নক্সা আকারের ছবি (b)

অবস্থানভঙ্গিতে (চিত্র — ৩৫)। পুনরুজ্জীবিতকারী গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে নিজের মুখ রোগীর মুখের সঙ্গে আঁট করে ধরে রোগীর ফুসফুস ফুলিয়ে দেয় নিজের প্রশ্বাস-বায়ু দিয়ে। এই সময়ে পুনরুজ্জীবিতকারীর যে হাত ধরে থাকে রোগীর কপাল, সেই হাতেই রোগীর নাক চেপে ধরে রাখতে হয়। রোগীর ফুসফুস থেকে হাওয়া নিষ্কাশনের

চিত্র — 35: মুখ থেকে মুখে হাওয়া প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা
a — দুর্দশাগ্রস্তের মাথা যে অবস্থায় রাখতে হয়; b — যে ভাবে মুখের ভেতর ফু দিয়ে হাওয়া ঢোকাতে হয়

কাজ — প্রশ্বাস চলতে দেওয়া হয় সক্রিয় ভাবে রোগীর বক্ষের নিজস্ব স্থিতিস্থাপকতার শক্তির সাহায্যে। শ্বাস পরিচালনা করতে হয় মিনিটে ১৬ থেকে ২০ বারের কম নয়। ফু দিয়ে ফোলানোর কাজটা করতে হয় জোরে এবং খুব তাড়াতাড়ি (শিশুদের ক্ষেত্রে খানিকটা কম জোরে)

চিত্র — 36: হাওয়া প্রবেশের টিউবের ভেতর দিয়ে কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা

যাতে নিঃশ্বাস হয় প্রশ্বাসের অর্দ্ধেক সময়ব্যাপী। লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে ফু দিয়ে প্রবেশ করানো বায়ু রোগীর পাকস্থলীকে বেশীরকম ফুলিয়ে না দেয়। তাতে বমি হতে পারে এবং বমির সঙ্গে বমনের পদার্থ ব্রঙ্কাসে ঢুকে পড়তে পারে। বলাই বাহুল্য যে, মুখ থেকে মুখে নিশ্বাস ঢোকানো স্বাস্থ্যবিধির দিক থেকে খুব সুবিধাজনক জিনিষ নয়। রোগীর মুখের সঙ্গে মুখের সোজাসুজি স্পর্শ এড়ানো যায়, গজের টুকরো, রুমাল বা অন্য কোন জালি কাপড়ের ভেতর দিয়ে ফু দিয়ে। এই উপায়ে রোগীর ফুসফুসে বায়ু সঞ্চালন করানোর জন্য হাওয়া ঢোকানোর টিউবও ব্যবহার করা চলে (চিত্র — ৩৬)।

মুখ থেকে নাকের ভেতর দিয়ে ফু দিয়ে শ্বাস পরিচালনা করার সময়, ফু দেওয়া হয় নাকের ভেতর দিয়ে কিন্তু সে সময় দুর্দশাগ্রস্তের মুখ হাত দিয়ে বন্ধ করে রাখা দরকার।

a

b

চিত্র — 37 : মুখ থেকে নাকের ভেতর দিয়ে হাওয়া প্রবেশ করিয়ে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা
a — দুর্দশাগ্রস্তের মাথা যে অবস্থায় রাখতে হয়; b — নাকের ভেতর দিয়ে হাওয়া প্রবেশ করান

সে হাত একই সঙ্গে নিচের চোয়ালকে সামনের দিকে ঠেলে ধরে যাতে জিহ্বা পেছন দিকে চলে যেতে না পারে (চিত্র — ৩৭)।

হস্ত পরিচালিত রেস্পিরেটারের সাহায্যে কৃত্রিম

শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা। প্রথমে, আগেই যা বলা হয়েছে, শ্বাসের গমন পথ পরিষ্কার করে তা বাধামুক্ত করে নিতে হয় ও তারপর স্থাপন করতে হয় হাওয়া প্রবেশ করানোর যন্ত্র। রোগীর নাক ও মুখের ওপর আঁট করে চেপে ধরতে হয় যন্ত্রের মুখোস বা মাস্ক। যন্ত্রের থলের ওপর চাপ দিয়ে তা সংকুচিত করে সৃষ্টি করা হয় রোগীর নিঃশ্বাস, আর প্রশ্বাস চলে যায় মুখোসের ভাল্ভের ভেতর দিয়ে। এ কাজ এমন ভাবে করতে হয় যাতে প্রশ্বাসের সময় হয় নিঃশ্বাসের সময়ের দ্বিগুণ।

ফুসফুসে কৃত্রিম উপায়ে হাওয়া প্রবেশ করানোর সমস্ত রকমের ব্যবস্থায় সেগুলির কার্যকারীতার মূল্যায়ন করা দরকার, কতখানি তাতে বুক ওঠা-নামা করছে — তার ভিত্তিতে। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা আরম্ভ করা কখনই উচিৎ নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্বাসের পথ (মুখগহ্বর ও গলা) বাইরের কোন আটকে যাওয়া বস্তু, শ্লেষ্মা, খাদ্যবস্তু প্রভৃতি থেকে মুক্ত করা হচ্ছে।

যে উপায়গুলির কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে উপায়গুলি অবলম্বন করে বহুক্ষণ ধরে ফুসফুসে হাওয়া প্রবেশ ও নিষ্কাশন করানো সম্ভব নয়। ওগুলি কাজে লাগে কেবল প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে ও রোগীকে স্থানান্তরণকালে। তাই পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা — হৃৎপিন্ডের মালিশ ও কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা — ত্যাগ না করে, সমস্ত চেষ্টা করা দরকার যাতে জরুরী সাহায্যের এ্যাম্বুলেন্স ডাকা যায় বা রোগীকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে নেওয়া যায় যেখানে সে পাবে সুদক্ষ চিকিৎসা সাহায্য।

বিশেষ যন্ত্রর সাহায্যে ফুসফুসে কৃত্রিম উপায়ে হাওয়া প্রবেশ ও হাওয়া নিস্কাশনের ব্যবস্থা। দীর্ঘ সময় ধরে ফুসফুসে হাওয়া প্রবেশ ও হাওয়া নিষ্কাশনের জন্য শ্বাসনালীতে টিউব স্থাপন করা অবশ্য প্রয়োজন এবং তা করা হয় ল্যারিঙ্গোস্কোপের সাহায্যে শ্বাসনালী বা ট্রেকিয়ার ভেতর বিশেষ টিউব, এন্ডোট্রেকিয়াল টিউব স্থাপন করে। শ্বাসের পথ মুক্ত করে রাখার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হল ট্রেকিয়ার ভেতর টিউব প্রবেশ করানো। এতে জিহ্বার পেছন দিকে সরে যাওয়ার ও বমির সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য ট্রেকিয়াতে ঢুকে পড়ার বিপদ দূর হয়। এন্ডোট্রেকিয়াল টিউবের ভেতর দিয়ে যেমন মুখ থেকে টিউবের মারফৎ, তেমনি আধুনিক রেস্পিরেটার যন্ত্রের সাহায্যে টিউবের মারফৎ কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা সম্ভব হয়। এই সব যন্ত্রের সাহায্যে, কয়েকদিন ধরে, এমনকি কয়েক মাস ধরে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা যায়। দরকার পড়লে ৩-৪ দিন বা আরও বেশী দিন ধরে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা হয় ট্রেকিওস্টোমের ভেতর দিয়ে (শ্বাসনালীতে ফুটো করে তার ভেতর দিয়ে বসানো টিউবের মারফৎ)।

ট্রেকিওস্টোমি — এক জরুরী অপারেশন, যাতে গলার সামনের দিককার উপরিভাগের একটু জায়গা কেটে ট্রেকিয়া বা শ্বাসনলীতে স্থাপন করা হয় এক বিশেষ ধরনের টিউব। ডিপথেরিয়া ও নকল ক্রুপে এসফিক্সিয়া হলে অথবা ল্যারিংক্সে কোন বাইরের জিনিষ আটকানোর জন্য বা ল্যারিংক্স জখম হওয়ার জন্য যদি এসফিক্সিয়া হয় সে ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় ট্রেকিওস্টোমি। ট্রেকিওস্টোমির
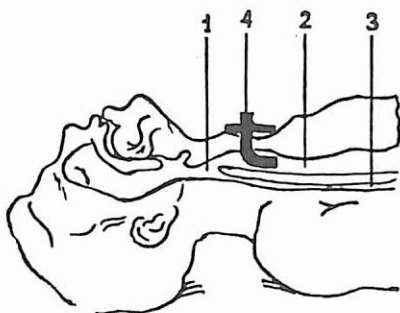
চিত্র — 38 : ট্রেকিওস্টোমি
1 — ল্যারিংক্স; 2 — শ্বাসনালী; 3 — খাদ্যনালী;
4 — ট্রেকিওস্টোমি টিউব

টিউব যদি না থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে যে কোন টিউব ব্যবহার করা চলে (চায়ের কেটলির গলা, সুতো জড়ানোর রীল বা ধাতব্ টিউব)। পরে টিউব বের করে নিলে ঘা আপনা থেকে শুকিয়ে যায়।

রক্তপ্রবাহ বন্ধে পুনরুজ্জীবিতকরণ

বহুবিধ কারণে হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধ হয়ে যেতে পারে (ডুবে গেলে, শ্বাসরোধ হলে, গ্যাসের বিষক্রিয়া হলে, বিদ্যুতাঘাত হলে ও বজ্রাঘাত হলে, মস্তিষ্কে রক্তপাত হলে, হৃৎপিন্ডের ইনফার্কশণ ও অন্যান্য অসুখ হলে, তাপ-আঘাত হলে, বেশীরকম রক্তপাত হলে, হৃৎপিন্ড অঞ্চলে সোজাসুজি প্রবল আঘাত লাগলে, অগ্নিদহন হলে, ঠান্ডায় জমে গেলে ও আরও অন্যান্য কারণে)। আবার তা ঘটতে

পারে যে কোন জায়গায়, যে কোন অবস্থায় — হাসপাতালে, দাঁতের ডাক্তারের ক্যাবিনেটে, বাসায়, রাস্তায়, কারখানায়। এই সবের যে কোন কেসে পুনরুজ্জীবিতকারীর হাতে রোগীকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য মাত্র ৩ থেকে ৪ মিনিট সময় থাকে, যার মধ্যে রোগ নির্ণয় করতে হবে ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে মস্তিষ্কে রক্তসরবরাহ। হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হওয়াকে দুই প্রকারে ভাগ করা হয়: — ১) এ্যাসিস্টোল (যাতে সম্পূর্ণ ভাবে হৃৎপিণ্ডের সব বিভাগের কাজ বন্ধ হয়ে যায়) ও ২) নিলয়গুলির ফাইব্রিলেশন (যাতে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর বিশেষ বিশেষ তন্তু ইচ্ছামত সংকুচিত হতে থাকে, অন্যগুলির সঙ্গে কোন সম্বন্ধ না রেখে)। প্রথম এবং দ্বিতীয় — এই দুই কেসেই হৃৎপিণ্ড রক্ত পাম্প করা বন্ধ করে এবং রক্তবাহী শিরাগুলির ভেতর রক্তের স্রোত বন্ধ হয়ে যায়।

হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধের মূল উপসর্গগুলি, যার সাহায্যে তাড়াতাড়ি এই কাজ বন্ধ হওয়া নির্ণয় করা যায় সেগুলি হল: — ১) অজ্ঞান হয়ে যাওয়া; ২) নাড়ীর গতিহীনতা — ক্যারটিড ধমনী ও ঊরুর ধমনীতে নাড়ী পাওয়া যায় না; ৩) হৃৎপিণ্ডের ধকধুকানি শোনা না যাওয়া; ৪) শ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া; ৫) চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রঙ ফ্যাকাশে হওয়া বা নিলাভা রঙ ধারণ করা; ৬) চোখের তারারন্ধ্র স্ফীত হওয়া; ৭) হাত-পায়ের খিঁচুনি, যা দেখা দিতে পারে জ্ঞান হারানোর সময় এবং পারিপার্শ্বিকের চোখে ধরা পড়ে বলে এটাই হতে পারে হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধের প্রথম উপসর্গ।

এই উপসর্গগুলি রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ার পরিষ্কার ও

নির্ভুল উপসর্গ, এবং তা পরিষ্কার ভাবে বলে দেয় যে আর এক সেকেন্ডও হারানো নয় কোন উপরি অনুসন্ধানের জন্য (রক্তের চাপ মাপা, নাড়ী গণনা করা) বা ডাক্তার খোঁজার জন্য, দরকার শুধু পুনরুজ্জীবীতকরণের কাজ অবিলম্বে আরম্ভ করা — তা হল হৃৎপিন্ডের মালিশ ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা। মনে রাখা দরকার যে, হৃৎপিন্ডের মালিশের সঙ্গে সর্বদা একই সঙ্গে করা উচিত কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা, যার ফলে প্রবহমান রক্তে সরবরাহিত হয় অম্লজান। তা না করলে পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা বৃথা, তার কোন অর্থ হয় না। বর্তমানে ব্যবহার করা হয় দুই রকমের হৃৎপিন্ড মালিশ: উন্মুক্ত অথবা সোজাসুজি হৃৎপিন্ডের গায়ে মালিশ, যে মালিশ ব্যবহৃত হয় কেবলমাত্র বক্ষপিঞ্জরের ভেতরকার কোন দেহাঙ্গের ওপর অপারেশন করার সময়; আর বদ্ধ বা বাইরে থেকে — বক্ষ গহ্বর উন্মুক্ত না করে মালিশ।

বাইরে থেকে হৃৎপিন্ড মালিশ করার কায়দা। বাইরে থেকে হৃৎপিন্ড মালিশের মর্ম হল উরঃফলক ও কশেরুকাস্তম্ভের মাঝখানে অবস্থিত হৃৎপিন্ডের ওপর তালে তালে চাপ সৃষ্টি করা। তাতে রক্ত ধাবিত হয় বাম নিলয় থেকে মহাধমনীতে ও সেখান থেকে সারা দেহে এমন কি মস্তিষ্ক পর্যন্তও চলে যায়, আর দক্ষিণ নিলয় থেকে তা ধাবিত হয় ফুসফুসে তা সংপৃক্ত হয় অম্লজানে। উরঃফলকের ওপর চাপ যখন বন্ধ করা হয়, হৃৎপিন্ডগহ্বর তখন আবার রক্তে ভর্তি হয় (চিত্র — ৩৯)। বাইরে থেকে হৃৎপিন্ড মালিশ করতে রোগীকে শোয়ানো হয় চিৎ করে শক্ত জিনিষের ওপর (মেঝেতে, মাটিতে)। গদি বা কোন
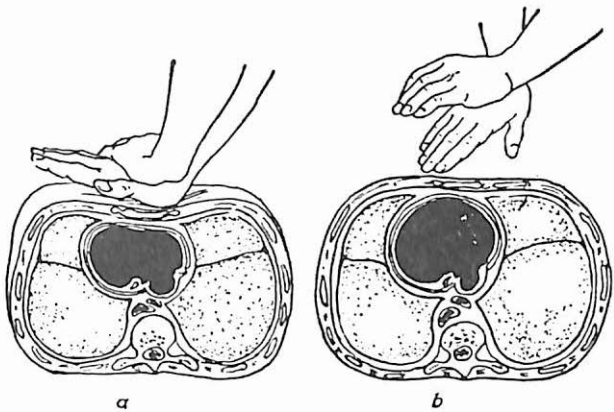
চিত্র — 39: বাইরে থেকে হৃৎপিন্ড মালিশ করার পদ্ধতি a — কৃত্রিম সিস্টোল (হৃৎপিন্ডের সংকোচন); b — হৃৎপিন্ডের ডায়াস্টোল (নিলয়গুলির শিথিল হয়ে রক্তে পরিপূর্ণ হওয়া)

নরম জিনিষের উপর শুইয়ে হৃৎপিন্ড মালিশ করা যায় না। পুনরুজ্জীবিতকারী দাঁড়ায় রোগীর এক পাশে এবং হাতের চেটো দুটি দিয়ে, এক হাত অন্য হাতের ওপর রেখে চাপ দেয় উরঃফলকের ওপর এমন জোরে, যাতে তা কশেরুকাকান্ডের দিকে খানিকটা বাঁকে — প্রায় ৪-৫ সেণ্টিমিটার। চাপ দিতে হয় মিনিটে ৫০ থেকে ৭০ বার। হাত স্থাপন করতে হয় উরঃফলকের নিচের তৃতীয়াংশে অর্থাৎ তরবারি আকৃতি উদ্গত অংশের ২ আঙ্গুল ওপরে (চিত্র — ৪০)। শিশুদের হৃৎপিন্ড মালিশ করতে হয় এক হাতে, আর কোলের শিশুদের ক্ষেত্রে দুই আঙ্গুলের ডগা দিয়ে মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার চাপ দিয়ে। ১ বছর
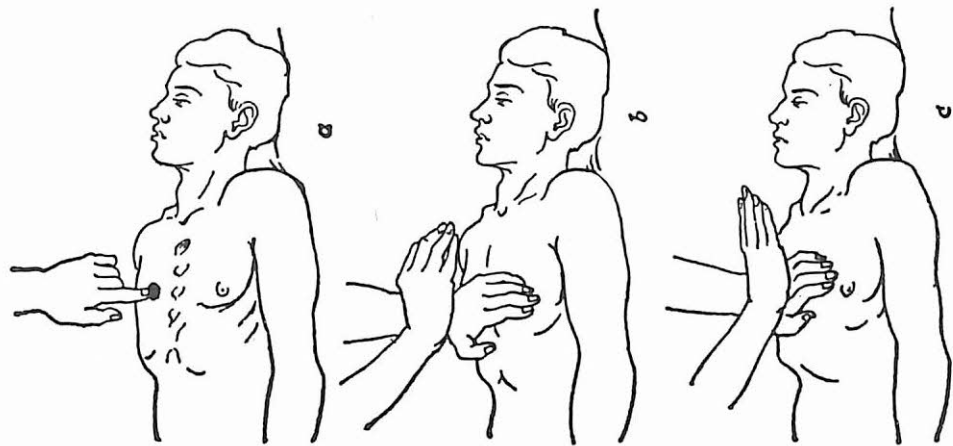
পর্যন্ত বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড মালিশ করতে আঙ্গুল স্থাপন করতে হয় উরঃফলকের সবচেয়ে নিম্ন স্থানের ওপর। বড়দের হৃৎপিণ্ড মালিশ করতে শুধু যে হাতের চাপ দিতে হয় তাই নয়, সে চাপ দিতে হয় সমস্ত শরীরের জোর লাগিয়ে। অনুরূপ মালিশ করতে যথেষ্ট শারীরিক শক্তির দরকার এবং ভাবে বেশ পরিশ্রম হয়। যদি একজন লোক রোগীকে পুনরুজ্জীবিত করে তাহলে তাকে প্রতি সেকেণ্ড অন্তর ১৫ বার উরঃফলকের ওপর চাপ দিয়ে তারপর চাপ দেওয়া বন্ধ করে, দুবার রোগীর মুখে মুখ লাগিয়ে বা নাকে মুখ লাগিয়ে বা বিশেষ হস্ত পরিচালিত রেস্পিরেটার দিয়ে সজোরে তার ফুসফুসে নিশ্বাস ঢোকাতে হয়। পুনরুজ্জীবিতকরণে যদি দুজন লোক অংশগ্রহণ করে তাহলে ৫ বার উরঃফলকে চাপ দেওয়ার পর ১ বার ফুসফুস ফোলাতে হয় (চিত্র—৪১)।

নিম্নলিখিত উপসর্গগুলি দিয়ে বিচার করা হয়, হৃৎপিণ্ডের মালিশ কার্য্যকরী হচ্ছে কি না: ১) ক্যারোটিড ধমনী, উরুর ধমনী ও বহিঃপ্রকোষ্ঠ ধমনীতে নাড়ীর স্পন্দন ফিরে আসা; ২) রক্তের চাপ ৬০ থেকে ৮০ সেণ্টিমিটার পারদস্তম্ভ পর্যন্ত ওঠা; ৩) তারারন্ধ্র সংকুচিত হওয়া এবং তাতে আলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া ফিরে আসা;

চিত্র—40: বাইরে থেকে হৃৎপিণ্ড মালিশ করার কায়দা
a—হৃৎপিণ্ড মালিশ করতে হাতদুটি স্থাপন করার স্থান;
b, c মালিশের সময় হাতদুটিকে যেমন করে রাখতে হয়

চিত্র — 41 : একই সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস ও বাইরে থেকে হৃৎপিন্ডের মালিশ পরিচালনা করা

৪) দেহের নীলাভা ভাব কেটে যাওয়া ও মৃত্যুর ফ্যাকাশে ভাব অন্তর্হিত হওয়া ; ৫) আরও পরে, নিজে নিজে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা ফিরে আসা।

মনে রাখা দরকার যে, খুব বেশী জোর লাগিয়ে বাইরে থেকে হৃৎপিন্ড মালিশ করলে তাতে কঠিন জটিলতা দেখা দিতে পারে — পাঁজরের অস্থির অস্থিভঙ্গ ও তারই খোঁচায় ফুসফুস ও হৃৎপিন্ড জখম হওয়া। উরঃফলকের তরবারী আকার উদ্‌গত অংশের ওপর অত্যধিক চাপ দিলে পাকস্থলী ও যকৃৎ ফেটে যেতে পারে। খুব সাবধানে হৃৎপিন্ড মালিশ করতে হয় শিশুদের ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে।

যদি হৃৎপিন্ড মালিশ, কৃত্রিম শ্বাস পরিচালনা ও ওষুধ সাহায্য ৩০-৪০ মিনিট ধরে চালিয়ে যাবার পরও দেখা যায়

যে, হৃৎপিন্ডের ক্রিয়াকলাপ ফিরে আসছে না, তারারন্ধ্র স্ফীত হয়েই আছে ও আলোর প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না, ধরে নেওয়া যায় যে, দেহে দেখা দিয়েছে অপরিবর্তনশীল অবস্থা ও মস্তিষ্কের মৃত্যু। সেক্ষেত্রে পুনরুজ্জীবিতকরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করা উচিত। যদি পরিষ্কার মৃত্যুর ছবি ফুটে ওঠে (দেখুন তৃতীয় পরিচ্ছেদ) তাহলে তা আরও আগে বন্ধ করা যায়।

কতগুলি কঠিন অসুখে ও আঘাতে (মেটাস্টেসিস যুক্ত ম্যালিগন্যান্ট টিউমারে, করোটির ভীষণ জখমে, যাতে মস্তিষ্ক ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে) পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টার কোন অর্থ হয় না এবং তা না আরম্ভ করাই ভাল। হঠাৎ মৃত্যুর অন্যান্য কেসে সব সময়ই আশা থাকে, পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টায় হয়ত ভাল হয়ে উঠবে এবং সেজন্য প্রয়োজন সমস্ত সম্ভাব্য প্রচেষ্টা।

হৃৎপিন্ডের কাজ ও শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হওয়া রোগীদের হাসপাতালে পরিবহণ করা চলে কেবলমাত্র তাদের হৃৎপিন্ডের কাজ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, অথবা যদি রোগীকে পরিবহণ করে জরুরী চিকিৎসা সাহায্যের বিশেষ এ্যাম্বুলেন্স, তবে তার ভেতর চালিয়ে যাওয়া চলে পুনরুজ্জীবিতকরণের ব্যবস্থাগুলি।

প্রবল চিকিৎসা (ইনটেন্সিভ থেরাপি)

কৃত্রিম উপায়ে ফুসফুসে হাওয়া প্রবেশ ও নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা ও হৃৎপিন্ড মালিশ করা — এগুলি হল সেই
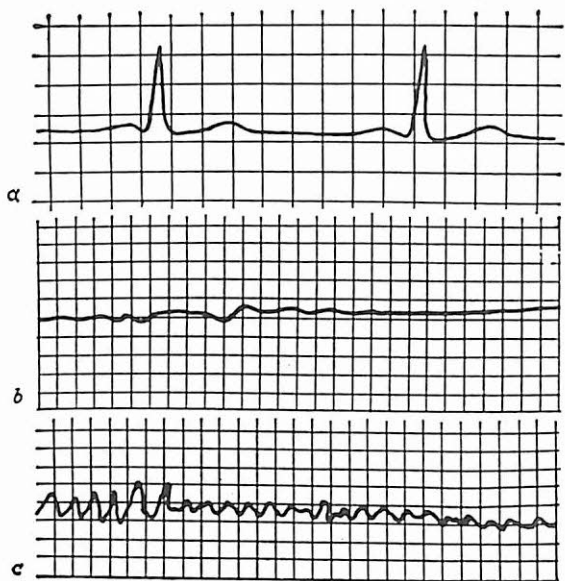
চিত্র—42: ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম
a—স্বাভাবিক; b—সিস্টোলবিহীন; c—নিলয়গুলির ফিব্রিলেশন

সব ব্যবস্থা সমষ্ঠির প্রথম ধাপ যার উদ্দেশ্য স্বয়ংপরিচালিত রক্তপ্রবাহ ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ এবং মস্তিষ্ক ও অন্যান্য দেহাঙ্গের ক্রিয়াকলাপ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। সাফল্য শুধু এরই ওপর নির্ভর করে না যে পুনরুজ্জীবিতকরণের এই জরুরী ব্যবস্থাগুলি সময়মত প্রয়োগ করা হয়েছে কি না, তা এর ওপরও নির্ভর করে যে, কত সঠিক ভাবে নির্ণয় করা হয়েছে অন্তিম অবস্থার কারণ ও কত সঠিক ভাবে

পরিচালিত হচ্ছে তার ওষুধ ও শিরার ভেতর দিয়ে পরিসঞ্চালিত চিকিৎসা। কি কারণে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়েছে তা নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজন ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফের সাহায্যে পরীক্ষা। এ্যাসিস্টোলের ও ভেণ্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশনের ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রামের পার্থক্য যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ; সে বৈশিষ্ট্য জানা দরকার সমস্ত চিকিৎসাকর্মীর (চিত্র — ৪২)।

ফিব্রিলেশনের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয় বিশেষ যন্ত্র, যাকে বলে ডিফিব্রিলাইজার। যন্ত্রটি আসলে বৈদ্যুতিক কণ্ডেন্সার, যার সাহায্যে সৃষ্টি করা যায় কয়েক হাজার ভোল্টের বৈদ্যুতিক চার্জ। ডিফিব্রিলাইজার ব্যবহার করতে বৈদ্যুতিক ডিসচার্জের সমস্ত যান্ত্রিক সাবধাণতা অবলম্বন করতে হয়, তা থেকে যে তড়িত মোক্ষণ হয় তার পরিমাণ ৩০০০ থেকে ৭০০০ ভোল্ট যা বক্ষপিঞ্জরের বাইরে থেকেই হৃৎপিণ্ডের ফিব্রিলেশন দূর করতে পারে। আধুনিক পুনরুজ্জীবিতকরণের জন্য জরুরী চিকিৎসা সাহায্যের বিশেষ এম্ব্যুলেন্সগুলিতে থাকে আধুনিক ডিফিব্রিলাইজার-কণ্ডেন্সার।

অন্তিম অবস্থা ও ক্লিনিকাল মৃত্যু অবস্থায় ওষুধের চিকিৎসা সাধারণত পরিচালিত করে ডাক্তারদের ব্রিগেড, দুর্ঘটনাস্থলে বিশেষ এম্বুলেন্স করে এসে। পুনরুজ্জীবিত করার জন্য যে সব ওষুধ ব্যবহার করা হয় তার সবগুলিরই উদ্দেশ্য হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা, তার ভেতরকার পদার্থ বিনিময় পুনরুজ্জীবিত করা, দেহাভ্যন্তরে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হওয়ার দরুণ সৃষ্ট অম্লাধিক্য দূর করা এবং পুনরুজ্জীবিত করার পরবর্তী কালের সম্ভাব্য

জটিলতাগুলি, বিশেষ করে মস্তিষ্কের ইডিমা (শোথ) প্রতিরোধ করা।

হৃৎপিন্ডের কাজ পুনরুজ্জীবিত করার কাজে ব্যবহৃত হয় এড্রিনালিন। ওষুধটি হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর টোনের ওপর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে। হৃৎপিন্ড মালিশ করার সময় ঐ ওষুধ ইঞ্জেকশন করা হয় হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীতে বা দেহের রক্তবাহী শিরার ভেতর দিয়ে ০·৫ সি.সি. ০·১% সলিউশন, ৫ সি.সি. সোডিয়াম ক্লোরাইডের নর্মাল সলিউশনের সঙ্গে বা গ্লুকোজ সলিউশনের সঙ্গে মিশিয়ে। এই একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এফেড্রিন, মেসাটোন, নরএড্রিনালিন। ভাল কাজ করে ক্যালসিয়াম যুক্ত ওষুধ — ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট। এই ওষুধগুলিও হৃৎপিন্ডের সংকোচন জোরদার করে এবং হৃৎপিন্ডের কাজ বন্ধে কার্যকরী। ৫ থেকে ১০ সি.সি. ১০% ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন, এক এক সময় এড্রিনালিনের সঙ্গে এক সঙ্গে হৃৎপিন্ডের ভেতর ইঞ্জেকশন করা হয়। পুনরুজ্জীবিতকরণে নোভোকেইনএমাইডও ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে ভেণ্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশনে, ডিফিব্রিলাইজ করার পূর্বমুহূর্তে। নোভোকেইনএমাইড এক এক সময় নিজেই হৃৎপিন্ডের ফিব্রিলেশন দূর করে।

মনে রাখা দরকার যে অম্লাধিক্যের পরিবেশে পুনরুজ্জীবিতকরণের ব্যবস্থাগুলি ও ওষুধ চিকিৎসায় কোন ফল হয় না। তাই প্রথম সুযোগেই পরিসঞ্চালন করতে হয় ৪ থেকে ৮·৪% সোডিয়াম হাইড্রোকার্বনেট সলিউশন। বি গ্রুপের ভিটামিন, এস্কর্বিকএসিড,

কোকার্বক্সিলেজ হাইড্রোক্লোরাইড, প্রেদ্নিজালন প্রভৃতির ইঞ্জেকশন এ দিক থেকে খুবই সার্থকতাপূর্ণ। এগুলি, অম্লাধিক্য দূর করে ও পদার্থ বিনিময়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এভাবে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়াকলাপ পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ও কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের কাজ উত্তেজিত করার ওষুধ, যেমন কর্ডিয়ামিন, লোবেলিন, সিটিটন, স্ট্রিকনিনের মত ওষুধগুলি পুনরুজ্জীবিতকরণের সময় কখনো ব্যবহার করতে নেই। কেননা, সেগুলি কোষের অভ্যন্তরীণ পদার্থ বিনিময়ের প্রক্রিয়া জোরদার করে শেষোক্তগুলিতে অম্লজানের চাহিদা বর্দ্ধিত করে ও এইভাবে সেগুলি-কে হাইপক্সিয়ার প্রতি আরও কম সহনশীল করে তোলে।

পুনরুজ্জীবিত করার সময় সমস্ত ওষুধ দেয়া হয় কেবল মাত্র শিরার ভেতর দিয়ে অথবা হৃৎপিন্ডের ভেতর ইঞ্জেকশন করে। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ চামড়া-নিম্নবর্তী বা মাংসপেশীর ভেতর ইঞ্জেকশন করাতে এ সময় কোন ফল হয় না, আর রক্ত চলাচল ঠিক ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সে ওষুধগুলি শোষিত হলে তখন তাতে রোগীর জীবনের পক্ষে বিপদজনক ফল হতে পারে। তাই পুনরুজ্জীবিতকরণ কালে শিরার ভেতর সূচ ঢুকিয়ে বা শিরার ভেতর ক্যাথিটার ঢুকিয়ে ওষুধ প্রবেশ করাতে হয়। ইদানীং পুনরুজ্জীবিত করার কাজে হৃৎপিন্ডের নিকটবর্তী মোটা শিরার ভেতর — সাবক্লেভিয়ান বা ইন্নমিনেট ভেনে, ক্যাথিটার স্থাপন করার রীতি প্রচলিত হয়েছে। এতে পুনরুজ্জীবিত করার সময় হৃৎপিন্ডে ওষুধ পরিসঞ্চালনের

জন্য ১৫ থেকে ২০ সেকেন্ডের বেশী হৃৎপিন্ডের মালিশ ও কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা বন্ধ রাখতে হয় না।

রোগীকে পুনরুজ্জীবিত করার পর প্রবল চিকিৎসা বা ইনটেন্সিভ থেরাপির মূল কাজ হল শিরার ভেতর প্রচুর পরিমাণে তরল পদার্থ পরিসঞ্চালিত করা, যাকে বলে ইনফিউশন থেরাপি। তার ভেতর পড়ে রক্ত ও রক্তের পরিবর্তে ব্যবহারযোগ্য তরল পদার্থ, ইলেক্ট্রোলাইট সলিউশন, শক্তিদায়ক ওষুধ (গ্লুকোজ, স্পিরিট), বিভিন্ন ওষুধ যা বিভিন্ন দিক থেকে দেহের ভেতরকার বিভিন্ন পদার্থের ভারসাম্য সৃষ্টি করে ও দেহের ভেতরে সৃষ্ট ও বাইরের বিষাক্ত জিনিষ বের করে দেয়।

পুনরুজ্জীবিতকরণ ব্যবস্থার সংগঠন

পুনরুজ্জীবিতকরণের প্রয়োজনীয়তা যে কোন পরিবেশে দেখা দিতে পারে। সে ক্ষেত্রে মানুষের জীবন নির্ভর করে, সাহায্যকারী পুনরুজ্জীবিতকরণের কায়দাগুলি (বাইরে থেকে হৃৎপিন্ড মালিশ করা ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনার কায়দাগুলি) কতখানি প্রয়োগ করতে জানে, তার ওপর। স্বভাবতই, কেবলমাত্র চিকিৎসাকর্মীরাই পারে নির্ভুল ভাবে সমস্ত পুনরুজ্জীবিতকরণের ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগ করতে।

পলিক্লিনিক, ওষুধের ডিস্পেন্সারি, ও যে কোন চিকিৎসাকেন্দ্রে এ কাজের জন্য বিশেষ ঘর সংগঠিত করা ও তাকে সুসজ্জিত করে রাখার তাৎপর্য্য খুবই বেশী। সেখানে আলাদাভাবে সাজিয়ে রাখা দরকার

পুনরুজ্জীবিতকরণের সমস্ত যন্ত্রপাতি ও ওষুধ, যার ভেতর থাকবে: ১) নির্বীজিত ব্যাণ্ডেজ ও গজ; ২) ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জ, বিশেষভাবে সাজানো;
৩) রক্তপাত বন্ধ করার টুর্নিকেট (নানা রকমের);
৪) হাওয়া প্রবেশ করানোর টিউব, যার ভেতর দিয়ে মুখ থেকে মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ পরিচালনা করা চলে;
৫) হস্ত পরিচালিত থলেযুক্ত রেস্পিরেটার;
৬) ওষুধ-পত্র, যার ভেতরে থাকবে: — এম্পুলে-ভরা এড্রিনালিন — ০·১% সলিউশন, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড (এম্পুলে-ভরা, ১০% সলিউশন), কোফেইন, এফেড্রিন, করগ্লিকন, প্রমেডল অথবা মর্ফিন, প্রেডনিজালন (প্রেডনিসোন) ইঞ্জেকশন (শিরার ভেতর দিয়ে দেওয়ার জন্য), নোভোকেইন, প্যাপাভেরিন, নাইট্রোগ্লিসারিন ট্যবলেট;
৭) শিরার ভেতর দিয়ে পরিসঞ্চালনের সলিউশন — পলিগ্লুকিন, হিমোডেজ ও জেলাটিনল;
৮) শিরা ফুটো করার বিভিন্ন সূ্চ;
৯) শিরার ভেতর দিয়ে তরল পদার্থ পরিসঞ্চালনের নির্বীজিত সিস্টেম বা ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে জরুরী সাহায্য দানের এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিসে পুনরুজ্জীবিতকরণের সাহায্য দল সৃষ্টি, সময় মত পুনরুজ্জীবিতকরণের সাহায্য দান ক্ষেত্রে এক মূল্যবান পদক্ষেপ। আজকাল পুনরুজ্জীবিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম যুক্ত, এমনকি ট্রেকিওস্টমি; শিরা, ধমনী ও হৃৎপিণ্ডে ক্যাথিটার প্রবেশ করানো, সোজাসুজি হৃৎপিণ্ডের মালিশ করা প্রভৃতি অপারেশনের

ব্যবস্থাযুক্ত এক রকমের বিশেষ এ্যাম্বুলেন্স গাড়ী কাজে নিয়োজিত হয়েছে, যার নাম **রিএনির্মাবিল**।

সমস্ত বড় হাসপাতালে এখন সংগঠিত করা হয়েছে বিশেষ পুনরুজ্জীবিতকরণ বিভাগ। ঐ সব বিভাগে আগে নিজস্ব ডাক্তারবৃন্দ, পুনরুজ্জীবিতকারী ও উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন নার্সবৃন্দ, নানা রকমের জটিল পুনরুজ্জীবিতকরণের ও রোগ নির্ণয়ের যন্ত্রপাতি। পুনরুজ্জীবিতকরণের বিভাগে ভর্ত্তি হয় অন্যান্য বিভাগের সবচেয়ে কঠিন রোগীরা, যেমন অপারেশনের পরের রোগীরা ও জরুরী সাহায্যের এ্যাম্বুলেন্সে করে আনা জটিল কেসগুলি। এখন খোলা হয়েছে থেরাপির পুনরুজ্জীবিতকরণ বিভাগ, যাতে চিকিৎসা করা হয় হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশন হওয়া রোগীদের, হৃৎপিণ্ডের ভীষণ অক্ষমতা যুক্ত রোগীদের, শ্বাস-প্রশ্বাস যন্ত্রের রোগযুক্ত কঠিন রোগীদের। অস্ত্রচিকিৎসার পুনরুজ্জীবিত করার বিভাগে চিকিৎসা করা হয় — অপারেশন-পরবর্তী রোগীদের। বিষক্রিয়ার সাহায্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করা হয় বিষক্রিয়া হওয়া রোগীদের, ট্রমাটোলজির পুনরুজ্জীবিতকরণ বিভাগে চিকিৎসা করা হয় কঠিন আঘাতের ও আঘাত জনিত সক্-হওয়া রোগীদের।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রক্ত পরিসঞ্চালন

রোগীর (রিসিপিয়েণ্ট) রক্তপ্রবাহে অন্য লোকের (ডোনারের) রক্ত দেওয়ার নাম হল পরিসঞ্চালন করা। এক লোক থেকে অন্য লোকে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রচেষ্টা ১৭ শতাব্দীতেও চলে। কিন্তু তা হলেও এ সব প্রচেষ্টা বিজ্ঞানভিত্তিক হয়ে দাঁড়ায় কেবল মাত্র ২০ শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন আবিষ্কৃত হয় আইসো এগ্লুটিনেশনের নিয়ম। এই নিয়মানুসারে সমস্ত লোককে তাদের রক্তের এগ্লুটিনেশন ক্ষমতার চরিত্রের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হয় ৪টি গ্রুপে (ইয়ানস্কি ইয়া. ১৯০৭ সাল)। রক্ত পরিসঞ্চালন ও রক্তের পরিবর্তে ব্যবহার্য্য তরল পদার্থ পরিসঞ্চালন (ট্র্যান্সফিউশিয়লজি) সম্বন্ধে জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আ. ম. ফিলোমাফিৎস্কি, ই. ভ. বুইয়ালস্কি, স. ই. স্পাসোকুকৎস্কি, ভ. ন. শামোভ, ন. ন. বুর্দেঙ্কো ও অন্যান্য রুশী ও সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের নাম।

রক্তের গ্রুপ। **বহু** বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়েছে যে, রক্তের ভেতর থাকতে পারে নানা প্রোটীন (নানা এ্যাগ্লুটিনোজন ও নানা এ্যাগ্লুটিনিন) এবং এ সবের একত্রে সমাবেশের (অবস্থানের অথবা অনবস্থানের) ফলেই সৃষ্টি হয় রক্তের চারটি গ্রুপ। প্রতিটি গ্রুপকে

দেওয়া হয়েছে তার স্থিরীকৃত সংকেত বা প্রতীক চিহ্ন: O(I), A(II), B(III), AB(IV)। প্রমাণিত হয়েছে যে, পরিসঞ্চালন করা সম্ভব শুধু একই গ্রুপের রক্ত। কেবলমাত্র বিশেষ অবস্থায়, যখন একই গ্রুপের রক্ত হাতের কাছে নেই অথচ জীবন রক্ষা করার জন্য রোগীকে রক্ত পরিসঞ্চালন করা খুবই দরকার, তখন অন্য গ্রুপের রক্তও পরিসঞ্চালন করা চলে। অনুরূপ অবস্থায় O(I) গ্রুপের রক্ত, যে কোন গ্রুপের রক্ত সম্বলিত রোগীর দেহে পরিসঞ্চালিত করা চলে, আর যাদের রক্তের গ্রুপ হল AB (IV), তাদের দেহে পরিসঞ্চালিত করা চলে যে কোন গ্রুপের রক্তদাতার (ডোনারের) রক্ত।

মিল না খাওয়া গ্রুপের রক্ত পরিসঞ্চালনে, রোগীর বিপদজনক জটিলতা ও মৃত্যু হতে পারে। তাই রক্ত পরিসঞ্চালন করতে আরম্ভ করার আগে দরকার সঠিক ভাবে নির্ণয় করে নেওয়া রোগীর রক্তের গ্রুপ ও যে রক্ত রোগীর দেহে পরিসঞ্চালিত করা হবে, তার গ্রুপ।

রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করার জন্য ব্যবহৃত হয় O(I), A(II), B(III) গ্রুপের স্ট্যান্ডার্ড সিরাম যা বিশেষ ভাবে প্রস্তুত করা হয় রক্তপরিসঞ্চালনের ষ্টেশনের লেবরেটারীতে। একটি সাদা কাঁচের প্লেট নিয়ে, তাতে ৩ থেকে ৪ সেণ্টিমিটার অন্তর বাম থেকে ডাইনে লেখা হয় I, II, III, যা উল্লেখ করে কোন গ্রুপের সিরাম। O(I) গ্রুপের স্ট্যান্ডার্ড সিরামের এক ফোঁটা পিপেটে করে নিয়ে রাখা হয় প্লেটের সেই সেক্টরে যেখানে লেখা I; তারপর দ্বিতীয় পিপেটে করে বহন করা হয় এক ফোঁটা A(II) গ্রুপের সিরাম ও রাখা হয় II চিহ্নিত সেক্টরে; তারপর ঐ ভাবেই

তৃতীয় পিপেটে করে এনে রাখা হয় B(III) গ্রুপের সিরাম III অংকিত সেক্টরে।

এর পর অনুসন্ধানকৃতের আঙ্গুলে সূঁচ ফুটিয়ে কাঁচের কাঠি দিয়ে রক্ত নিয়ে এসে প্লেটে অবস্থিত সিরামের ফোঁটাগুলির সঙ্গে মেশানো হয় যতক্ষণ না তা ভাল করে মিশে এক রঙ ধারণ করছে। প্রত্যেক ফোঁটা সিরামে, রক্ত নিয়ে আসা হয় নতুন পৃথক পৃথক কাচের কাঠি দিয়ে। মেশানোর ৫ মিনিটের মধ্যে (ঘড়ি অনুযায়ী) সেই মেশানো ফোঁটাগুলির মধ্যে পরিবর্তন লক্ষ্য করে নির্ণয় করা হয় রক্তের গ্রুপ। সেই সিরামের ফোঁটায় যেখানে এগ্লুটিনেশন (রক্তের লাল কণিকাগুলির পরস্পরের সঙ্গে আঠার মত আটকে যাওয়া) হবে সেখানে দেখা দেয় লাল লাল দানা ও ঢেলা। যে সিরামের ফোঁটায় এগ্লুটিনেশন হবে না সেখানে রক্তের ফোঁটাটি রয়ে যায় ভাল করে মেশানো একহারা গোলাপী রঙের স্তরের মত। অনুসন্ধানকৃতের রক্তের গ্রুপের ওপর নির্ভর করে এগ্লুটিনেশন দেখা দেবে নির্দিষ্ট ফোঁটায়। যদি অনুসন্ধানকৃতের রক্ত হয় O(I) গ্রুপের তাহলে এরিথ্রোসাইটের (রক্তের লাল কণিকার) আঠার মত আটকে যাওয়া একটি ফোঁটাতেও দেখা দেবে না। যদি অনুসন্ধানকৃতের রক্ত হয় A(II) গ্রুপের তাহলে এগ্লুটিনেশন হবে না কেবল মাত্র A(II) সিরামের ফোঁটায়, আর যদি অনুসন্ধানকৃতের রক্ত হয় B(III) গ্রুপের তা হলে এগ্লুটিনেশন হবে না শুধু B(III) সিরামের ফোঁটায়। এগ্লুটিনেশন দেখা দেয় সমস্ত সিরামের ফোঁটায় যদি অনুসন্ধানকৃতের রক্ত হয় AB(IV) গ্রুপের (চিত্র—৪৩)।
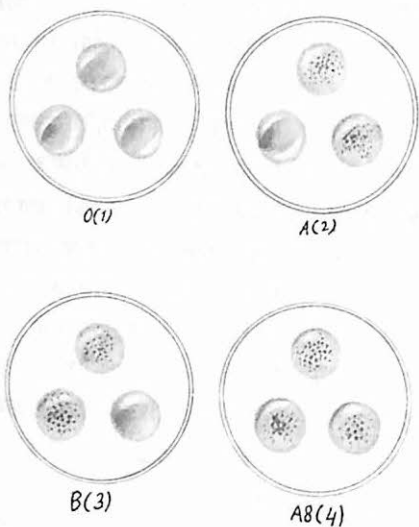
চিত্র — 43: স্টান্ডার্ড সিরামের সাহায্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় করা

রিসাস ফ্যাক্টর। এক এক সময় এমনকি একই গ্রুপের রক্ত পরিসঞ্চালনে দেখা দেয় বিপদজনক প্রতিক্রিয়া। অনুসন্ধানের ফলে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, প্রায় ১৫%

লোকের রক্তে অনুপস্থিত থাকে এক রকমের বিশেষ প্রোটীন যাকে বলে রিসাস ফ্যাক্টর। যদি এই রকম লোকের দেহে পুনর্বার পরিসঞ্চালিত করা হয় এমন রক্ত যাতে উপস্থিত আছে এই ফ্যাক্টর, তাহলে দেখা দেয় বিপদজনক জটিলতা যাকে বলে রিসাস কনফ্লিক্ট এবং দেখা দেয় সক্। তাই বর্তমানে সমস্ত রোগীর রিসাস ফ্যাক্টর নির্ণয় করা এক অবশ্য করণীয় নিয়মে পরিণত হয়েছে, কেননা রিসাস ফ্যাক্টর নেগেটিভ রক্ত সম্বলিত রক্তের গ্রাহককে বা রিসিপিয়েণ্টকে কেবলমাত্র পরিসঞ্চালিত করা চলে রিসাস ফ্যাক্টর নেগেটিভ রক্ত।

রিসাস ফ্যাক্টর আছে কি নেই—তা নির্ণয় করার দ্রুত উপায়। একটি কাঁচের পেট্রি থালায় (পেট্রি ডিসে) নেওয়া হয় ৫ ফোঁটা রিসাস নেগেটিভ সিরাম, সে সিরাম হতে হবে একই গ্রুপের রক্তের সিরাম যে রক্তের গ্রুপ রিসিপিয়েণ্টের (গ্রাহকের) নিজের। সে সিরামে যোগ করা হয় অনুসন্ধানকৃতের এক ফোঁটা রক্ত ও তা ভাল করে মেশানো হয়। পেট্রি থালাটিকে তারপর রাখা হয় জলের বাথে, ৪২ থেকে ৪৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপে। প্রতিক্রিয়ার ফল লক্ষ্য করতে হয় ১০ মিনিট পর। যদি দেখা যায় যে, রক্তের এগ্লুটিনেশন হয়েছে তা হলে বুঝতে হবে পরীক্ষা-করা রক্ত রিসাস্ পজিটিভ (Rh+) ; আর যদি দেখা যায় এগ্লুটিনেশন হয় নি তাহলে বুঝতে হবে পরীক্ষা-করা রক্ত রিসাস্ নেগেটিভ (Rh–)।

রিসাস ফ্যাক্টর নির্ণয়ের আরও অনেক উপায় বের করা হয়েছে, বিশেষ করে ইউনিভার্সাল (সব অনুসন্ধানে

প্রযোজ্য) রিসাস বিরোধী রিএজেণ্ট D-এর সাহায্যে তা নির্ণয় করা।

আমাদের দেশে, হাসপাতালে চিকিৎসারত সমস্ত রোগীর রক্তের গ্রুপ ও রিসাস্ ফ্যাক্টর নির্ণয় করার এবং সে অনুসন্ধানের ফলাফল রোগীর পাসপোর্টে লিপিবদ্ধ করার নিয়ম চালু হয়েছে।

প্রতিবার রক্ত পরিসঞ্চালনের আগে রক্তের গ্রুপ ও রিসাস ফ্যাক্টর নির্ণয় করা ছাড়াও পরীক্ষা করা হয়, যে রক্ত পরিসঞ্চালন করা হবে তার প্রতি রোগীর নিজস্ব রক্তের মিল আছে কি না ও সে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রতি রোগীর নিজস্ব দেহের সহ্য শক্তি কতখানি।

রোগীর নিজস্ব রক্তের মিল খাওয়ার অবস্থা পরীক্ষা করা হয় নিম্নলিখিত উপায়ে: একটি পেট্রি থালায় নেওয়া হয় ২ ফোঁটা রোগীর রক্তের সিরাম যার ওপর ফেলা হয় এক ফোঁটা পরিসঞ্চালিত করার জন্য রক্ষিত রক্ত। তারপর তা ভাল করে মেশানো হয়। ফল লক্ষ্য করা হয় ১০ মিনিট পরে। যদি এগ্লুটিনেশন না দেখা দেয় তাহলে ঐ রক্ত রোগীকে পরিসঞ্চালন করা চলে।

বায়োলজিকাল মিল খাওয়া, পরীক্ষা করা হয় পরিসঞ্চালন করার জন্য রক্ষিত রক্ত পরিসঞ্চালন করা কালে। রক্ত পরিসঞ্চালনের সিস্টেমকে, রক্তে ভরা বোতলের সঙ্গে যুক্ত করে যখন রোগীর শিরায় ঢোকানো সূঁচের সঙ্গে (বা ধমনীতে ঢোকানো সূঁচ) যুক্ত করা হয়, তখন রক্ত দেওয়া আরম্ভ করতে হয় ধারা স্রোতের আকারে এবং ৩ থেকে ৫ সি.সি. রক্ত দিয়েই, রক্ত দেওয়া বন্ধ করতে হয় কয়েক মিনিটের জন্য ও লক্ষ্য করতে হয় রোগীর অবস্থা। যদি
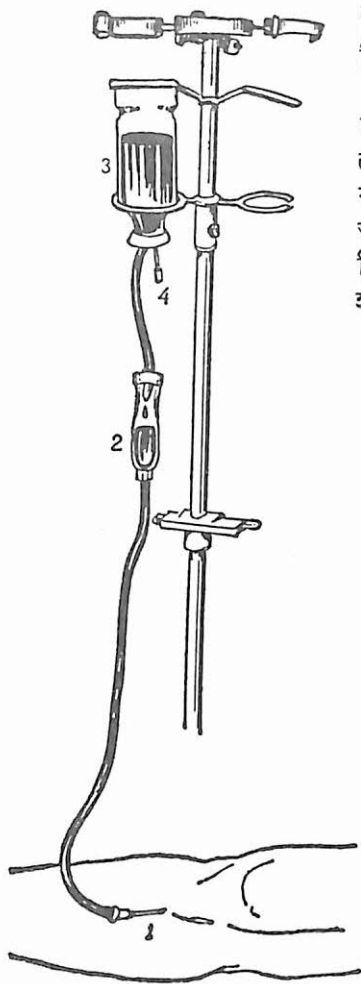
চিত্র — 44: শিরার ভেতর দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা করে রক্ত পরিসঞ্চালন
1 — সূচ, শিরার নলের ভেতর; 2 — ফোঁটা পড়ার ব্যবস্থাযুক্ত প্লাস্টিকের আধার; 3 — রক্ত-ভরা শিশি; 4 — শিশিতে হাওয়া প্রবেশের ফিল্টার যুক্ত সূচ

এতে কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয় (মাথা ব্যথা, কোমরে ব্যথা, হৃৎপিণ্ড অঞ্চলে ব্যথা, নিঃশ্বাসের কষ্ট, চামড়া লাল হয়ে ওঠা, কাঁপুনি প্রভৃতি আরও অনেক কিছু) তা হলে ধরা হয় যে রক্ত বায়োলজিকাল দিক থেকে মিল খায় এবং তা পরিসঞ্চালন করা সম্ভব। এই পরীক্ষার সময় বা পরিসঞ্চালন কালে অথবা আরও পরে যদি কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তাহলে তৎক্ষণাৎ পরিসঞ্চালন বন্ধ করে দিতে হয়।

রক্ত পরিসঞ্চালনের কায়দাগুলি। রক্ত পরিসঞ্চালন করা যায় সোজাসুজি বা প্রত্যক্ষভাবে যেমন, ডোনার বা রক্তদাতার রক্ত সিরিঞ্জে করে টেনে নিয়ে তখনই তা অপরিবর্তিত অবস্থায় রিসিপিয়েণ্টের বা রক্তগ্রাহকের রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। আবার, এ কাজ করা যায় অপ্রত্যক্ষ ভাবে যাতে ডোনারের রক্ত প্রথমে রক্তের জমাট হয়ে যাওয়া রোধ করার সলিউশন যুক্ত কোন পাত্রে গ্রহণ করে রক্ষণ করা হয় ও পরে পরিসঞ্চালিত করা হয় রিসিপিয়েন্টের রক্তপ্রবাহে।

প্রত্যক্ষ উপায়টি জটিল এবং তা ব্যবহার করা হয় খুবই কম কেসে, ব্যবহারের বিশেষ লক্ষণ থাকলে। অপ্রত্যক্ষ রক্ত পরিসঞ্চালনের কায়দা অনেক সহজ, তাতে রক্ত সংগ্রহ করে রাখার সুযোগ পাওয়া যায়, রক্ত পরিসঞ্চালনের গতি ও পরিমাণ সহজে অদল বদল করা যায়, রক্ত পরিসঞ্চালন করা যায় বিভিন্ন অবস্থায় (যেমন এ্যাম্বুলেন্স গাড়ীর ভেতর, উড়োজাহাজে ইত্যাদি) ও প্রত্যক্ষ রক্ত পরিসঞ্চালনের সঙ্গে জড়িত অনেক জটিলতা এড়িয়ে চলা যায়।

রক্ত পরিসঞ্চালন করা চলে ধমনীতে, শিরাতে ও

অস্থিমজ্জার ভেতর। কি ভাবে পরিসঞ্চালন করা হয়, তার ভিত্তিতে পার্থক্য করা হয় ফোঁটা ফোঁটা ও ধারা স্রোতের রক্ত পরিসঞ্চালনের ভেতর।

ধমনীর ভেতর সজোরে রক্ত পরিসঞ্চালিত করা হয় রোগীকে পুনরুজ্জীবিত করতে — যে সব কেসে দরকার তৎক্ষণাৎ রক্তক্ষয় পূরণ করা, রক্তের চাপ বৃদ্ধি করা ও হৃৎপিন্ডের কাজ উত্তেজিত করার। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় শিরার ভেতর দিয়ে রক্ত পরিসঞ্চালন করা (চিত্র — ৪৪)। যে সব ক্ষেত্রে শিরার ভেতর সূঁচ ঢোকানো সম্ভব হয় না, রক্ত পরিসঞ্চালন করা হয় অস্থির ভেতর (উরঃফলকের ভেতর, পেল্ভিক অস্থির ভেতর)।

রক্ত পরিসঞ্চালনের লক্ষণগুলি হল: ১) ভীষণ রক্তশূন্যতা। পরিসঞ্চালিত রক্ত পুনরুদ্ধার করে রক্তের হিমোগ্লোবিন, রক্তের লাল কণিকা ও প্রবহমান রক্তের পরিমাণ। অধিক রক্তপাতে এক এক সময় পরিসঞ্চালন করা হয় ২-৩ লিটার রক্ত; ২) সক্। এতে রক্তপরিঞ্চালন উন্নত করে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়াকলাপ, রক্তবাহী শিরাগুলির টোনাস বার্দ্ধিত করে ও রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, কঠিন অপারেশনে, অপারেশনের ও জখমের সক্ সৃষ্টি হওয়া নিবারণ করে; ৩) বহুদিনের ক্ষয়কারক অসুখ, অসুখের বিষক্রিয়া ও রক্তের অসুখ। রক্ত পরিসঞ্চালন জোরদার করে রক্তসৃষ্টির প্রক্রিয়া, উন্নত করে দেহের আত্মরক্ষার ক্রিয়াকলাপ, কমায় অসুখের বিষক্রিয়া; ৪) প্রবল বিষক্রিয়া (বিষজনিত বা বিষাক্ত গ্যাস জনিত)। রক্তের নিজস্ব শক্তিশালী বিষক্রিয়া বিরোধী কাজ আছে এবং তা বিষের ক্ষতিকারক কাজ অনেক পরিমাণে দুর্বল করে; ৫) রক্তের জমাট বাঁধার

শক্তি নষ্ট হওয়া। সামান্য ডোজে (১০০ থেকে ১৫০ সি.সি.) রক্ত পরিসঞ্চালন করলে তা রক্তের জমাট বাঁধার শক্তি বৃদ্ধি করে।

রক্ত পরিসঞ্চালন করা নিষেধ বৃক্কের ও যকৃতের কঠিন স্ফীতিযুক্ত অসুখগুলিতে, হৃৎপিণ্ডের কাজের ভারসাম্য নষ্ট-হওয়া ভাল্বের অসুখে, মস্তিষ্কের রক্তপাতে, ফুসফুসের টিউবারকুলোসিসে, তার ইনফিল্‌ট্রেটিভ বা স্ফীতি অবস্থায় এবং আরও অন্যান্য অসুখে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ডোনার বা রক্তদাতা। যে লোক আপন রক্তের খানিকটা অংশ দান করে তাকে বলা হয় রক্তদাতা বা ডোনার। যে কোন ১৮ থেকে ৫৫ বৎসর বয়স্ক সুস্থ লোক ডোনার হতে পারে। বেশীর ভাগ রক্ত যা রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়,, আমাদের দেশে তা বিনা পয়সায় দান করা ডোনারের রক্ত। হাজার হাজার সুস্থ নাগরিক, যারা তাদের সুউচ্চ সামাজিক কর্তব্য পালন করে অনেক বার রক্ত দান করে,তাদের দেওয়া হয় সম্মান প্রদর্শক পদবী "সোভিয়েত ইউনিয়নের ডোনার"। রক্ত প্রস্তুত করে রাখার কাজ আমাদের দেশে করে রক্ত পরিসঞ্চালন ষ্টেশন গুলি, বড়বড় হাসপাতালের রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্রগুলি ও এ বিষয়ে বিশেষীকৃত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানমূলক ইনষ্টিটিউটগুলি।

বিভিন্ন কারখানা, অফিস, উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক ভাবে পালিত হয় "ডোনার দিবস"। তাতে বিশেষ অপারেশন থিয়েটার যুক্ত এম্বুলেন্স, ডোনারদের কাজ বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে তাদের কাজ থেকে রক্ত সংগ্রহ করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রক্তপাতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

সকলেই জানে, মানুষের দেহে রক্ত প্রবাহিত হয় রক্তবাহী শিরাগুলির ভেতর দিয়ে: ধমনী, কৈশিক রক্তবাহী শিরা ও শিরাগুলি, যা ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত দেহাঙ্গে, সমস্ত কলায়। যে কোন দেহাঙ্গ বা কলা জখম হলে সর্বদা কম-বেশী জখম হয় রক্তবাহী শিরা।

রক্তবাহী শিরার ভেতর থেকে রক্ত বেরোলে (ঝরে পড়লে) তাকে বলা হয় রক্তপাত। রক্তপাতের কারণ বিভিন্ন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার কারণ হল সোজাসুজি আঘাত লাগা (খোঁচা লাগা, কেটে যাওয়া, বাড়ি লাগা, জোরে টান লাগা, থেৎলে যাওয়া এবং অন্যান্য)। রক্তপাতের প্রাবল্য নির্ভর করে, কতগুলি রক্তবাহী শিরা জখম হয়েছে, শিরাগুলি কতমোটা ও জখমের চরিত্র কি (শিরা দ্বিভক্ত হওয়া, শিরার গায়ে ছেঁদা হওয়া, শিরা ছিঁড়ে যাওয়া, ইত্যাদি) ও কোন্ রকমের শিরা (ধমনী, শিরা, কৈশিক শিরা) জখম হয়েছে — তার ওপর। রক্তের চাপ ও রক্তের জমাট-বাঁধা তন্ত্রের কাজের অবস্থাও রক্তপাতের পরিমাণের ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তা ছাড়াও, কোথায় রক্ত

ঝরে পড়ছে — দেহের বাইরে, দেহের ভেতরকার কোন বদ্ধ গহ্বরে (প্লুরার গহ্বর, পেরিটোনিয়ামের গহ্বর, হাঁটুর অস্থিসন্ধির গহ্বর ইত্যাদি), নরম কলার ভেতর (চামড়ার তলায়, মাংসপেশী, অন্তঃমাংসপেশীর ফাঁকে) — এ সব জানার সার্থকতা কম নয়।

রক্তবাহী শিরা,যেগুলি আর্টেরিওস্ক্লেরোসিসে আক্রান্ত সেগুলি রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে, ব্লাড-প্রেসার রোগে ফেটে যেতে পারে। বিশেষ বিপদজনক হল মহাধমনীর (এওর্টার) এনিউরিজম ফেটে যাওয়া, যাতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমস্ত প্রবহমান রক্ত নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে। অধিক রক্তপাত হয় ভেরিকোজ হয়ে মোটা হয়ে যাওয়া শিরাগুলি থেকে (যাকে বলে ভেরিকোজ ভেন)। তার ভেতর আবার সবচেয়ে বিপদজনক হল খাদ্যনালীর ভেরিকোজ শিরাগুলি থেকে রক্তপাত, যা দেখা যায় যকৃতের সিরোসিসে, প্রবেশদ্বারীয় বা পোর্টাল শিরার হাইপারটেনশন বা উচ্চ চাপের ফলে। রক্তবাহী শিরার দেওয়াল জখম হতে পারে, তাতে স্ফীতি বা ঘা হওয়ার ফলে অথবা ম্যালিগন্যাণ্ট টিউমার হওয়ার দরুণ।

এক এক সময় রক্তপাতের কারণ হয় রক্তের রাসায়নিক গঠনের পরিবর্তন, যাতে রক্ত, রক্তের শিরার দেওয়ালের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে, এমনকি শিরার দেওয়াল না জখম হওয়া সত্ত্বেও। অনরূপ অবস্থা দেখা যায় বেশ কয়েকটি রোগে: জণ্ডিস, সেপসিস, রক্তের রোগ ও আরও অন্যান্য অসুখে।

রক্তপাত হতে দেখা যায় নানা তীব্রতার এবং তা নির্ভর করে কোন্ রকমের রক্তবাহী শিরা জখম হয়েছে, তার ওপর। তফাৎ করা হয় ধমনী থেকে রক্তপাত, শিরা থেকে রক্তপাত, কৈশিক রক্তবাহী শিরা থেকে রক্তপাত ও প্যারানকাইমা থেকে রক্তপাতের ভেতর।

ধমনীর রক্তপাত — জখন হওয়া ধমনী থেকে রক্তপাতে বেরোনো রক্ত উজ্জ্বল লাল রঙের, রক্তপাত হয় বেশ জোরে, স্পন্দনশীল ধারায়। ধমনীর রক্তপাত সবচেয়ে বেশী বিপদজনক, সাধারণত সে রক্তপাত বেশ তীব্র ও তাতে বেশী রকম রক্তক্ষয় হতে দেখা যায়। যদি জখম হয় মোটা ধমনী বা মহাধমনী তাহলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এত রক্তক্ষয় হতে পারে যে আর বাঁচা সম্ভব নয় এবং রোগী প্রাণ হারায়।

শিরার রক্তপাত। শিরার রক্তপাত হয় শিরা জখম হলে। শিরার ভেতরকার রক্তের চাপ ধমনীর ভেতরকার রক্তের চাপের তুলনায় অনেক কম। তাই রক্তপাত হয় অনেক ধীরে ও মাঝে মাঝে থেমে থেমে। এই রকমের রক্তপাতে রক্তের রঙ কালচে-লাল রঙের। শিরার রক্তপাত হয় ধমনীর রক্তপাত থেকে কম জোরে, এবং তাই জীবননাশের আশঙ্কা তাতে কদাচিৎ দেখা দেয়। কিন্তু গ্রীবাদেশের ও বক্ষপিঞ্জরের ভেতরকার শিরা জখম হলে দেখা দেয় অন্য রকমের আশঙ্কা। এইসব শিরাগুলিতে নিঃশ্বাস গ্রহণের মুহূর্তে সৃষ্টি হয় নেতিবাচক চাপ (নেগেটিভ প্রেসার), তাই এগুলি জখম হলে গভীর নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় এই সব শিরার

নলের ভেতর, ক্ষত থেকে, হাওয়া প্রবেশ করতে পারে। হাওয়ার বুদবুদগুলি রক্তের ধারার সঙ্গে হৃৎপিন্ডে ঢুকে হৃৎপিন্ড ও রক্তবাহী শিরাগুলির পথ দখল করে সৃষ্টি করতে পারে হাওয়ার এম্বলিজম (এয়ার এম্বলিজম), যা সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কৈশিক শিরা থেকে রক্তপাত ঘটে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রক্তবাহী শিরা জখম হলে, যেগুলিকে বলে ক্যাপিলারি। অনুরূপ রক্তপাত দেখা যায়, যেমন অগভীর ভাবে চামড়া কেটে গেলে বা ছড়ে গেলে। রক্তের স্বাভাবিক জমাট বাঁধার গুণ সুরক্ষিত থাকলে, কৈশিক রক্তপাত আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

প্যারানকাইমার রক্তপাত। যকৃৎ, প্লীহা, বৃক্ক ও অন্যান্য প্যারানকাইমা কোষযুক্ত দেহাঙ্গগুলিতে থাকে ধমনী, শিরা ও কৈশিক রক্তবাহী শিরার উন্নত জাল। ঐ সব দেহাঙ্গ জখম হলে, জখম হয় ও সমগ্রতা হারায় সমস্ত রকমের রক্তবাহী শিরা এবং সৃষ্টি হয় বেশী রকমের রক্তপাত, যাকে বলে প্যারানকাইমার রক্তপাত। যেহেতু রক্তবাহী শিরাগুলি ঐ সব দেহাঙ্গের কলার ভেতরে বদ্ধ অবস্থায় থাকে এবং সংকুচিত হতে পারে না, সেইহেতু আপনা থেকে রক্তবন্ধ হওয়া এ সব ক্ষেত্রে প্রায় কখনই ঘটে না।

জখম হওয়া রক্তবাহী শিরা থেকে রক্তপাত হয়ে রক্ত কোথায় প্রবাহিত হচ্ছে, তার ভিত্তিতে পার্থক্য করা হয় রক্তপাত বাইরের না অভ্যন্তরীণ।

বাহ্যিক রক্তপাত হল চামড়ার ক্ষতের ভেতর দিয়ে রক্তের, দেহের বাইরে এসে পড়া। ফাঁপা দেহাঙ্গগুলি (পাকস্থলী, অন্ত্র, মূত্রাশয়, শ্বাসনালী), যার ভেতরের ফাঁপা

জায়গার সঙ্গে বাইরের প্রকৃতির যোগাযোগ আছে, সেগ্দলির ভেতর রক্তপাত হলে তাকে বলে বাইরের অলক্ষিত রক্তপাত। কেননা রক্ত বাইরে চলে আসতে নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যায়, এক এক সময় তাতে লাগে কয়েক ঘণ্টা সময়।

অভ্যন্তরীণ রক্তপাত দেখা যায় গভীর ভেদ-করা জখমে, বন্ধ জখমে (যাতে অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গ ফেটে যায় অথচ চামড়া জখম হয় না,যেমন সজোরে গ্দতো লাগলে, উঁচু স্থল থেকে পড়ে গেলে, চ্যাপ্‌টানো চাপ লাগলে) এবং তাছাড়াও অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গগ্দলির নানা অস্দখে (ঘা, ক্যান্সার, টিউবারকুলোসিস, রক্তবাহী শিরার ইনিউরিজম)। অভ্যন্তরীণ রক্তপাত হলে রক্ত জমা হয় কোন না কোন গহ্বরে।

চারিদিক থেকে বন্ধ গহ্বরে রক্তপাত (প্লদরা গহ্বরে, পেরিটোনিয়াম গহ্বরে, পেরিকার্ডিয়াম গহ্বরে, করোটি গহ্বরে) বিশেষ বিপদজনক। এইসব রক্তপাত চলে অলক্ষিত ভাবে এবং তার ডাইয়াগ্নোসিস করা বা তা নির্ণয় করা খ্দবই কঠিন এবং তা ধরা নাও পড়তে পারে, যদি রোগীর প্রতি খ্দব মনোযোগের সাথে নজর না রাখা হয়।

প্লদরা বা পেরিটোনিয়াম গহ্বরে সহজেই দেহের সমস্ত প্রবহমান রক্ত ধরতে পারে, তাই অনদর্দপ রক্তপাত অনেক সময় মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কোন কোন কেসে রক্তপাত বিপদজনক হয়ে দাঁড়ায় এই জন্য নয় যে,, বেশীপরিমাণ রক্তপাত হয়েছে, ,তা এই জন্য যে, বেরিয়ে আসা রক্ত চাপ সৃষ্টি করে জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় দেহাঙ্গগ্দলির ওপর। এই ভাবেই

পেরিকার্ডিয়াম গহ্বরে রক্ত জমা হলে তা হৃৎপিণ্ডের ওপর চাপ সৃষ্টি করে (হৃৎপিণ্ডের ট্যাম্পেনেড) তার কাজ বন্ধ করে দিতে পারে, আর করোটি গহ্বরে রক্তপাত হলে তা মস্তিষ্কের ওপর চাপ সৃষ্টি করে মৃত্যু ঘটাতে পারে। অনেক পরিমাণ রক্তক্ষয় সম্ভব যদি রক্তপাত হয় দুই কলার অন্তঃস্থলে ও কলার ভেতর (মাংশপেশী, চর্বিযুক্ত কোষকলা)। এতে সৃষ্টি হয় যাকে বলে হিমাটোমা (রক্ত জমাট হয়ে ফুলে শক্ত হয়ে ওঠা জায়গা), কালসিটে।

রক্তপাত এই কারণে বিপদজনক যে, তাতে প্রবহমান রক্তের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াকলাপ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জীবনের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় দেহাঙ্গগুলিতে (মস্তিষ্ক, বৃক্ক, যকৃতে) অম্ল সরবরাহের ব্যতিক্রম দেখা দেয়।এই সব সৃষ্টি করে দেহের সমস্ত পদার্থ বিনিময় প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, যাতে অন্তিম অবস্থা সৃষ্টি দ্রুততর হয়।

বাহ্যিক রক্তপাতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

যে পরিবেশে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া হয়, তাতে কেবলমাত্র সাময়িক ভাবেই বা প্রাথমিক ভাবে রক্তপাত বন্ধ করে রাখা সম্ভব হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না দুর্দশাগ্রস্তকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পেঁাছে দেওয়া যাচ্ছে।

যে উপায়ে সাময়িক ভাবে রক্তপাত বন্ধ করে রাখা যায় তার ভেতর পড়ে: ১) দেহের আহত স্থানটিকে দেহের ধড়ের তুলনায় উচ্চতর অবস্থানে রাখা; ২) যে রক্তবাহী শিরা থেকে রক্তপাত হচ্ছে তাকে চেপে ধরা, চাপ

সৃষ্টিকারী ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে; ৩) ধমনীকে চেপে ধরা, তার অববাহিকা পথে খানিকটা জায়গা জুড়ে; ৪) দেহের অন্তভাগের অস্থিসন্ধিকে যতদূর সম্ভব ভাঁজ বা টান করা অবস্থায় রেখে রক্ত বন্ধ করা; ৫) টুর্নিকেটের সাহায্যে দেহের অন্তভাগের ওপর চারদিক থেকে চাপ সৃষ্টি করা; ৬) আর্টারি ফরেসেপস্ দিয়ে ক্ষতের ভেতরকার রক্তপাতরত রক্তবাহী শিরা চেপে ধরে রক্তবন্ধ করা।

কৈশিক রক্তবাহী শিরা থেকে রক্তপাত সহজেই বন্ধ করা যায় ক্ষত স্থানটি সাধারণ ভাবে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়ার সাহায্যে। ড্রেসিং-এর জিনিষ-পত্র যতক্ষণ তৈরী করা হচ্ছে ততক্ষণ এই রক্তপাত কমিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট, জখম হওয়া দেহ প্রান্তটিকে ধড়ের চেয়ে উচ্চস্থানে ধরে রাখা। তাতে সেই দেহপ্রান্তের দিকে রক্তের ধারা অনেক কমে, রক্তবাহী রক্তের চাপও হ্রাস পায়, যার ফলে ক্ষতের ওপর রক্ত তাড়াতাড়ি জমে যায়, রক্তপাতরত শিরার মুখ বন্ধ হয় ও রক্তপাত থেমে যায়।

শিরা থেকে রক্তপাতে নির্ভরযোগ্য ও সাময়িক ভাবে রক্ত বন্ধ করা যায় চাপ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করার সাহায্যে। ক্ষতের ওপর পাতা হয় কয়েক স্তর গজ ও শক্ত তুলোর দলা, তারপর টেনে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। চেপে ব্যাণ্ডেজ করার ফলে রক্তবাহী শিরাগুলিতে রক্ত জমে যায় বলে, সাময়িক রক্ত বন্ধের এই উপায়টি রক্ত বন্ধের শেষ উপায়েও পর্যবসিত হতে পারে। শিরা থেকে জোর রক্তপাত হলে চাপযুক্ত ব্যাণ্ডেজের ব্যবস্থা করাকালীন সময়ে, শিরা থেকে রক্তপাত সাময়িক ভাবে বন্ধ করে রাখা যায়, রক্তপাতরত ক্ষতটিকে আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরে। জখম যদি দেহান্তভাগে
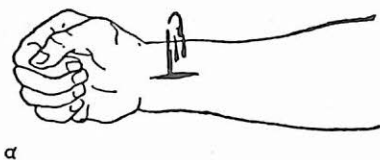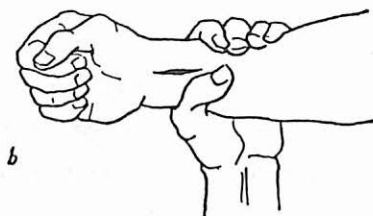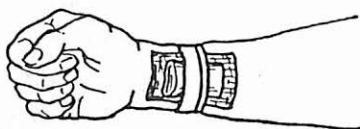
c

চিত্র — 45 : চাপ সৃষ্টিকারী বন্ধনীর সাহায্যে ধমনী থেকে রক্তপাত বন্ধ করা

a — ধমনীর রক্তপাত ; b — খানিকটা জায়গা জুড়ে ধমনীকে চেপে ধরে সাময়িক ভাবে রক্তপাত বন্ধ করা ; c — চাপ সৃষ্টিকারী বন্ধনী

হয় তাহলে সেই দেহপ্রান্তটিকে ওপরে তুলে ধরে অনেক পরিমাণে রক্তক্ষয় কমানো যায়।

সরু ধমনী থেকে রক্তপাত হলে চেপে ব্যাণ্ডেজ করার সাহায্যেই তা সাফল্যের সঙ্গে বন্ধ করা যায় (চিত্র — ৪৫)। যদি মোটা ধমনী থেকে রক্তপাত হয় তাহলে অবিলম্বে

রক্তপাত বন্ধ করার জন্য এই ব্যবস্থা করতে হয় — আঙ্গুল দিয়ে ক্ষতের ধমনীকে চেপে ধরতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না ধমনী থেকে রক্তপাত থামানোর অধিকতর নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা প্রস্তুত হচ্ছে। ক্ষতের ভেতর থেকে রক্তপড়া বন্ধের আর এক উপায় হল রক্ত বন্ধের ফর্সেপ দিয়ে রক্তপাতরত রক্তবাহী শিরার মুখ আটকে ধরে নির্বীজিত গজ ও ব্যাণ্ডেজ প্রভৃতি দিয়ে শক্ত ভাবে ক্ষত প্যাক করা। আটকানো ফর্সেপটিকে যত্ন করে, নড়াচড়া না করে এভাবে ধরে রাখতে হয় ও দেখতে হয় যে, দুর্দশাগ্রস্তকে হাসপাতালে পরিবহণ করার সময় তা যেন স্থানচ্যুত না হয়।

ধমনী থেকে রক্তপাত খুব তাড়াতাড়ি বন্ধের জন্য ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয় ধমনীকে খানিকটা জায়গা জুড়ে তার অববাহিকা পথে চেপে ধরা। এই উপায়ে রক্তপাত থামানোর ভিত্তি হল এই যে, কতগুলি ধমনীকে সহজে আঙ্গুল দিয়ে পুরোপুরি চেপে ধরা যায়, সেগুলিকে তাদের তলায় অবস্থিত অস্থিগুলির গায়ে চেপে ধরে। আঙ্গুলের চাপে অনেকক্ষণ ধরে রক্তপাত বন্ধ করে রাখা সম্ভব নয়, কেননা তার জন্য দরকার যথেষ্ট শারীরিক শক্তি। সাহায্যকারীর পক্ষে এ উপায়ে সাহায্য দেওয়া খুবই ক্লান্তিকর এবং এই ভাবে সাহায্য দান করা অবস্থায় দুর্দশাগ্রস্তকে হাসপাতালে পরিবহণ করা কার্যত অসম্ভব। ক্ষতে ইনফেকশন বহন না করে, সাময়িক ভাবে রক্তপাত বন্ধ করার পর অধিকতর নির্ভরযোগ্য ভাবে রক্ত বন্ধ করার সমস্ত ব্যবস্থা প্রস্তুত করার জন্য সবচেয়ে সুবিধাজনক হল শক্ত করে চেপে ব্যাণ্ডেজ করা, ফাঁস পড়িয়ে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শক্ত করা, টুর্নিকেট বাঁধা। ধমনীকে চেপে ধরা
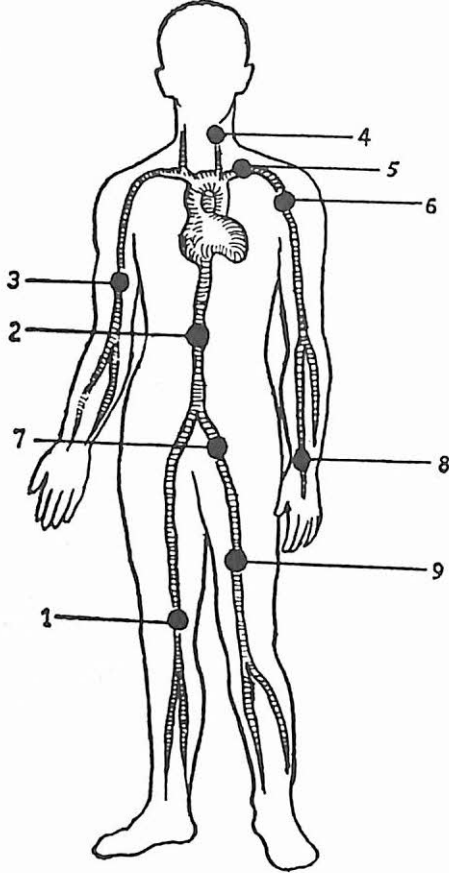
চিত্র — 46: খানিকটা জায়গা জুড়ে ধমনীকে চেপে ধরে রাখার সবচেয়ে প্রচলিত স্থানগুলি

1 — জানু-পশ্চাৎ ধমনী; 2 — পেটগহ্বরের মহাধমনী; 3 — ব্রেকিয়াল ধমনী; 4 — ক্যারটিড ধমনী; 5 — সাবক্লেভিয়ান ধমনী; 6 — অ্যাক্সিলারি ধমনী; 7 — ফিমোরাল ধমনী; 8 — রেডিয়াল ধমনী; 9 — টিবিয়াল ধমনী
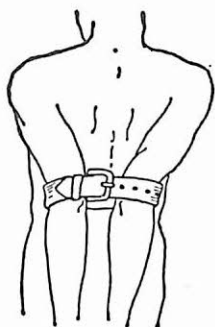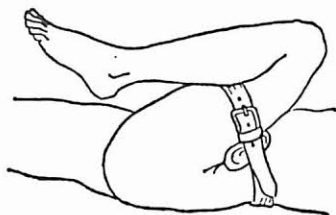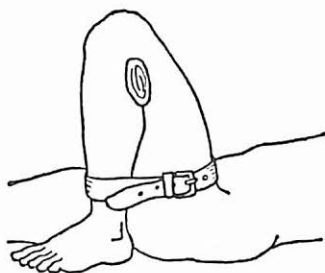
চিত্র — 47 :দেহপ্রান্তগুলিকে বিশেষ অবস্থানে নিশ্চল করে ধরে রেখে সাময়িক ভাবে রক্তপাত বন্ধ করা
a — সাবক্লেভিয়াল ধমনীর রক্তপাতে; b — ঊরুর ধমনীর রক্তপাতে; c — জানু-পশ্চাৎ ধমনীর রক্তপাতে; d — বাহু ও অন্তঃপ্রগণ্ড ধমনীর রক্তপাতে

যায় বুড়ো আঙ্গুল, হাতের চেটো ও হাতের মুঠি দিয়ে। খুব সহজে চেপে ধরা যায় ঊরুর ও বাহুর ধমনী (ফেমোরাল ও ব্রেকিয়াল আর্টারী), চেপে ধরা শক্ত

ক্যারটিড ও বিশেষ করে সাবক্লেভিয়ান ধমনীকে (চিত্র — ৪৬)।

দেহপ্রান্তকে বিশেষ অবস্থায় আটকে রেখে ধমনী চেপে রাখার ব্যবস্থাগুলি কাজে লাগানো হয় রোগীদেরকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময়। সাবক্লেভিয়ান ধমনী জখম হলে রক্তপাত বন্ধ করা সম্ভব হয় যদি কনুই ভাঁজ-করা দুই হাত যতদূর সম্ভব পেছনে টেনে নিয়ে তাদের শক্ত করে এক সঙ্গে বাঁধা যায় কণুই-এর অস্থিসন্ধির কাছে। পপ্লিটিয়াল ধমনীকে চেপে বন্ধ করা যায় যদি পা'কে যতদূর সম্ভব হাঁটুভাঁজ করা অবস্থায় আটকে বেঁধে রাখা যায়। ফিমোরাল বা ঊরুর ধমনীকে চেপে বন্ধ করা যায় যদি ঊরুকে যতদূর সম্ভব পেটের ওপর নিয়ে সেখানে আটকানো যায়। ব্রেকিয়াল ধমনীকে কণুই-এর কাছে চেপে ধরতে কণুই-এর কাছে হাত যতদূর সম্ভব বেশী ভাঁজ করতে হয়। এই উপায়ে রক্ত বন্ধ করা আরও ফলপ্রসূ হয় যদি দেহপ্রান্তের সেই ভাঁজ করার জায়গায় তুলোর বা গজের শক্ত করে মোড়ানো রোল আগে পেতে নেওয়া হয় (চিত্র — ৪৭)।

নির্ভরযোগ্য ভাবে ধমনী থেকে রক্তপাত বন্ধ করে, দেহপ্রান্তকে চতুর্দিক থেকে চেপে বেঁধে ফেলার ব্যান্ডেজ, যাতে ক্ষতের ঊর্ধে অবস্থিত সমস্ত প্রকারের রক্তবাহী শিরার ভেতর দিয়ে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হয়। সবচেয়ে সহজে এটা করা যায় বিশেষ রবারের বন্ধনীর সাহায্যে, যাকে বলে টুর্নিকেট।

টুর্নিকেট বাঁধার কায়দা। টুর্নিকেট হল স্থিতিস্থাপক রবারের নল বা বেল্ট, যার এক প্রান্তে যুক্ত একটি আংটি
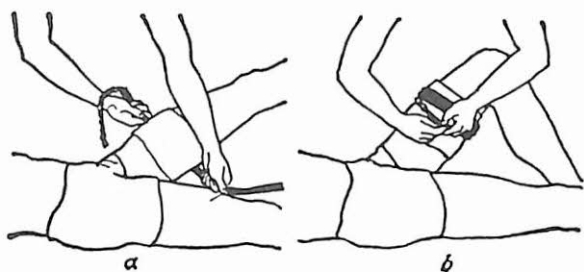
চিত্র — 48 : রবারের টুর্নিকেট বাঁধার কায়দা
a — টুর্নিকেটকে টেনে লম্বা করা ; b — টুর্নিকেটেকে বেঁধে শিকল ও কড়ার সাহায্যে আটকে রাখা

ও অন্যাদিকে হুক, বন্ধনীকে বাঁধার শেষে ভাল করে আটকে রাখার জন্য। টুর্নিকেট হিসাবে ব্যবহার করা চলে যে কোন রবারের টিউব।

ঊর্দ্ধবাহুতে টুর্নিকেট বাঁধার সবচেয়ে সুবিধাজনক জায়গা হল ঊর্দ্ধবাহুর ঊর্দ্ধ তৃতীয়াংশ, আর নিম্নদেহ প্রান্তে ঊরুর মধ্য-তৃতীয়াংশ। টুর্নিকেট বাঁধার প্রয়োজন হয় কেবলমাত্র দেহপ্রান্তগুলি থেকে জোরে ধমনীর রক্তপাতে হলে। অন্যান্য কেসে টুর্নিকেট বাঁধার পরামর্শ দেওয়া হয় না।

টুর্নিকেটের তলায় চামড়া যাতে জখম না হয় তার জন্য তা বাঁধার সময় তলায় তোয়ালে বা রোগীর কোন জামা-কাপড় বিছিয়ে নেওয়া হয়। দেহপ্রান্তটিকে খানিকটা উপরে তুলে, টুর্নিকেটকে তার নিচে নিয়ে গিয়ে, টেনে লম্বা করে অঙ্গের চতুর্দিকে তাকে পেঁচানো হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্তপাত বন্ধ হচ্ছে। পেঁচগুলি দিতে হয় পরস্পরের

কাছাকাছি, যাতে পেঁচের ফাঁকে চামড়া আটকে গিয়ে তা জখম না হয়। সবচেয়ে শক্ত করে বাঁধতে হয় প্রথম পেঁচ, দ্বিতীয়টা তত টেনে বাঁধতে নেই, আর বাদবাকি পেঁচগুলি সামান্য টেনে রেখে। টুর্নিকেটের শেষাংশ দুটি আটকে রাখা হয় পেঁচগুলির ঠিক ওপরে চেন ও হুকের সাহায্যে (চিত্র — ৪৮)। অঙ্গের কলাগুলির ওপর ঠিক ততখানি চাপ সৃষ্টি করতে হয় যতখানিতে রক্তপাত বন্ধ হয়। টুর্নিকেট ঠিক মতন বাঁধলে ধমনী থেকে রক্তপাত তক্ষুণি বন্ধ হয়ে যায়, দেহপ্রান্তটি ফ্যাকাশে রঙ ধারণ করে, টুর্নিকেটের নিচে রক্তবাহী শিরাগুলিতে নাড়ী বোঝা যায়না।

খুব বেশী শক্ত করে টেনে টুর্নিকেট বাঁধলে তাতে নরম কলা (মাংসপেশী, স্নায়ু, রক্তবাহী শিরাগুলি) থেৎলে যেতে পারে ও দেহপ্রান্তটি অবশ হয়ে যেতে পারে। আল্গা করে বাঁধা টুর্নিকেট রক্তপাত বন্ধ করেনা, উল্টো দিকে শিরার রক্তের রক্তবদ্ধতা সৃষ্টি করে (দেহপ্রান্তটি ফ্যাকাশে হয় না, নীলবর্ণ ধারণ করে) ও শিরার রক্তপাত বাড়ায়। টুর্নিকেট বাঁধার পর দেহপ্রান্তটিকে নিশ্চল বা অনড় করা দরকার।

টুর্নিকেট বাঁধার ভুল প্রথাগুলি: অপ্রয়োজনে টুর্নিকেট বাঁধা অর্থাৎ শিরা ও কৈশিক শিরার রক্তপাতে টুর্নিকেট বাঁধা; উন্মুক্ত চামড়ার ওপর ও ক্ষত থেকে অনেক দূরে বাঁধা; দুর্বল করে বা বেশীরকম চেপে টুর্নিকেট বাঁধা; টুর্নিকেটের শেষাংশগুলি ভালকরে না আটকানো। টুর্নিকেট বাঁধার জায়গায় স্ফীতি থাকলে যেখানে টুর্নিকেট বাঁধা উচিৎ নয়।

দেহের প্রান্তভাগগুলিতে টুর্নিকেট বেঁধে রাখা যায় ৩/২ ঘণ্টা থেকে ২ ঘণ্টার বেশী নয়। অনেকক্ষণ ধরে

রক্তবাহী শিরা চেপে রাখলে তাতে গোটা দেহপ্রান্ত মরে যায়। এরই জন্য টুর্নিকেটের ওপর আবার ব্যান্ডেজ বাঁধা বা রুমাল বাঁধা একেবারে নিষিদ্ধ। টুর্নিকেট সব সময় চোখের সামনে থাকা দরকার। টুর্নিকেট বাঁধার পর মুহূর্ত থেকে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার যাতে দুর্দশাগ্রস্তকে ২ ঘণ্টার ভেতরে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা যায় সারাক্ষণের জন্য রক্ত বন্ধ করতে। যদি কোন কারণে রক্তবন্ধে বিলম্ব দেখা দেয় তাহলে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের জন্য টুর্নিকেট খুলে দিতে হয় (ধমনীর রক্তপাত সেই সময় বন্ধ করে রাখতে হয়, ধমনীর ওপর আঙ্গুলের চাপ দিয়ে) এবং তারপর আবার নতুন করে টুর্নিকেট বাঁধতে হয় আগেকার তুলনায় খানিকটা ওপরে বা নিচে। এক এক সময় এই ভাবে খুলে বাঁধতে হয় কয়েকবার (শীতের সময় তা করতে হয় প্রতি আধ ঘণ্টা পরপর, গরমের সময় এক ঘণ্টা পরপর)। কতক্ষণ ধরে টুর্নিকেট বাঁধা রয়েছে, তা খুলে ফেলা বা আলগা করার সময়সূচী ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য রোগীর টুর্নিকেটের তলায় বা পরিধানের পোষাকে কাগজে লিখে আটকে রাখতে হয়, কোন্ তারিখে, ক'টার সময় (ঘণ্টা ও মিনিট) টুর্নিকেট বাঁধা হয়েছে। কোন্ ধমনীর রক্তপাত বন্ধের জন্য কোথায় টুর্নিকেট বাঁধা দরকার — তা ভাল করে জানা থাকা উচিত সকলের, যারা প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেবে (চিত্র—৪৯)।

বিশেষ করে এই কাজের জন্য তৈরী টুর্নিকেট যদি না থাকে, চতুর্দিক থেকে টেনে চাপ দিয়ে দেহপ্রান্তকে বাঁধা যায় রবারের টিউব, কোমরের বেল্ট, রুমাল, গজের টুকরো, কাপড়ের টুকরো দিয়ে। মনে রাখা দরকার যে, খড়খড়ে শক্ত
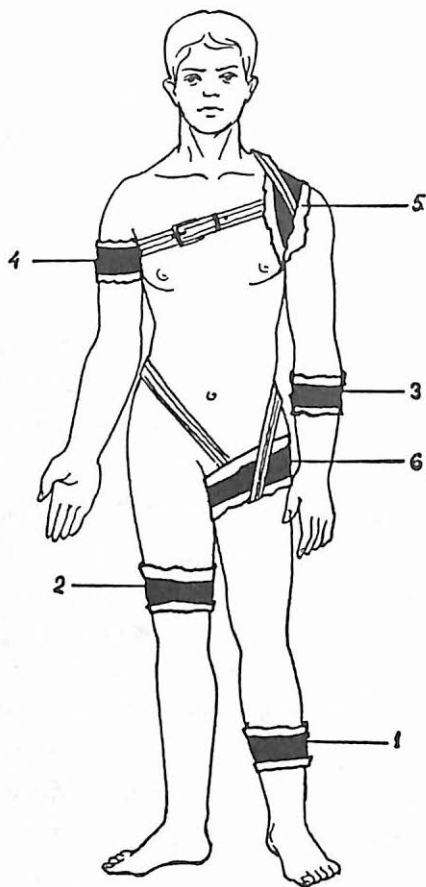
চিত্র — 49: ধমনী থেকে রক্তপাত বন্ধের জন্য টুর্নিকেট বাঁধার প্রচলিত স্থানগুলি

1 — চরণের রক্তপাত; 2 — জঙ্ঘা ও হাঁটুর রক্তপাত; 3 — হস্তের রক্তপাত; 4 — নিম্নবাহুর ও কনুই-এর অস্থিসন্ধির রক্তপাত; 5 — ঊর্দ্ধ বাহুর রক্তপাত; 6 — উরুর রক্তপাত

জিনিষ দিয়ে টুর্নিকেট বন্ধনী বাঁধলে তাতে সহজে স্নায়ু জখম হতে পারে (চিত্র—৫০)।

হাতের কাছে পাওয়া কোন জিনিষের ফাঁস দেহপ্রান্তে পরিয়ে তাতে কাঠি ঢুকিয়ে মোচড় দিয়ে ও চতুর্দিক থেকে অঙ্গের ওপর চাপ সৃষ্টি করা যায়। মোচড় দিয়ে দিয়ে টুর্নিকেটের মত বন্ধনী বাঁধার জিনিষটিকে প্রথমে আল্গা করে দেহপ্রান্তের প্রয়োজনীয় স্থানে ফাঁসের মতন পরিয়ে শক্ত করে গিট দিয়ে আটকাতে হয়। তারপর ফাঁসের ভেতর ঢোকাতে হয় শক্ত কাঠি বা কাঠের টুকরো এবং তাকে মোচড় দিয়ে আঙ্গটির ওপর ফাঁসের চাপ সৃষ্টি করতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্ত পড়া বন্ধ হচ্ছে। তারপর কাঠিটাকে
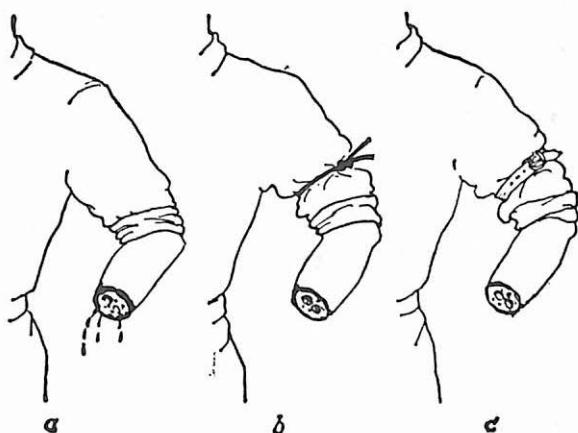
চিত্র — 50: রক্তপাত বন্ধের জন্য তৎক্ষণাৎ-উদ্ভাবিত টুর্নিকেট বাঁধা

a — ধমনীর রক্তপাত; b — রবারের টিউব দিয়ে টুর্নিকেট; c — বেল্ট দিয়ে টুর্নিকেট

চিত্র — 51: ফাঁস পরিয়ে শলাকার সাহায্যে মোচড় দিয়ে ধমনীর রক্তপাত বন্ধ করা

আটকাতে হয় দেহপ্রান্তের সঙ্গে বেঁধে (চিত্র — ৫১)। এই ভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফাঁস বাঁধা যথেষ্ট ব্যথাদায়ক, তাই ফাঁসের তলায়, বিশেষ করে ফাঁসের পিটের তলায় কোন কিছু পেতে নিতে হয়। টুর্নিকেট বাঁধতে যে সব ভুল, বিপদ বা জটিলতা দেখা দেয় তার সমস্তই ফাঁস পরিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চাপ সৃষ্টিতেও দেখা দিতে পারে।

কয়েক প্রকার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ রক্তপাতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

রক্তপাত শুধু যে জখম হওয়ার ফলেই ঘটে তা নয়, নানা অসুখে এবং ক্ষতবিহীন আঘাতের ফলেও তা হতে পারে।

নাক থেকে রক্তপাত। নাক থেকে অনেক সময় বেশী রকম রক্তপাত হতে পারে, যার জন্য দরকার হয় জরুরী সাহায্যের। নাক থেকে রক্তপাতের কারণ বিভিন্ন। স্থানীয় পরিবর্তনের ফলে রক্তপাত (চোট লাগলে, কেটে গেলে, নাকের মাঝের পার্টিশনে ঘা হলে,খুব জোরে নাক ঝাড়লে, করোটির অস্থিভঙ্গ হলে) হয়, আবার নানা অসুখের ফলে রক্তপাত হতে পারে: রক্তের অসুখ, হৃৎপিণ্ডের ভাল্বের

অসুখ, সংক্রামক ব্যাধি (স্কার্লাটিনা, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি), ব্লাড-প্রেসারের রোগ। নাক থেকে রক্তপাতে রক্ত শুধু যে নাকের ফুটো দিয়ে বাইরে বেরোয় তা নয়, তা গলার ভেতর ও মুখের ভেতরও চলে আসে। এতে কাশি হয় এবং বমি হওয়াও বিরল নয়। রোগী এতে বেশী রকম চঞ্চল হয়ে ওঠে যার জন্য আরও বেশী রক্তপাত হয়।

সাহায্যকারীর দরকার সর্বাগ্রে, রক্তপাত জোরদার করতে পারে — এই রকম সমস্ত কারণগুলি দূর করা। রোগীকে শান্ত করা ও বোঝানো দরকার যে, জোরে নড়াচড়া করা, কাশি, কথাবার্তা, নাক ঝাড়া, কোঁথ দেওয়া — এই সমস্ততেই রক্তপাত জোরদার হয়। রোগীকে উঠিয়ে বসিয়ে দিতে হয় ও এমন অবস্থানভঙ্গিতে রাখতে হয়, যাতে নাকের রক্তের ফ্যারিংক্সে গড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা কম, নাকের ওপর ও নাকের পিঠের ওপর রাখা দরকার বরফের ব্যাগ, রুমালে মোড়া বরফের টুকরো, ঠান্ডা জলে ভেজানো রুমাল, ব্যান্ডেজ, তুলোর দলা ও অন্যান্য। এই সব স্থানীয় ব্যবস্থা ছাড়াও দেখা দরকার সেখানে যেন মুক্ত হাওয়া আসে। যদি রক্তপাত হয় বেশীরকম গরমের ফলে, তাহলে রোগীকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয় ছায়াতে, ঠান্ডা জলে ভেজানো গামছা বা কম্প্রেস রাখতে হয় মাথায় ও বুকে।

যদি রক্তপাত কিছুতেই বন্ধ না হয় তাহলে চেষ্টা করা যেতে পারে নাকের দুই অর্দ্ধকে নাকের ভেতরকার পার্টিশনের ওপর চেপে ধরে রক্ত বন্ধ করতে। এতে রোগীর মাথাকে কিছুটা সামনের দিকে ঝুকিয়ে ও যতদূর সম্ভব ঊর্দ্ধে রেখে জোর করে নাক চেপে ধরতে হয়। রোগী এ সময় শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় মুখ দিয়ে। নাক টিপে ধরে রাখা

দরকার ৩ থেকে ৫ মিনিট বা আরও বেশীক্ষণ ধরে। যে রক্ত মুখে এসে পড়েছে রোগী তা থুতুর সঙ্গে বাইরে ফেলবে।

রক্তবন্ধের জন্য নাক টিপে রাখার পরিবর্তে নাকের ফুটোর ভেতর শুকনো তুলো বা হাইড্রোজেন পেরক্সাইডে ভেজানো তুলোর পাকানো দলা ভরে নাক প্যাক করা যায়। এর জন্য নাকের দুই ফুটোর ভেতরই ঢোকানো হয় তুলোর পাকানো দলা, রোগীর মাথা খানিকটা ঝোকানো হয় সামনের দিকে। এতে তুলোর ওপর রোগীর রক্ত বেশ তাড়াতাড়ি জমে যায় ও রক্তপাত বন্ধ হয়। সাধারণত এই সব ব্যবস্থা অবলম্বনে রক্তপাত বন্ধ করা যায়, বিপরীত ক্ষেত্রে প্রয়োজন রোগীকে অনতিবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা।

দাঁত তোলার পর রক্তপাত। দাঁত তোলার পর বেশী রকম রক্তপাত দেখা দিতে পারে। তা বন্ধ করা হয় মাঢ়ীর ক্ষত তুলোর গুলি দিয়ে ভর্তি করে, তাকে সেস্থানে অন্য দাঁতগুলি দিয়ে চেপে ধরে রেখে।

শ্রবণপথ ও কানের ভেতরকার অংশগুলির জখম জনিত রক্তপাত। সাধারণত এ জখম হয় (বাড়ি লেগে, খোঁচা লেগে, করোটির অস্থিভঙ্গে)। তা বন্ধ করা হয় বাইরের শ্রবণপথে পলতের আকারে পাট করা গজের ঠুলি ঢুকিয়ে, যাকে স্বস্থানে ধরে রাখা হয় গজ চাপা দিয়ে কান ব্যাণ্ডেজ করে।

ফুসফুস থেকে রক্তপাত। এ রক্তপাত হয় ফুসফুস জখম হয়ে (বুকের ওপর ভীষণ জোরে বাড়ি লেগে, পাঁজরের অস্থিভঙ্গে), ফুসফুসের নানা অসুখে (যক্ষ্মা, ক্যান্সার, ফুসফুসের এ্যাবসেস্, হৃৎপিণ্ডের মাইট্রাল স্টেনোসিস ও

অন্যান্য অসুখে)। এতে রোগীর থুতুর সঙ্গে ও কাশির সঙ্গে বের হয় টকটকে লাল ফেনাটে রক্ত — যাকে বলে হিম্‌পটিসিস। এক এক সময় ফুসফুস থেকে খুবই বেশী রকম রক্তপাত হয়।

থুতুর সঙ্গে রক্ত বেরোলে দরকার, রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করে — এমন পোষাক খুলে দেওয়া ও অবিলম্বে রোগীকে আধা-বসা অবস্থায় শুইয়ে রাখা। যতদূর সম্ভব দরকার, রোগীকে শান্ত করা ও বোঝানো দরকার যে, তার চিকিৎসার জন্য অবশ্য প্রয়োজন কোন রকম নড়াচড়া না করা। যে কামরায় রোগীকে রাখা হয়েছে সে কামরায় মুক্ত হাওয়া আসা দরকার, আরও ভাল যদি সে হাওয়া ঠান্ডা হাওয়া হয়। রোগীকে চলাফেরা করতে, কথাবার্তা বলতে নিষেধ করা হয়, বলা হয় গভীর ভাবে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে ও কাশি আটকে রাখতে। বুকের ওপর বরফের ব্যাগ রাখা ভাল। ওষুধের মধ্যে দেওয়া হয় কাশি কমানোর ওষুধ।

ফুসফুস থেকে সমস্ত রকমের রক্তপাত, শক্ত অসুখের বিপদজনক উপসর্গ। তাই প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য-দাতার প্রথম কাজ, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা।

ফুসফুস থেকে রক্তপাতের রুগীরা পরিবহণকালে খুবই কাতর হয়ে পড়ে। তাই অনুরূপ রোগীদের পরিবহণ করতে হয় বিশেষ এম্বুলেন্সে করে আধা-বসা অবস্থায় এবং তাতে বিশেষ সাবধাণতা অবলম্বন করতে হয় যাতে ঝাঁকি না লাগে কেননা তাতে কাশি হয়ে রক্তপাত জোরদার হতে পারে।

বক্ষগহ্বরে রক্তপাত। বুকে সজোরে বাড়ি লাগলে, পাঁজরের অস্থিভঙ্গ হয়ে ও ফুসফুসের কতগুলি অসুখে রক্তবাহী শিরা জখম হয়ে এক বা উভয় প্লুরা গহ্বর রক্তে ভরে উঠতে পারে। জমা-হওয়া রক্ত ফুসফুসের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, যাতে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হয়। রক্তপাতের ফলে ও ফুসফুসের শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার কাজ ব্যাহত হওয়ার ফলে রোগীর অবস্থার খুব তাড়াতাড়ি অবনতি হয়: ভীষণ ভাবে বেড়ে যায় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি ও শ্বাসের কষ্ট হয়, চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে হয় ও নীলাভ রঙ ধারণ করে।

রোগীকে এক্ষেত্রে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করতে হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের কাজ রোগীকে আধা-বসা অবস্থায় রাখা। বুকের ওপর দিতে হয় বরফের ব্যাগ।

পাকস্থলী ও অন্ত্রের রক্তপাত। পাকস্থলী ও অন্ত্রের গহ্বরে রক্তপাত হয় অনেক অসুখের জটিলতায় (পাকস্থলীর ঘা, পাকস্থলীর ক্যান্সার, খাদ্যনালীর স্ফীত ভেরিকোজ ভেন ও অন্যান্য), আঘাতের ফলে (যেমন বাইরের শক্ত জিনিষের ঘষায়, পড়ে গেলে ও অন্যান্য)। সে রক্তপাত হতে পারে খুবই বেশী রকম রক্তপাত, এবং তাতে মৃত্যু হতে পারে। পাকস্থলী থেকে রক্তপাতের লক্ষণগুলির মধ্যে বেশীরকমের রক্তক্ষয়ের সাধারণ উপসর্গগুলি (ফ্যাকাশে গায়ের রঙ, দুর্বলতা, বেশী রকম ঘাম হওয়া) ছাড়াও দেখা যায় রক্তবমন অথবা কাল কফি রঙের বমি, ঘন ঘন পাতলা কালো রঙের পায়খানা (আলকাতরার মত দেখতে)।

রোগীর অবস্থা লাঘব করার জন্য ও রক্তপাত কমানোর জন্য রোগীকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হয় ও তাকে সটান চিৎ করে শুইয়ে পেটের ওপর রাখতে হয় বরফের ব্যাগ। মুখ দিয়ে খাদ্য বা পানীয় দেওয়া একেবারে নিষেধ করে দিতে হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে এ সব কেসে মূল কর্তব্য হল রোগীকে অবিলম্বে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা। পাকস্থলী ও অন্ত্রের রক্তপাত কেসে রোগীদের পরিবহণ করতে হয় শোয়া-অবস্থায় স্ট্রেচারের পায়ের দিকটা খানিকটা উঁচুতে রেখে — এতে মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা হওয়া নিবারণ করা যায়।

পেরিটোনিয়াম গহবরে রক্তপাত সৃষ্টি হয় পেটের ক্ষত-বিহীন আঘাতে, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যকৃৎ, প্লীহা ফেটে গিয়ে। পেরিটোনিয়াম গহবরে রক্তপাতের কারণ হতে পারে যকৃৎ ও প্লীহার কতগুলি অসুখ; আর মেয়েদের অনুরূপ রক্তপাত হতে পারে ইউটেরাইন টিউব বা জরায়ুনালী ফেটে গিয়ে জরায়ু বহির্ভূত গর্ভধারণে।

পেরিটোনিয়াম গহবরে রক্তপাতে দেখা দেয় ভীষণ পেটব্যথা। চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, নাড়ী দ্রুততর হয়, বেশী রকম রক্তপাত হলে রোগী এমনকি সংজ্ঞা হারাতে পারে। রোগীকে শুইয়ে দিয়ে পেটের ওপর বরফের ব্যাগ দিতে হয়; খেতে দেওয়া ও জল পান করতে দেওয়া — এ সব কেসে নিষেধ। এই সব রোগীদের অবিলম্বে চিৎ করে শোয়ানো অবস্থায় হাসপাতালে পরিবহণ করতে হয়।

ভীষণ রক্তশূন্যতা সৃষ্টি হয় বেশীরকম রক্তক্ষয়ে। সমস্ত

রোগীর রক্তক্ষয় সহ্যশক্তি এক নয়। রক্তক্ষয়ে সবচেয়ে বেশী কাতর হয় শিশুরা ও বেশী বয়স্ক লোকেরা। অনেক দিন ধরে রোগে ভুগছে — এমন রোগীরা, অনাহারী, পরিশ্রান্ত ও ভয়ে কাতর লোকেরা রক্তক্ষয় একেবারে সহ্য করতে পারে না।

প্রাপ্তবয়স্কেরা, ৩০০-৪০০ সি. সি. রক্তক্ষয়ে প্রায় কিছুই অনুভব করেনা, কিন্তু শিশুদের পক্ষে এ পরিমাণ রক্তক্ষয় মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট। এক সঙ্গে ২ থেকে ২·৫ লিটার রক্তক্ষয় হলে তাতে মৃত্যু অনিবার্য্য।

১ থেকে ১·৫ লিটার রক্তক্ষয় খুবই বিপদজনক এবং তাতে প্রকাশ পায় ভীষণ রক্তশূন্যতার বিপদজনক চিত্র, যাতে দেখা দেয় রক্তচলাচলের ভীষণ ব্যাঘাত ও অম্লজানের স্বল্পতা। অনুরূপ অবস্থা তুলনামূলক কম রক্তক্ষয়েও দেখা দিতে পারে যদি সে রক্তক্ষয় হয় দ্রুত বেগে। রোগীর অবস্থার উগ্রতা বিচার করতে এ তথ্যই যথেষ্ট নয়, কী পরিমাণ রক্তক্ষয় হয়েছে — তা ও রক্তচাপের মানও এ কাজে মূল্যবান ধর্তব্যের বিষয়।

ভীষণ রক্তশূন্যতার উপসর্গগুলি খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং তা এর ওপর নির্ভর করেনা যে, রোগীর রক্তপাত হয়েছে বাইরে না কি দেহের অভ্যন্তরে। এতে রোগী অনুভব করে দ্রুতবর্দ্ধমান দুর্বলতা, মাথাঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা, চোখে অন্ধকার দেখা, তৃষ্ণা দেখা দেওয়া, গা ঘুলানী ও বমি। রোগীর চামড়ার রঙ ও বাইরে থেকে দেখা যাওয়া শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চোখ-মুখ বসে যায়। রোগীর ভেতর দেখা যায় ভীষণ অবসন্নতা অথবা এক এক সময়ে ঠিক তার উল্টো —

উত্তেজিত ভাব। শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়, নাড়ী দুর্বল হয়ে যায় অথবা একেবারে ধরা যায় না, রক্তের চাপ নিচে নেমে যায়। এরপর রক্ত ক্ষয়ের জন্য রোগী অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে, যার কারণ মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা, অন্তর্হিত হয় নাড়ী, রক্তের চাপ মাপা যায় না, দেখা দেয় মাংসপেশীর খিঁচুনি ও অসাড়ে পায়খানা-প্রস্রাব হওয়া। যদি যথাযথ জরুরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা না যায়, তা হলে রোগীর মৃত্যু হয়।

বেশী রকম রক্তক্ষয় হলে ও রক্তের চাপ খুব কমে গেলে রক্তপাত এমনিতেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে ক্ষতের ওপর চাপ সৃষ্টি করা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে তারপর আরম্ভ করতে হয় সক্ বিরোধী চিকিৎসা। দুর্দশাগ্রস্তকে সমতল জায়গায় শুইয়ে দিতে হয়, যাতে মস্তিষ্কের রক্তাল্পতা নিবারণ করা যায়। বেশী রকম রক্তক্ষয়ের জন্য জ্ঞান হারালে ও সক্ হলে রোগকে বা আহতকে শোয়াতে হয় এমন অবস্থানভঙ্গিতে যাতে মাথা থাকে দেহের ধড়ের তুলনায় নিচে। পৃথক পৃথক কেসে রক্তের “স্বয়ংপরিসঞ্চালন” ভাল কাজ করে। এর জন্য শোয়ানো আহত রোগীর সমস্ত দেহ-প্রান্তগুলিকে ওপরের দিকে তুলে ধরে রাখতে হয় এবং তারই সাহায্যে লাভ করা সম্ভব হয় ফুসফুস, মস্তিষ্ক, বৃক্ক ও অন্যান্য জীবণ ধারণের জন্য মূল্যবান দেহাঙ্গগুলির ভেতর দিয়ে সাময়িক বর্দ্ধিত পরিমাণ রক্তপ্রবাহ (চিত্র—৫২)। রোগীর জ্ঞান সংরক্ষিত থাকলে ও পেটের কোন দেহাঙ্গ জখম না হলে রোগীকে গরম চা, মিনারাল ওয়াটার বা তা না থাকলে সাধারণ জল পান করতে দেওয়া চলে। রোগীর যদি অন্তিম অবস্থা দেখা দেয় ও হৃৎপিণ্ডের কাজ
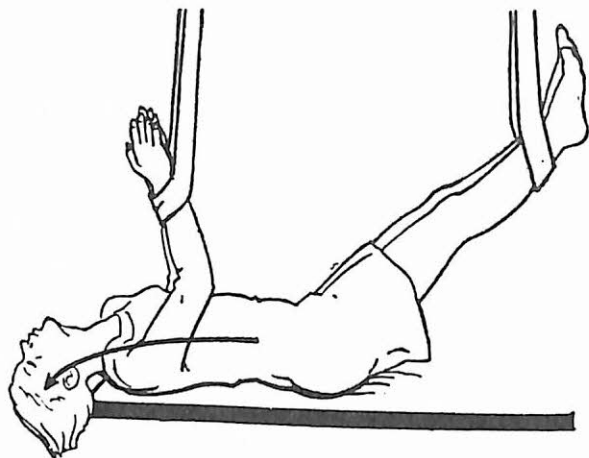
চিত্র — 52: প্রকট রক্তাল্পতায় রোগীর প্রয়োজনীয় অবস্থানভঙ্গি (স্বয়ংরক্তপরিসঞ্চালন)

বন্ধ হয়ে যায়, তবে গ্রহণ করা হয় পুনরুজ্জীবিতকরণের সমস্ত ব্যবস্থা। ভীষণ রক্তাল্পতার মূল চিকিৎসা হল রোগীর দেহে তাড়াতাড়ি ডোনারের রক্ত পরিসঞ্চালন করা। তাই প্রয়োজন, দুর্দশাগ্রস্তকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা। যদি পরিবহণ করা হয় বিশেষ জরুরী সাহায্যের এম্বুল্যেন্সে করে, তাহলে সে এম্বুল্যেন্সের ভেতরেই রোগীকে রক্তপরিসঞ্চালন করা যায়, কেননা এম্বুল্যেন্সে থাকে সঞ্চিত ডোনারের রক্ত।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ক্ষতযুক্ত জখমের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

কোন কিছুর আঘাতে বা অন্য কোন কারণে দেহের চামড়ার আবরণ, শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, গভীরে অবস্থিত কলা ও অভ্যন্তরীণ কোন দেহাঙ্গের উপরিভাগের সমগ্রতা কোথাও নষ্ট হলে তাকে বলে উন্মুক্ত ক্ষতযুক্ত জখম। অস্ত্রবিদ্ধ হওয়ার ফলে গভীরে প্রবিষ্ট অস্ত্র, দেহের কলার মাঝখানে যে গর্ত সৃষ্টি করে তাকে বলা হয় ক্ষতের পয়োনালী।

তফাৎ করা হয় অগভীর ক্ষতের ভেতর। অগভীর ক্ষতের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাতে জখম হয় কেবলমাত্র চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী। গভীর ক্ষতে জখম হতে পারে রক্তবাহী শিরা, স্নায়ু, অস্থি, কন্ডরা ও অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গ। গভীর ক্ষত, যাতে ছেদিত হয় কোন গহ্বরের (পেরিটোনিয়াম, বক্ষ, করোটি বা অস্থিসন্ধি গহ্বর) ভেতরের আবরণী, তাকে বলা হয় ভেদ-করা বা বিদ্ধ হওয়া ক্ষত। অন্যান্য সমস্ত ক্ষত, তার গভীরতা যতই হোক না কেন, তাকে বলা হয় অবিদ্ধ ক্ষত।

কেবল মাত্র অপারেশনের সময় নির্বীজিত করা যন্ত্রপাতির সাহায্যে সৃষ্ট ক্ষত ছাড়া, সমস্ত ক্ষতকে ইনফেকশন হওয়া

ক্ষত বলে বিচার করা উচিত। ক্ষত, যার ওপর কোন ভৌত বা জৈবিক জিনিষ (যেমন বিষ, বিষযুক্ত কোন পদার্থ, রশ্মিক্রিয়া প্রভৃতি ফ্যাক্টর) কাজ করেছে, সে ক্ষতকে বলা হয় জটিলতাযুক্ত ক্ষত।

কোন্ প্রকার অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তার ভিত্তিতে ক্ষতকে ভগ করা যায় খোঁচা-লাগা ক্ষত, কাটা ক্ষত, কোপ্-লাগা ক্ষত, গুঁতো লাগা ক্ষত, ছিঁড়ে-যাওয়া ক্ষত, আগ্নেয়াস্ত্রের গুলি লাগা ক্ষত, দংশনের ক্ষত। আঘাত-হানা অস্ত্র যত বেশী ধারাল ও যত বেগে তার আঘাত হানা হয়, ক্ষতের ধারগুলি হয় তত মসৃণ ভাবে কর্তিত। ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে আঘাত হানা ক্ষতের ধারগুলি হয় খুব অমসৃণ এবং তার সঙ্গে দেখা দেয় বেশ যন্ত্রণা, যা অনেক ক্ষেত্রে সৃষ্টি করে সক্।

ক্ষতের রূপ। খোঁচা লাগা বা ছিদ্র-হওয়া ক্ষত সৃষ্টি হয় খোঁচা লাগানো অস্ত্রের সাহায্যে — ছুরি, সঙ্গীন, তুরপুন, সুঁচ। এইরূপ ক্ষতের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাতে ক্ষতের বাইরের ফুটো তেমন বড় নয় কিন্তু বেশ গভীর। এতে ক্ষতের পয়োনালী সাধারণত সরু হয়। আঘাতের পর খণ্ডিত কলাগুলি সরে যাওয়ার ফলে (মাংসপেশীর সংকোচন, চামড়া সরে যাওয়া) পয়োনালী জায়গায় জায়গায় আটকানো ও আঁকাবাঁকা রূপ ধারণ করে। এই কারণেই ছিদ্র-হওয়া ক্ষত বিশেষ বিপদজনক, কেননা বোঝা কঠিন — ক্ষতের গভীরতা কতখানি এবং কোন অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গ তাতে জখম হয়েছে কি না। অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গের অলক্ষিত জখম হওয়ার দরুণ নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে — অভ্যন্তরীণ রক্তপাত, পেরিটোনাইটিস

(পেরিটোনিয়ামের স্ফীতি) ও নিউমোথোরাক্স (প্লুরা গহ্বরে হাওয়া ঢোকা)। কেটে-যাওয়া ক্ষত সৃষ্টি হয় ধারালো অস্ত্রের আঘাতে (ছুরি, ব্লেড, কাঁচ, স্ক্যালপেল)। এইরূপ ক্ষতে ধারগুলি হয় সমান, তাতে কোন এবড়ো-খেবড়ো ভাব থাকে না এবং ক্ষতের গভীরতা হয় যথেষ্ট বড়।

কোপ্ লাগা ক্ষত সৃষ্টি হয় ধারাল অথচ ভারী (কুড়াল, তরোয়াল প্রভৃতি) অস্ত্রের সাহায্যে। বাইরে থেকে ক্ষত দেখতে কাটা ক্ষতেরই মতন, তবে সে ক্ষত সর্বদা যথেষ্ট চওড়া এবং প্রায়ই তাতে একই সঙ্গে অস্থিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর ক্ষতের কর্তিত ধারগুলিতে খানিকটা থেৎলানো ভাব থাকে। গুঁতোর মত চোট লাগা ক্ষত সৃষ্টি হয় কলার ওপর হাতুড়ি, পাথর প্রভৃতি ভোঁতা জিনিষ বা অস্ত্রের আঘাতে। গুতো-লাগা ক্ষতের ধারগুলি থেৎলানো, এবড়োখেবড়ো ও রক্তজমা কালশিটেযুক্ত। রক্তবাহী শিরা জখম হওয়ার ফলে ও সেগুলির ভেতর রক্ত জমে যাওয়ার ফলে তাড়াতাড়ি ক্ষতের ধারগুলির পুষ্টি ব্যাহত হয় ও তাতে পচন দেখা দেয়। থেৎলে যাওয়া কলা, জীবাণুর বংশবৃদ্ধির খুবই উপযুক্ত মাধ্যম। তাই গুঁতোর মত চোটলাগা ক্ষত সহজে জীবাণুদুষ্ট হয়ে পেকে ওঠে।

আগ্নেয়াস্ত্রের গুলির ক্ষত সৃষ্টি হয় আগ্নেয়াস্ত্রের গুলিতে দেহ জখম হওয়ার ফলে। গুলির চরিত্র অনুযায়ী আগ্নেয়াস্ত্রের গুলির জখমের ক্ষতকে ভাগ করা যায় বুলেটের ক্ষত, ছর্‌রার ক্ষত ও স্প্লিণ্টারের ক্ষতে।

আগ্নেয়াস্ত্রের জখম হতে পারে এফোঁড়-ওফোঁড় জখম, যাতে আঘাত-হানা গুলি দেহ ফুড়ে বেরিয়ে যায় ও দেহে

দেখা যায় তার প্রবেশ করার ও বেরিয়ে যাওয়ার ফুটো; বদ্ধ জখম, যাতে আঘাত-হানা গুলি দেহের ভেতর আটকে থাকে; স্পর্শ করা জখম, যাতে আঘাত-হানা বস্তু দেহের কোন জায়গার শুধু উপরিভাগ জখম করে চলে যায় বা কোন দেহাঙ্গকে শুধু মাত্র স্পর্শ করে চলে যায়। এফোঁড়-ওফোঁড় জখমে, প্রবেশের ফুটো সর্বদাই বেরিয়ে যাওয়ার ফুটো থেকে আকারে ছোট। আগ্নেয়াস্ত্রের বদ্ধ জখমে আঘাত হানার বস্তু আটকে থাকে দেহের ক্ষতের নালীতে ও পরিণত হয় দেহের ভেতরকার এক বহিরাগত বস্তুতে (ফরেন বডি)। ক্ষতের পয়োনালীতে গুলির সঙ্গে ঢুকে পড়তে পারে জামার অংশ। ক্ষতের পয়োনালীতে বহিরাগত বস্তু থাকলে তাতে ক্ষত স্থান পেকে ওঠে।

স্প্লিণ্টারের জখম, প্রায়ই একাধিক জখম এবং তাতে সর্বদাই বিস্তারিত জায়গা জুড়ে কলা জখম হয়, কেননা স্প্লিণ্টারের ধারগুলি মোলায়েম হয়না ও সেগুলি এক এক সময় যথেষ্ট বড় আকারের। স্প্লিণ্টারের ধারগুলি এবড়োখেবড়ো হওয়ার দরুণ স্প্লিণ্টার নিজের সঙ্গে ক্ষতের মধ্যে টেনে নিয়ে যায় বিভিন্ন রকমের অন্যান্য জিনিষ (পোষাকের টুকরো, মাটি, চামড়ার টুকরো) এবং তাতে ক্ষতের ইনফেকশন হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। ক্ষতের পয়োনালীতে বেশী রকম রক্ত জমা হয়ে ওঠা, তাড়াতাড়ি ইনফেকশন হওয়া ও ক্ষত পেকে ওঠায় সাহায্য করে।

আগ্নেয়াস্ত্রের জখম প্রায়ই হয় একাধিক ও মিশ্র জখম। মিশ্রজখম বলে সেই জখমকে যাতে গুলি বা স্প্লিণ্টার দেহের কতগুলি দেহাঙ্গ ও দেহগহ্বর ভেদ করে (যেমন পেরিটোনিয়াম গহ্বরের ভেতর দিয়ে ডায়াফ্রাম ভেদ করে

প্লুরা গহ্বরে) ও একই সঙ্গে কতগুলি দেহাঙ্গের ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত করে।

সমস্ত ক্ষতেরই চরিত্র — ব্যথা করা, তার ধারগুলি উন্মুক্ত ও তা থেকে রক্তপড়া। ব্যথা বিশেষ করে বেশী অনুভূত হয় আঘাত লাগার সময় এবং তার পরিমাণ নির্ভর করে সেই জায়গার অনুভূতিশীলতার ওপর, যেখানে আঘাত করে ক্ষত সৃষ্টি করা হয়েছে। সবচেয়ে অনুভূতিশীল জায়গাগুলি হল দাঁত, জিহ্বা, যৌন দেহাঙ্গগুলি, গুহ্যদ্বার অঞ্চল। ক্ষত শুকিয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় ব্যথার পরিমাণ উত্তেরোত্তর কমতে থাকে। ভীষণ ভাবে বেদনা বৃদ্ধি ও ব্যথার চরিত্রের পরিবর্তন বোঝায় যে, ক্ষতে জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে (ক্ষত পেকে ওঠা, ক্ষতে এনিরোবিক ইনফেকশন হওয়া)।

ক্ষতের ধারগুলির উন্মুক্ততা — ধারগুলি কতখানি উন্মুক্ত থাকবে — নির্ভর করে নরম কলার স্থিতিস্থাপকতা ও তার সংকোচন ক্ষমতার ওপর। যত বড় ও যত গভীর ক্ষত ততই তার ধারগুলি উন্মুক্ত।

ক্ষত থেকে রক্তপাতের পরিমাণ নির্ভর করে ক্ষতের রূপ, কোন্ প্রকারের রক্তবাহী শিরা (ধমনী, শিরা, কৈশিক শিরা) জখম হয়েছে, রক্তের চাপ কত ও ক্ষতের চরিত্র কী, তার ওপর। কেটে যাওয়া ক্ষত ও কোপ-লাগা ক্ষত থেকে রক্তপাত হয় সবচেয়ে বেশী। থেৎলানো কলায় রক্তবাহী শিরার ওপর চাপ সৃষ্টি হয় ও শিরার ভেতর রক্ত জমে যায়, তাই গুঁতোর মত বাড়ি লাগা ক্ষতে, ক্ষত থেকে রক্তপাত হয় কম। এর ব্যতিক্রম মুখমণ্ডল ও করোটির ওপর গুঁতো লাগা চোট। করোটির নরম কলাতে রক্তবাহী

শিরার সংখ্যা অনেক বেশী এবং জখম হলে সেগুলি কখনো চুপ্সে যায় না ফলে মাথায়, করোটিতে যে কোন রকম চোট লাগলে তাতে খুবই বেশী রকম রক্তপাত হয়। করোটির ক্ষতের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কারণ হল এই যে, এতে ক্ষত হওয়ার পর চামড়া ও চামড়া-নিম্ন নরম কলা দুধারে সরে যায়, যার জন্য ক্ষতের ধারগুলি বেশী উন্মুক্ত হয়, ক্ষতের ধারগুলি প্রায়ই নিম্নস্থ অস্থি থেকে আল্গা হয়ে ফ্লাপের আকার ধারণ করে (যাকে বলে স্ক্যাল্প্ড উন্ড)।

জখমের উগ্রতা (হাল্কা, মাঝারি রকমের বিপদজনক, বিপদজনক) বিচার করা হয় ক্ষতের বাইরের পরিমাপ, তার গভীরতা, তাতে অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গ জখম হয়েছে কি না ও সেই জখমের চরিত্র কী এবং কোন জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে কি না (রক্তপাত, জখম হওয়া, দেহাঙ্গের ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হওয়া, পেরিয়োনাইটিস, নিউমোথোরাক্স) — এই সমস্ত কারণ অনুসারে।

যে কোন জখমের ক্ষতে কতগুলি বিপদের সম্ভাবনা দেখা দেয় যেগুলি আহতের জীবন বিপন্ন করতে পারে। জখমের ক্ষত ও যে কোন আঘাত দেহের কতগুলি সর্বাঙ্গীণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে — সংজ্ঞা হারানো, সক্ হওয়া, অন্তিম অবস্থা সৃষ্টি হওয়া। এই সব শুধু যে ব্যথার যন্ত্রণায় সৃষ্টি হয় তা নয়। এ ছাড়াও, এমনকি আরও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, এর কারণ হল ক্ষত থেকে রক্তপাত ও বেশীরকম রক্তক্ষয়। কাজেই জখমের ক্ষতে সবচেয়ে বড় বিপদ হল ক্ষত থেকে রক্তপাত। আরও কিছু কাল পরে সংক্রামিত হওয়া, যে সংক্রমণ ক্ষতের ভেতর

পতিত হয়ে গোটা দেহে ছড়িয়ে পড়তে পারে, সে বিপদও কম বিপদ নয়।

ক্ষতের জীবাণুদুষ্টতা বা সংক্রমণ

ক্ষত সৃষ্টিকারী আঘাতহানার অস্ত্রে ও চামড়ার উপরিভাগে থাকে কোটি কোটি বিভিন্ন জীবাণু, যেগুলি ক্ষতে পতিত হয় ও তাকে জীবাণুদুষ্ট করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষতের সংক্রমণ হয় পুঁজ সৃষ্টিকারী জীবাণুর সাহায্যে, যা সেখানে সৃষ্টি করে পুঁজযুক্ত স্ফীতির প্রক্রিয়া এবং যার ফলে ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয় ক্ষত শুকানোর প্রক্রিয়া ও দেখা দেয় পুঁজসৃষ্টিকারী সংক্রমণ ও সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ার বিপদ।

ক্ষত সৃষ্টিকালে ক্ষতের মধ্যে ক্ষত সৃষ্টিকারী অস্ত্র থেকে যে সব জীবাণু পতিত হয় এবং সেই সব জীবাণুর বংশবৃদ্ধির ফলে ক্ষতে যে সংক্রমণ দেখা দেয় তাকে বলা হয় প্রাথমিক বা প্রাইমারী সংক্রমণ। কিছুকাল পরে ক্ষত জীবাণু দ্বারা পুনর্বার সংক্রমিত হলে তাকে বলা হয় আনুষঙ্গিক বা সেকেন্ডারী সংক্রমণ।

আনুষঙ্গিক সংক্রমণ ঘটা সম্ভব ময়লা হাত থেকে, ক্ষতের ড্রেসিং-এর সময়, ড্রেসিং-এর সামগ্রী থেকে নির্বীজিত না-করা ড্রেসিং-এর সামগ্রী ব্যবহার করলে, ক্ষত ঠিক মত পরিষ্কার না করলে, ক্ষত ঠিক মত ঢেকে ব্যান্ডেজ না করলে। পরবর্তী সংক্রমণের জীবাণু রক্তপ্রবাহের সাথেও চলে আসতে পারে ক্ষতে, দেহের অন্য কোন পুঁজ হওয়া জায়গা থেকে (ক্রনিক টন্সিলাইটিস, নরম কলার এ্যাবসেস,

ফারাঙ্কুলাইটিস সাইনুসাইটিস ও আরও অন্যান্য পুঁজ-হওয়া জায়গা থেকে)।

প্রসস্ত ও গভীর ক্ষতের পুঁজ যুক্ত স্ফীতির প্রক্রিয়া এমন দ্রুত অগ্রসর হতে পারে যে, দেহের প্রতিরোধ শক্তি, তার মধ্যে পুঁজময় ফোঁড়ার চারদিকে আত্মরক্ষার বেড় সৃষ্টি করতে সময় পায় না। অনুরূপ ক্ষেত্রে জীবাণু রক্তপ্রবাহে প্রবেশ করে দেহের সমস্ত অঙ্গে ও কলায় নীত হতে পারে। তাতে সৃষ্টি হয় সারা দেহের সংক্রমণ বা সেপ্‌সিস। এই জটিলতা খুবই বিপদজনক জটিলতা। এতে চিকিৎসা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত রোগী প্রায়ই মারা যায়।

সেপ্‌সিস। সেপ্‌সিস হল রোগগ্রস্ত অবস্থা, যা সৃষ্টি হয় রক্তপ্রবাহে, স্ট্যাফাইলোকক্কাস, স্ট্রেপ্টোকক্কাস ও অন্যান্য জীবাণু ও তার দেহ নিঃসৃত বিষ ঢুকে পড়ার ফলে। সেপসিসের ক্লিনিকাল লক্ষণগুলি অতিমাত্রায় বিভিন্ন ধরনের। এ অসুখের সচরাচর লক্ষণগুলি হল ভীষণ জ্বর (দেহের তাপমাত্রা ওঠে ৪০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত বা তারও ওপরে), যার সঙ্গে দেখা দেয় ভীষণ কাঁপুনি ও দরদর করে ঘাম পড়া, সাধারণ অবস্থার দ্রুত অবনতি — বিকার, দুঃস্বপ্ন, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া। এর বৈশিষ্ট্য — ভীষণ শ্বাসকষ্ট, নাড়ীর দ্রুতি, রক্তের চাপ নিচে নেমে যাওয়া। আরও পরবর্তী কালে রোগী তাড়াতাড়ি রোগা হয়ে অস্থি-চর্মসার হয়ে ওঠে, দেখা দেয় চামড়ার রঙের হলদে ভাব ও রোগীর চোখমুখ বসে যায়। জখম-হওয়া ক্ষতের অনুরূপ জটিলতা খুবই বিপদজনক, কেননা অনেক ক্ষেত্রে এতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয়। সময়মত ও ঠিক মত

চিকিৎসা এই মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।

পুঁজ সৃষ্টিকারী জীবাণু ছাড়াও ক্ষতে এর চেয়ে অনেক বেশী মারাত্মক জীবাণু পতিত হতে পারে, যেমন টিটেনাস ও গ্যাস গ্যাংগ্রীনের জীবাণু।

টিটেনাস — এই জীবাণু উত্থিত ব্যাধি বেশী হতে দেখা যায় যদি ক্ষত দূষিত হয় মাটি, ধূলা, বিষ্ঠার সংস্পর্শে, কৃষিক্ষেত্র ও যান-বাহনের দুর্ঘটনায় এবং আগ্নেয়াস্ত্রের জখমে।

টিটেনাসের গোড়ার দিকের লক্ষণগুলি হল জখম হওয়ার পর ৪র্থ থেকে ১০ম দিনের মধ্যে ভীষণ জ্বর হওয়া, শরীরের তাপমাত্রা ওঠে ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত, ক্ষতস্থানের আশপাশে আপনা থেকে মাংসপেশীর স্প্যাজ্‌ম বা খিঁচুনি হওয়া, পেটের মাংসপেশী ও পাকস্থলী অঞ্চলে ব্যথা, গিলতে কষ্ট হওয়া, মুখ-মণ্ডলের ভাব প্রকাশের মাংসপেশীগুলির সংকোচন ও চর্বনের মাংসপেশীগুলির শক্ত হয়ে খিল ধরা (ট্রিসমাস) যার জন্য মুখ খোলাই অসম্ভব হয়। আরও কিছু পরে এর সঙ্গে যুক্ত হয় সমস্ত মাংসপেশীগুলির যন্ত্রণাদায়ক খিল ধরা (ওপিস্থোটোনাস), সামান্যতম উত্তেজনার ফলেই যা দেখা দেয়। আরম্ভ হয় শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার মাংসপেশীগুলির খিঁচুনি ও শ্বাসকষ্ট (চিত্র — ৫৩)। টিটেনাসের চিকিৎসা খুবই কঠিন কাজ। তা বেশী সফল হয় যদি চিকিৎসা করা যায়, এর জন্য বিশেষীকৃত হাসপাতালে। কেননা এ অসুখ সারিয়ে তোলার কোন বিশেষ চিকিৎসা নেই আর উপসর্গগুলির চিকিৎসার জন্য
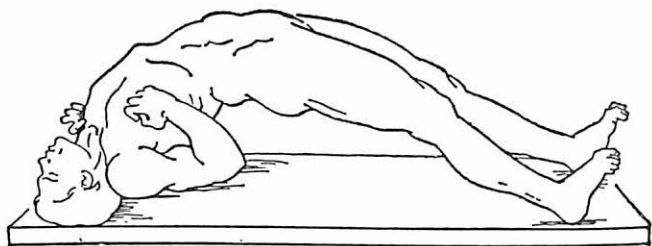
চিত্র — 53: টিটেনাস রোগে শরীর বাঁকানো

দরকার বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মিদের সেবা-যত্ন।

টিটেনাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কার্য্যকরি উপায় হল বিশেষ টিটেনাস বিরোধী ইমিউনিটি সৃষ্টি করা। একাজ সম্পাদিত হয় টিটেনাস বিরোধী এডসর্প-করা এ্যানাটক্সিন ইঞ্জেকশন করে, যাতে বহু বছরের জন্য টিটেনাসে আক্রান্ত হওয়া রোধ করে রাখা যায়। অবশ্য, যদি প্রতি ৫ থেকে ১০ বছর অন্তর পুনর্বার টিটেনাস এ্যানাটক্সিনের ভ্যাক্সিন নেওয়া হয়। যে কোন আঘাতে, যাতে চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সমগ্রতা নষ্ট হয়, পুড়ে গেলে, II ডিগ্রী বা ততোধিক বরফাঘাত হলে, জীব-জন্তুর কামড়ে, হাসপাতালের বাইরে গর্ভপাত করালে, যাদের গৃহে প্রসব হয়েছে সুদক্ষ চিকিৎসা সাহায্য ছাড়া, সেই সব মায়েদের — এই সব ক্ষেত্রেই জরুরী ভাবে বিশেষ টিটেনাস বিরোধী প্রতিষেধক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

যে সমস্ত লোকেদের আগে ঠিকভাবে টিটেনাস বিরোধী

ইমিউনাইজেশন বা প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে — টিকা দেওয়া হয়েছে তাদের টিটেনাস হওয়া রোধ করার জন্য আবার ইঞ্জেকশন দেওয়া হয় ০·৫ মিলিলিটার পরিষ্কারকৃত এডসর্প-করা টিটেনাস এনাটক্সিন (সক্রিয় ইমিউনিটির জন্য), তা সে আঘাত দুর্বলই হোক বা বিপদজনকই হোক না কেন। এ সব কেসে এণ্টিটিটেনিক সিরাম দেওয়া হয় না। যাদের আগে টিকা নেওয়া ছিল না বা আগে নির্ভুলভাবে টিকা নেওয়া হয়নি, তাদের জন্য জরুরী বিশিষ্ট টিটেনাস বিরোধী প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সক্রিয় ও পরোক্ষ উপায়ে — ইঞ্জেকশন করা হয় ১ সি. সি. এডসর্পকরা টিটেনাস এনাটক্সিন ও ৩০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট এণ্টি-টিটেনিক সিরাম (A.T.S.)। এই উপায়ে ইমিউনাইজ করা বা অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজন ভ্যাক্সিনেশন করা, একাধিক বার। ৩০ থেকে ৪০ দিন পরে ইঞ্জেকশন করে দিতে হয় ০·৫ সি.সি. টিটেনাস এনাটক্সিন আর দীর্ঘস্থায়ী অনাক্রম্যতা সৃষ্টি করার জন্য আরও ১০ থেকে ১২ মাস পরে দিতে হয় আবার ০·৫ সি.সি. টিটেনাস এনাটক্সিন ইঞ্জেকশন।

ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয় পরোক্ষ অনাক্রম্যতা সৃষ্টির উপায়টি। ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হয় এণ্টিটিটেনিক সিরাম (ATS), যাতে থাকে বিশেষ টিটেনাস বিরোধী এণ্টিবডি। সিরাম দেহে সৃষ্টি করে কিছু দিনের জন্য পরোক্ষ অনাক্রম্যতা। দেওয়া হয় দুর্দশাপন্নের বয়স নির্বিশেষে এক প্রতিষোধক ডোজ — ৩০০০ আন্তর্জাতিক ইউনিট (যা থাকে ১ সি. সি তে)। অনাক্রম্যতা সৃষ্টির এই উপায়টি

কম নির্ভরযোগ্য। এণ্টিটিটেনিক সিরাম ইঞ্জেকশন করা হয়, এই ওষুধটি রোগী সহ্য করতে পারে কি না — তা আগে পরীক্ষা করে নিয়ে। এর জন্য প্রথমে নিম্নবাহুর সামনের দিকে চামড়ার ভেতর ইঞ্জেকশন করা হয় ০·১ সি.সি. (১:১০০) এণ্টিটিটেনিক সিরাম (A.T.S.)। প্রতিক্রিয়াকে ঋণাত্মক (নেগেটিভ) বলে ধরা হয় যদি ২০ মিনিটের মধ্যে ইঞ্জেকশনের জায়গা ৯ মিলিমিটারের বেশী জায়গা জুড়ে হয়ে ফুলে না ওঠে ও তার চারপাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে লাল না হয়ে ওঠে। পরীক্ষার প্রতিক্রিয়া যদি ঋণাত্মক হয় তাহলে ইঞ্জেকশন করে দেওয়া হয় ০·১ সি.সি. নির্ভেজাল এ.টি.এস. এবং এতেও যদি কোন প্রতিক্রিয়া না হয় তখন ৩০ থেকে ৬০ মিনিটের মধ্যে ইঞ্জেকশন করা হয় ওষুধের গোটা ডোজ। যদি চামড়ার ভেতর ইঞ্জেকশনে প্রতিক্রিয়া ধনাত্মক হয়, তাহলে আর এ.টি.এস ইঞ্জেকশন করা হয় না।

টিটেনাসের এনাটক্সিন দেওয়া হয় না শুধু সেই সব কেসে, যেখানে প্রথম পুনর্বার ভ্যাকসিন করার পর (রিভ্যাকসিনেশন) ৬ মাস অতীত হয় নি বা দ্বিতীয় পুনর্বার ভ্যাকসিনের পর ১ বছর অতিক্রান্ত হয় নাই।

গ্যাসগ্যাংগ্রীন। যদি ক্ষতে পতিত হয় এমন জীবাণু যেগুলি বংশবৃদ্ধি করে হাওয়া বিহীন পরিবেশে, (এনিরোবিক ইনফেকশন) তাহলে ক্ষতে, তার চতুর্দিকের কলায় সৃষ্টি হয় বিপদজনক স্ফীতির প্রক্রিয়া। এই জটিলতা সৃষ্টির সবচেয়ে আগে যে লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহল এই যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে জখমের ২৪ ঘণ্টা থেকে

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষতে সৃষ্টি হয় — ভারী, যেন ফেটে বেরিয়ে পড়তে চাইছে, এমন অনুভূতি যা শীঘ্রই পর্যবসিত হয় অসহ্য ব্যথায়। ক্ষতের চার দিকে অচিরেই দেখা দেয় জলঠাসা ভাব, চামড়া ঠাণ্ডা হয়ে যায় ও জায়গায় জায়গায় দেখা দেয় কালো কালো চাপ, স্থানীয় রক্ত শিরা-গুলিতে অন্তর্হিত হয় নাড়ীর স্পন্দন। ক্ষতের অঞ্চলে কলার ওপর চাপ দিলে আঙ্গুলের তলায় অনুভূত হয় মচমচানি (মচ-মচ শব্দ, মুড় মুড় শব্দ)। এর কারণ হল এই যে, এতে সৃষ্টি হয় গ্যাসের বুদবুদ যা কলার ভেতর প্রবেশ করে। খুব তাড়াতাড়ি দেহের তাপমাত্রা বর্দ্ধিত হয়ে ওঠে ৩৯ থেকে ৪১ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত।

গ্যাসগ্যাংগ্রীনের চিকিৎসায় নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করতে হয়:—১) গ্যাসগ্যাংগ্রীন বিরোধী সিরাম ইঞ্জেকশন দিতে হয়; ২) অস্ত্র চিকিৎসা — আক্রান্ত দেহাঙ্গটির কলা ভাল করে চিরে দিতে হয় বা তাকে একেবারে কেটে বাদ দিতে হয়; ৩) আক্রান্ত স্থলের স্থানীয় চিকিৎসা করতে হয় এমন সব ওষুধ দিয়ে যা অম্লজান মুক্ত করে (যেমন হাইড্রোজেন পেরক্সাইড)।

পরিণতির দিক থেকে অসুখটি সর্বদাই বিপদজনক।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গ্যাসগ্যাংগ্রীন, সেপ্‌সিস ও টিটেনাস হয় বেশী জায়গা জুড়ে জখমের ক্ষত হলে, যাতে থাকে ছেঁড়া, থেৎলে যাওয়া জীবন-অক্ষম কলা যেগুলি জীবাণুর পক্ষে ভাল পুষ্টি মাধ্যমের কাজ করে। জীবাণুগুলির বংশবৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে রোগীর ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ, ঠাণ্ডায় কাতর অবস্থা ইত্যাদি। ক্ষতের এই সব বিপদজনক জটিলতা সৃষ্টি হতে এক

এক সময় কয়েক ঘণ্টা সময়ই যথেষ্ট। এর থেকেই বোঝা যায় যে আহতকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে সময়মত ডাক্তারী চিকিৎসা সাহায্য দান ও সময়মত বিশেষ টিটেনাস বিরোধী ও গ্যাসগ্যাংগ্রীন বিরোধী সিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়ার মূল্য কত বেশী।

ক্ষতের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার প্রধান ব্যবস্থা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অস্ত্র চিকিৎসা করা — অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য ক্ষতের প্রাথমিক অস্ত্রপরিচর্য্যা করা। অস্ত্রের সাহায্যে এই পরিচর্য্যা সেরে ফেলতে হয় জখমের সময় থেকে ৬ ঘণ্টার মধ্যে।

প্রাথমিক অস্ত্র পরিচর্য্যা। ১ম ইনটেনশনে (পুঁজ না হয়ে) তা সোজাসুজি শুকিয়ে যায় কেবলমাত্র কেটে যাওয়া ও অস্ত্রোপচারের ক্ষতে যে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে জীবাণুবিহীন পরিবেশে। সব রকমের অপ্রত্যাশিত জখমের ক্ষত, জীবাণুদুষ্ট ক্ষত এবং অস্ত্রচিকিৎসা ছাড়া সেগুলি সবই শুকোয় ২য় ইনটেনশনে, অর্থাৎ পুঁজ হয়ে, আস্তে আস্ত মৃত কলা নির্গত হয়ে, ক্রমে ক্রমে ক্ষত নতুন গজানো গ্রানুলেশন কলায় ভর্তি হয়ে ও তারপর তার ওপর চটা পড়ে। ক্ষতের অস্ত্রোপচার, যাতে গোটা ক্ষতনালীর গমন পথে ক্ষতের ধারগুলি কেটে পরিষ্কার করা হয় তকেই বলা হয় ক্ষতের প্রাথমিক অস্ত্রপরিচর্য্যা। এই অস্ত্রোপচারে কেটে অপসারণ করা হয় সমস্ত সংক্রামিত ও ছিঁড়ে-যাওয়া এবং থেৎলে যাওয়া কলা, বহিরাগত বস্তু। সম্পূর্ণ ভাবে রক্তপাত বন্ধ করা হয় ও তারপর কলার স্তরের সঙ্গে স্তর মিলিয়ে ক্ষত সেলাই করে বন্ধ করা হয়। ক্ষতের প্রাথমিক অস্ত্রপরিচর্য্যা যদি জখম হওয়ার প্রথম

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে করা যায় তাতে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষত প্রথম ইনটেনশনে শুকিয়ে যায়। এই পরিচর্য্যাই হল সেপ্‌সিস, গ্যাস গ্যাংগ্রীন ও টিটেনাস প্রতিরোধের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ উপায়।

জখমের ক্ষতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের মূল নীতি

জখমের ক্ষতের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের ভিত্তি হল ক্ষতের প্রাথমিক পরিচর্য্যা। জখমের পরমুহূর্তে সবচেয়ে বড় বিপদ হল রক্তপাত। জখমের পর বেশীর ভাগ মৃত্যুর কারণই হল ভীষণ রক্তপাত। তাই, এর পর প্রথম কাজ, যা করা উচিত, তার উদ্দেশ্য হওয়া দরকার যে প্রকারে সম্ভব রক্তপাত বন্ধ করা (রক্তবাহী শিরা চেপে ধরে, চাপ যুক্ত ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ও আরও অন্যান্য উপায়ে — পূর্বে দেখুন)। ক্ষতে ময়লা ঢোকা ও সংক্রমণ প্রতিরোধ করাও প্রাথমিক সাহায্যের কম মূল্যবান কর্তব্য নয়। নির্ভুল ভাবে পরিচর্য্যা করা, ক্ষতে জটিলতা সৃষ্টিতে বাধা দান করে এবং ক্ষত সেরে ওঠার সময়কে প্রায় তিন গুণ কমাতে সাহায্য করে। ক্ষতের পরিচর্য্যা করতে হয় পরিষ্কার করা হাতে, আরও ভাল, যদি তা করা হয় নির্বীজিত-করা হাতের সাহায্যে। জীবাণু বিহীন ভাবে ড্রেসিং করতে গজের সেই সব স্তর হাত দিয়ে স্পর্শ করতে নেই, যে গুলি সোজাসুজি ক্ষতের সংস্পর্শে আসবে। যদি নির্বীজিত করার ওষুধ-পত্র হাতের কাছে না থাকে তবে ক্ষতকে দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা

করা যায় সাধারণ নির্বীজিত-করা জিনিষ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে (ব্যাণ্ডেজ, প্যাকেট-করা ব্যাণ্ডেজের জিনিষ-পত্র, বাঁধার জন্য ব্যবহৃত রুমাল)। যদি নির্বীজিত করার ওষুধ-পত্র থাকে (হাইড্রোজেন পেরক্সাইড, ফুরাসিলিন সলিউশন, টিংচার আয়োডিন, পেট্রোল ও অন্যান্য জিনিষপত্র) তা হলে বীজাণুবিহীন ভাবে ড্রেসিং করার আগে ক্ষতের চতুর্দিকের চামড়াকে এণ্টিসেপ্টিকে ভেজানো গজ বা তুলোর টুকরো দিয়ে ২-৩ বার ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে হয় ও চেষ্টা করতে হয় যাতে চামড়া থেকে সমস্ত ময়লা, সেঁটে যাওয়া জামা-কাপড়ের ছেঁড়া টুকরো, মাটি অপসারিত হয়। এতে চারদিকের চামড়া থেকে ক্ষতে জীবাণু পতিত হওয়া রোধ করা যায়। ক্ষত, জলদিয়ে ধোয়া নিষেধ — তাতে ক্ষত জীবাণুদুষ্ট হয়। ক্ষতের ওপর জ্বালা সৃষ্টি করা এণ্টিসেপ্টিক পড়তে দিতে নেই। স্পিরিট, টিংচার আয়োডিন, পেট্রোল কোষ বিনষ্ট করে, যার ফলে পুঁজ সৃষ্টির সহায়ক অবস্থা সৃষ্টি হয় ও ভীষণ ব্যথা হয়, যা মোটেই কাম্য নয়। ক্ষতের গভীর স্তর থেকে ঢুকে-পড়া বহিরাগত বস্তু ও ময়লা বের করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কেননা তাতে সংক্রমণের সম্ভাবনা আরও বাড়ে ও নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে (রক্তপাত, কোন দেহাঙ্গের ক্ষতি)।

ছোট ছোট বহিরাগত বস্তু (ফরেন বডি), চামড়ায় যা বিঁধে গেছে (চোঁচ, গাছের কাঁটা, কাঁচের টুকরো, ধাতুর টুকরো), সেগুলি ব্যথা সৃষ্টি করে, কলায় জীবাণু বহন করে এবং তা থেকে বিপদজনক স্ফীতির অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে (পচা ঘা, আঙ্গুল হারা)। তাই প্রাথমিক

চিকিৎসা সাহায্য দিতে এরকম বহিরাগত বস্তু অপসারিত করার সার্থকতা আছে।

ছড়ে যাওয়া জায়গা থেকে ময়লা, বালি, অপসারিত করা সহজ হাইড্রোজেন পেরক্সাইড দিয়ে জায়গাটিকে ধৌত করে। চোঁচ, কাঁটা ও অন্যান্য ক্ষুদ্র বহিরাগত বস্তু অপসারিত করা যায় ফরসেপ্স, সূঁচ, আঙ্গুল দিয়ে। বহিরাগত বস্তু অপসারিত করার পর ক্ষত যে কোন এণ্টিসেপ্টিক সলিউশন দিয়ে মাখিয়ে দেওয়া উচিত। জখমের বড় ক্ষতের ভেতর থেকে বহিরাগত বস্তু অপসারণ করা অন্য কারো নয়, কেবলমাত্র ডাক্তারের কাজ। তা করতে হয় ক্ষতের প্রাথমিক অস্ত্রপরিচর্য্যা করার সময়। ক্ষতে পাউডার ছিটানো, তাতে মলম লাগানো, সোজাসুজি ক্ষতের ওপর তুলো পেতে দেওয়া নিষেধ। এই সমস্তই ক্ষতে সংক্রমণ হতে সাহায্য করে।

এক এক সময় ক্ষতের ফুটোতে বেরিয়ে পড়তে পারে দেহের অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গ (মস্তিষ্ক, অন্ত্র, কণ্ডরা)। অনুরূপ ক্ষতের পরিচর্য্যা করতে বেরিয়ে-আসা দেহাঙ্গকে ক্ষতের গভীরে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা নিষেধ। বেরিয়ে-আসা দেহাঙ্গকে ড্রেসিং-এর সামগ্রী দিয়ে ঢেকে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে হয়।

দেহপ্রান্তগুলিতে প্রশস্ত ক্ষত হলে সেগুলিকে অনড় করে রাখতে হয়। আহতদের প্রাথমিক সাহায্য দানের মূল্যবান কাজ হল তাদেরকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাসপাতালে পাঠানো। আহত ব্যক্তি যত তাড়াতাড়ি ডাক্তারের সাহায্য পাবে, ততই তার চিকিৎসায় সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, যত
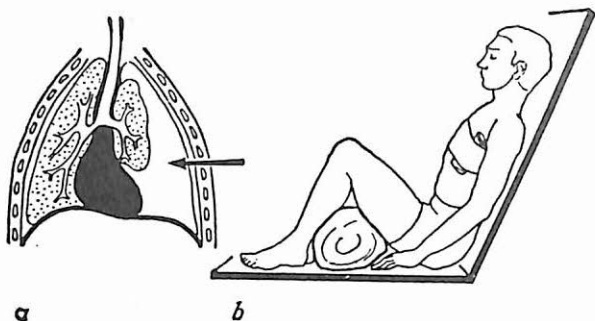
চিত্র — 54. বক্ষপিঞ্জরের বিদ্ধ ক্ষত
a — নিউমোথোরাক্স-এর নক্সা ; b — বক্ষপিঞ্জরের ক্ষত বন্ধ করার পর পরিবহণের সময় তার অবস্থানভঙ্গি

তাড়াতাড়ি সম্ভব স্থানান্তরিত করতে আহতকে সঠিক ভাবে পরিবহণের কাজটা যেন একটুও ব্যাহত না হয়।

আহতদের গাড়িতে করে নিয়ে যেতে, এমন অবস্থানভঙ্গিতে রেখে নিয়ে যেতে হয় যাতে গাড়ির ঝাঁকুনিতে একটুও ক্ষতি না হয় ও ধর্তব্যের মধ্যে রাখা হয় তার জখমের চরিত্র, কোন্ স্থান জখম হয়েছে ও কী পরিমাণ রক্তক্ষয় হয়েছে। সমস্ত আহত রোগী, জখমের ফলে যাদের সক্ হয়েছে ও বেশীরকম রক্তক্ষয় হয়েছে তাদের পরিবহণ করতে হয় চিৎ করে শোয়ানো অবস্থায়।

করোটি, বক্ষপিঞ্জর ও পেটের জখমে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের বৈশিষ্ট্য

করোটির নরম কলা জখমে প্রাথমিক সাহায্য দানে প্রথম কাজ হওয়া দরকার রক্তপাত বন্ধ করা। যেহেতু নরম

কলার ঠিক তলায় থাকে করোটির অস্থি, তাই এতে সাময়িক ভাবে রক্ত বন্ধ করার সবচেয়ে ভাল উপায় হল চাপ সৃষ্টিকারী ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেওয়া। এক এক সময় রক্তপাত থামানো যায় আঙ্গুলের সাহায্যে ধমনী চেপে ধরে বাইরের রগের ধমনীকে কানের পাতার সামনে চেপে ধরে, বাইরের চোয়ালের ধমনীকে নিচের চোয়ালের নিচের ধারের ওপর, তার কোণ থেকে ১-২ সেণ্টিমিটার দূরে অস্থির ওপর চেপে ধরে। করোটির জখমে সবচেয়ে বড় বিপদ হল এই যে, তাতে একই সঙ্গে মস্তিষ্ক জখম হওয়া (মস্তিষ্কের কংকাশন, মস্তিষ্কের চোট, মস্তিষ্কের ওপর চাপ) তেমন বিরল নয়। অনুরূপ জখমে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে আহতকে অনুভূমিক অবস্থায় শুইয়ে দিতে হয়, শান্ত অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, মাথায় ঠাণ্ডা কম্প্রেস বা বরফের ব্যাগ প্রয়োগ করতে হয় এবং অবিলম্বে আহতকে হাসপাতালে পরিবহণ করার ব্যবস্থা করতে হয়। বক্ষপিঞ্জরের ভেদ-করা ক্ষত সাংঘাতিক বিপদজনক ক্ষত, তার কারণ এই যে, তাতে জখম হতে পারে হৃৎপিণ্ড, মহাধমনী, ফুসফুস ও অন্যান্য জীবন-ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় অন্যান্য দেহাঙ্গগুলি, যেগুলির জখমে ভীষণ অভ্যন্তরীণ রক্তপাত ও মৃত্যু হতে পারে। বক্ষপিঞ্জরের ভেদ করা জখমে, জীবনধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় কোন দেহাঙ্গ জখম না হলেও তা জীবনের পক্ষে যথেষ্ট বিপদজনক। এর কারণ হল এই যে, প্লুরা গহ্বরে ফুটো হলে তাতে হাওয়া প্রবেশ করে ও সৃষ্টি হয়, যাকে বলে উন্মুক্ত নিউমোথোরাক্স। এতে ফুসফুস চুপ্সে যায়, হৃৎপিণ্ড এক দিকে সরে যায় ও

সৃষ্টি হয় সুস্থ ফুসফুসের ওপর চাপ, দেখা দেয় এক রকম মারাত্মক সাধারণ অবস্থা, যাকে বলে প্লুরোপাল্মনাল সক্। প্রাথমিক সাহায্য যে দেবে তার জানা দরকার যে, অনুরূপ ক্ষত, তার ভেতর দিয়ে হাওয়া ঢুকতে না পারে— এমন ভাবে যদি বন্ধ করে দেওয়া যায় তাহলে এই মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হওয়া নিবারণ করা যায় বা তাকে কমিয়ে রাখা যায়। বক্ষপিঞ্জরের ক্ষত নির্ভরযোগ্য ভাবে আটকে বন্ধ করে রাখা যায় লিউকোপ্লাস্টার দিয়ে, টালি সাজানোর মত এক পাত দিয়ে পূর্ববর্তী পাকের খানিকটা অংশকে ঢেকে। লিউকোপ্লাস্টার না থাকলে ক্ষত বন্ধের জন্য ব্যবহার করা যায় তৈল-কাগজ যা দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের ব্যাণ্ডেজের সামগ্রী প্যাক করা থাকে। ক্ষতস্থানে এ তৈল-কাগজ চাপা দিয়ে তার ওপর শক্ত করে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে হয়। তাছাড়াও গজের ওপর ভাল করে মলম মাখিয়ে তাই দিয়ে ক্ষত চাপা দিয়ে বা অয়েল-ক্লথের টুকরো চাপা দিয়ে অথবা হাওয়া প্রবেশ না করতে পারে — এমন পাত দিয়ে বা অন্যান্য জিনিষ দিয়েও ক্ষতের মুখ চাপা দেওয়া যায় যার ওপর তারপর চাপ সৃষ্টিকারী ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হয়। এর সঙ্গে দরকার সক্ বিরোধী ব্যবস্থাদি অবলম্বন করা। এই জখমে আহতকে গাড়িতে করে পরিবহণ করতে হয় আধা-বসা অবস্থায়।

পেটের জখম। পেটের দেওয়ালের জখম অসম্ভব বিপদজনক, এমন কি দেখতে সামান্য হলেও শেষপর্যন্ত প্রমাণিত হতে পারে যে, ভেদ-করা ক্ষত, যাতে পেটের গহ্বরের ভেতরকার দেহাঙ্গগুলি জখম হওয়াও সম্ভব।

তা যদি হয়, তাতে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে বলে দরকার, কালবিলম্ব না করে অপারেশন করা। অনুরূপ জটিলতাগুলির মধ্যে পড়ে অভ্যন্তরীণ রক্তপাত ও অন্ত্রের ভেতরকার বস্তু পেরিটোনিয়াম গহ্বরে পড়া, যাতে পরে দেখা দেয় পুঁজযুক্ত (বিষ্ঠা দূষিত) পেরিটোনাইটিস (পেরিটোনিয়ামের স্ফীতি)।

পেটের সামনের দেওয়ালের জখমে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে ক্ষত পরিচর্য্যার সাধারণ নিয়মগুলি পালন করতে হয়। পেটের প্রশস্ত জখমে পেটের দেওয়ালের ফুটোর (ক্ষতের) ভেতর দিয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে পেটের গহ্বরের ভেতরকার দেহাঙ্গগুলি (একে বলে এভেনট্রেশন), কোন কোন ক্ষেত্রে জখম হওয়া দেহাঙ্গ। অনুরূপ ক্ষতও জীবাণুবিহীন ভাবে ঢেকে ব্যাণ্ডেজ করে দিতে হয়। বেরিয়ে-পড়া দেহাঙ্গগুলিকে তখনই ঐ ভাবে ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া নিষেধ, তাতে পেরিটোনাইটিস হয়। ক্ষতের চতুর্দিকের চামড়ার পরিচর্য্যা করে বেরিয়ে-আসা দেহাঙ্গগুলির ওপর নির্বীজিত গজ চাপা দিয়ে, গজের ওপর ও দেহাঙ্গগুলির দুপাশ মোটা করে তুলোর স্তর স্থাপন করে তা চক্রাকারে ব্যাণ্ডেজ করা হয়। ব্যাণ্ডেজ করার জন্য এক্ষেত্রে তোয়ালে বা বিছানার চাদরও ব্যবহার করা চলে, তবে ক্ষত ঢাকার পর তার শেষ অংশ দুটি সেলাই করে আটকে দিতে হয়। পেটের জখমে যাদের পেটের ভেতরকার দেহাঙ্গগুলির এভেনট্রেশন হয় খুবই তাড়াতাড়ি, তাদের সক্ সৃষ্টি হয়। তাই অতি প্রয়োজন সক্ বিরোধী চিকিৎসা করা। কেবল মাত্র এ সব কেসে মুখদিয়ে কোন তরল পদার্থ দেওয়া চলে না।

যেহেতু পেটের যে কোন জখমে পেটের ভেতরকার দেহাঙ্গও জখম হতে পারে তাই আহতকে মুখ দিয়ে কোন কিছু খেতে বা পান করতে দেওয়া হয় না। অন্ত্র ভেদ-করা জখমে এতে পেরিটোনাইটিস হওয়া ত্বরান্বীত হয়।

পেটের জখমে, আহতদের হাসপাতালে পরিবহণ করতে হয় শোয়ানো অবস্থায়, ধড়ের ওপরের দিকটা খানিকটা উঁচুতে তুলে আর হাঁটু দুটি ভাজ করে। দেহের এই অবস্থানভঙ্গি, ব্যথা কমায় ও পেটের সমস্ত অঞ্চলে স্ফীতির প্রক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

নবম পরিচ্ছেদ

নরম কলা, অস্থিসন্ধি ও অস্থির জখমে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

আঘাত (trauma) **বলতে যা বোঝায়।** দেহের ওপর বাইরের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (ফ্যাক্টরের) প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার ফলস্বরূপ দেহের কলা ও দেহাঙ্গগুলির যদি গঠনগত ও ক্রিয়াকলাপ গত কোন পরিবর্তন ঘটে তাহলে তাকে বলে আঘাত বা জখম। অনুরূপ ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে যান্ত্রিক শক্তির ক্রিয়া (বাড়ি লাগা, চাপ লাগা, টান লাগা), ভৌত ক্রিয়া (উত্তাপের ক্রিয়ার ফলে, ঠান্ডার ফলে, বিদ্যুতের আঘাতে, রেডিও-এ্যাকটিভ রশ্মির ক্রিয়ার ফলে), রাসায়নিক ক্রিয়া (অম্লের ক্রিয়ার ফলে, ক্ষারের ক্রিয়ার ফলে, বিষের ক্রিয়ার ফলে), মানসিক বিক্রিয়া (ভয়ে, আশঙ্কায়)। জখমের উগ্রতা নির্ভর করে উপাদানের শক্তি ও কতক্ষণ ধরে সেই ফ্যাক্টর কাজ করেছে তার ওপর। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জখম সৃষ্টি হয় দেহের কলার উপর সোজাসুজি যান্ত্রিক শক্তির ক্রিয়ার ফলে (বাড়ি লাগা, চাপ লাগা, টান লাগা) যান্ত্রিক জখম হতে পারে বদ্ধ জখম ও খোলা জখম। বদ্ধ জখম বলে সেই জখমগুলিকে যে জখমে চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সমগ্রতা নষ্ট হয় নি। তার ভেতর পড়ে গুঁতোলাগা, টানলাগা, ও চামড়ার তলার

দেহাঙ্গ ও নরম কলা (মাংসপেশী, কণ্ডরা, রক্তবাহী শিরা, স্নায়ু) ছিঁড়ে যাওয়া। খোলা জখম বলে তাকে, যাতে দেহাঙ্গ ও কলা জখমের সাথে সাথে চামড়া বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সমগ্রতাও নষ্ট হয় (যেমন ক্ষত, উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গ)।

দেহের কলাগুলির ওপর হঠাৎ একবারের জোর আঘাতে যে জখম হয় তাকে বলে প্রকট (একিউট) আঘাত, আর যে জখম সৃষ্টি হয় কম জোরের, বহুবারের, তাকে বলা হয় ক্রনিক জখম। ক্রনিক জখমের মধ্যে ধরা হয় বেশীর ভাগ পেশার সঙ্গে জড়িত অসুখ (ভার বহনের পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত অসুখ — ফ্ল্যাট-ফুট, রেল চালকদের টেণ্ডো ভ্যাজিনাইটিস, এক্স-রে কর্মীদের হাতের একজিমা ও ঘা প্রভৃতি)।

সমস্ত রকম জখমে কলায় স্থানীয় পরিবর্তন ছাড়াও দেহের কোন না কোন সাধারণ পরিবর্তন, যেমন হৃৎপিণ্ড ও রক্তশিরা তন্ত্রের, শ্বাস-প্রশ্বাসের, পদার্থ বিনিময়ের পরিবর্তন ও আরও অন্যান্য পরিবর্তন ও আরও অন্যান্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় (দেখুন ৪র্থ ও ৫ম পরিচ্ছেদ)। জনসংখ্যার কোন বিশেষ গ্রুপের মধ্যে কোন বিশেষ সময়ের গণ্ডির ভেতর সব মিলিয়ে কত জখমের কেস হয়েছে, তাকে বলা হয় ট্রাউমাটিজম। পার্থক্য করা হয় শিল্প-কর্মীদের ভেতরকার ট্রাউমাটিজম, কৃষিকর্মীদের ট্রাউমাটিজম, গৃহকর্মীদের ট্রাউমাটিজম, খেলোয়াড়দের ট্রাউমাটিজম, গাড়ীর চালকদের ট্রাউমাটিজম ও সৈনিকদের ট্রাউমাটিজমের মধ্যে। ট্রাউমাটিজমের বিরুদ্ধে সংগ্রাম হল স্বাস্থ্যরক্ষার ও শ্রমরক্ষার সংগঠনগুলির অন্যতম প্রধান কাজ।

বাড়ি লাগা গংতো লাগা চোট, টান লাগা চোট, ছিঁড়ে যাওয়া চোট, চেপ্‌টে দেওয়া চোট এবং অস্থিসন্ধি বিচ্যুতির প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

চামড়ার বড় গুণ — তা যথেষ্ট মজবুত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আঘাতের ফলে যখন নরম কলা ও অস্থি যথেষ্ট জখম হয়েছে, চামড়ার সমগ্রতা নষ্ট হয় নি।

নরম কলা ও দেহাঙ্গগুলির সবচেয়ে সচরাচর জখম হল গুতো লাগা, বাড়ি লাগা চোট। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা ভোঁতা জিনিষের বাড়িতে হতে দেখা যায়। চোট লাগা জায়গাটি তাড়াতাড়ি ফুলে ওঠে ও সেখানে রক্ত জমার কালশিটেও দেখা দিতে পারে। যদি চামড়ার তলায় মোটা রক্তবাহী শিরা ছিঁড়ে যায়, তাহলে সেখানে বেশ খানিকটা রক্ত জমে হিমাটোমা সৃষ্টি হতে পারে। বাড়ি লাগা-গংতো লাগা চোট, জখম হওয়া দেহাঙ্গের ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত করে। নরম কলার গংতো লাগা বাড়ি লাগা চোট, যেখানে ব্যথা ও দেহপ্রান্তের চোটে, তার সচলতা সীমাবদ্ধ করে সেখানে বাড়ি ও গংতোতে অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গগুলির (মস্তিষ্ক, যকৃৎ, ফুসফুস, বৃক্ক) চোট, গোটা দেহের ক্রিয়াকলাপের বিপদজনক ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে এমনকি তাতে মৃত্যুও হতে পারে।

স্বাভাবিক সচলতাগণ্ডির ঊর্দ্ধে যদি অস্থিসন্ধিকে পরিচালিত করা হয় অথবা অস্থিসন্ধি যে দিকে স্বভাবগত নড়াচড়া করে থাকে তার বিপরীত দিকে যদি ঠেলে তাকে পরিচালিত করা হয়, তাহলে সৃষ্টি হয় টান-লাগা চোট ও অস্থিসন্ধি বন্ধনী, যা তাকে শক্ত করে ধরে রাখে, তা ছিঁড়ে যায়। টান লাগা চোটের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাতে ভীষণ

ব্যথা সৃষ্টি হয়, চোটের জায়গাটি খুব তাড়াতাড়ি ফুলে ওঠে ও অস্থিসন্ধির কাজ ভীষণ ভাবে ব্যাহত হয়।

চেপ্‌টে দেওয়া চোট খুবই বিপদজনক চোট, যাতে মাংসপেশী, চামড়ানিম্ন চর্বি, কোষকলা, রক্তবাহী শিরা ও স্নায়ু থেৎলে যায়। এ রকম চোট সৃষ্টি হয় খুব ভারী জিনিষের চাপে (দেওয়াল, কড়িকাঠ, মাটির ধ্বস চাপা পড়লে); পাহাড় থেকে বরফের বা পাথরের ধ্বসের সময়, বোমা বর্ষণের, ভূমিকম্পের সময়। চেপটানো আঘাতে সৃষ্টি হয় সক্ এবং পরে দেখা দেয় বিধ্বস্ত নরম কলার বিগলনে উন্মুক্ত পদার্থগুলির দ্বারা দেহের ওপর বিষক্রিয়া।

বাড়ি লাগা, গুঁতো লাগা চোটে সর্বাগ্রে দরকার আহত দেহাঙ্গটিকে বিশ্রামের অবস্থায় রাখা। চোট লাগা জায়গাটির ওপর চাপযুক্ত ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হয় ও দেহের সেই অংশটিকে রাখতে হয় উচ্চ অবস্থানে যা সেখানে নরম কলার ভেতর রক্ত পড়া বন্ধ করে। ব্যথা ও স্ফীতি কমানোর জন্য চোট লাগা স্থানটির ওপর রাখা হয় বরফের ব্যাগ, ঠাণ্ডা জলের পটি।

টান লাগা চোটেও প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য, বাড়ি লাগা গুঁতো লাগা চোটের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের মতন — অর্থাৎ সর্বাগ্রে ব্যাণ্ডেজ করে অস্থিসন্ধিটিকে অনড় করে রাখতে হয়। কণ্ডরা, অস্থি-সন্ধিটিকে অনড় করে চিকিৎসা সাহায্য দানের ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে: রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে রাখা, আহত অস্থিসন্ধিটিকে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে চেপে বাঁধা যাতে তা নড়তে চড়তে না পারে। ব্যথা কমানোর জন্যে রোগীকে সেবন করানো চলে ০·২৫ থেকে ০·৫

গ্রাম এনালজিন ও এমিডোপাইরিন আর চোটলাগা অঞ্চলে প্রয়োগ করতে হয় বরফের ব্যাগ।

যে কোন রকম টান লাগা চোটে ডাক্তার দেখান দরকার কেননা অস্থি ফেটে গেলেও দেখা দেয় ঐ একই উপসর্গগুলি।

চেপ্টে দেওয়া আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানে প্রধান কর্তব্য হল দুর্দশাগ্রস্তকে ভারী জিনিষের তলায় চাপা পড়া অবস্থা থেকে মুক্ত করার ব্যবস্থা করা। চাপা অবস্থা থেকে মুক্ত করার পরই, যাতে থেৎলে বিনষ্ট হওয়া দেহপ্রান্তের কলাগুলি থেকে বিগলনজনিত মুক্ত বিষাক্ত পদার্থ দেহে পরিবাহিত না হতে পারে তার জন্য দেহপ্রান্তটির ওপর, যতদূর সম্ভব তার গোড়ার কাছে বেঁধে দিতে হয় টুর্নিকেট, যেমন বাঁধা হয় ধমনীর রক্তপাত বন্ধ করতে, সব দিক থেকে অঙ্গটিকে বরফ চাপা দিতে হয় অথবা ঠাণ্ডাজলে ভেজানো নেকড়া দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। আহত দেহপ্রান্তটিকে স্প্লিণ্টের সাহায্যে ইম্মবিলাইজ বা অচল করে রাখতে হয়। এই সব রোগীদের বহু ক্ষেত্রে আঘাতের মুহূর্ত থেকেই দেখা দেয় সক্। সকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য অথবা তা প্রতিরোধ করার জন্য রোগীকে গরম কম্বল বা অনুরূপ কিছু দিয়ে ঢেকে দিতে হয়, পান করতে দেওয়া হয় সামান্য স্পিরিট বা জল, গরম কফি বা চা। সম্ভব হলে দিতে হয় (অম্নাপোন, মর্ফিন ১% সলিউশন ১ সি. সি.), ন্যার্কটিক ইঞ্জেকশন, হৃৎপিণ্ডের কাজ উত্তেজক ওষুধ। এ সব কেসে, বিলম্ব না করে রোগীকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করতে হয় শোয়ানো অবস্থায়।

অস্থিসন্ধির জখমে, যাতে অস্থিসন্ধির গহ্বরে অবস্থিত, পরস্পরকে স্পর্শ করে-থাকা অস্থিগুলির সন্ধি-অন্তভাগের বিচ্যুতি ঘটে এবং তার কোন একটি সন্ধি অন্তভাগ, সন্ধির ছিঁড়ে যাওয়া সন্ধি থলির ভেতর দিয়ে বেরিয়ে পড়ে চলে যায় সন্ধিটিকে ঘিরে রাখা কলার আবরণীর ভেতর, তাহলে তাকে বলে সন্ধিবিচ্যুতি বা ডিস্লোকেশন। ডিস্লোকেশন হতে পারে পুরোপুরি ডিস্লোকেশন, যাতে অস্থি দুটির দুই সন্ধি অন্তভাগ এমন ভাবে বিচ্যুত হয় যে তারা আর পস্পরকে স্পর্শ করতে পারে না, আর আংশিক ডিস্লোকেশন, যাতে অস্থি দুটির অস্থিসন্ধি সারফেস বা উপরিভাগ আংশিক ভাবে পরস্পরকে স্পর্শ করে। ডিস্লোকেশনের বা অস্থিসন্ধি বিচ্যুতির নামকরণ হয় সেই অস্থির নাম অনুযায়ী যা জখম হওয়া সন্ধির দূরবর্তী (বাইরের দিকে) অংশে অবস্থান করে, যেমন বলা হয় চরণের ডিস্লোকেশন, যখন পায়ের কব্জির সন্ধিবিচ্যুতি ঘটে; ঊর্দ্ধবাহুর ডিস্লোকেশন যখন কাঁধের অস্থিসন্ধির বিচ্যুতি ঘটে ইত্যাদি। অস্থিসন্ধির বিচ্যুতি ঘটে সাধারণত পরোক্ষ আঘাতে, সন্ধির ওপর সোজাসুজি আঘাতে নয়। ঊরুর অস্থির বিচ্যুতি ঘটে উঁচু থেকে হাঁটুভাজ করা ও পা কিছুটা ভেতর দিকে ঘোরানো অবস্থায় পড়ে গেলে।

অস্থিসন্ধি বিচ্যুতির লক্ষণগুলি হল: দেহপ্রান্তের ব্যথা, অস্থিসন্ধি অঞ্চলের ভীষণ বিকৃতি (জায়গাটা বসে যায়), অন্তর্হিত হয় অস্থিসন্ধির সক্রিয় সচলতা এবং তাতে পরোক্ষ সচলতা সৃষ্টি করাও অসম্ভব হয়, দেহপ্রান্ত এমন অবস্থায় নিশ্চল হয়ে আটকে থাকে যা তার স্বাভাবিক অবস্থানভঙ্গি নয়, সহজে অঙ্গকে স্বাভাবিক অবস্থায়

ফিরিয়ে আনা যায় না, দেহ প্রান্তের দৈর্ঘ্যের মাপ পরিবর্তিত হয় — বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা লম্বায় ছোট হয়ে যায়।

সন্ধিবিচ্যুতিতে প্রাথমিক সাহায্যের কাজগুলির মধ্যে পড়ে সেই সমস্ত ব্যবস্থা, যাতে ব্যথা কমে: জখম হওয়া অস্থিসন্ধির ওপর ঠাণ্ডা প্রয়োগ করা, ব্যথা কমানোর ওষুধ ব্যবহার করা (এনালজিন, এমিডোপাইরিন, প্রোমেডল ইত্যাদি), দেহপ্রান্তকে নিশ্চল অবস্থায় ধরে রাখার ব্যবস্থা করা ঠিক সেই অবস্থায়, যে অবস্থা তা নিয়েছে আঘাতের পর। ঊর্দ্ধ দেহপ্রান্তকে রুমাল দিয়ে বা ব্যাণ্ডেজ দিয়ে গলার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখতে হয়, নিম্ন দেহপ্রান্তকে নিশ্চল করে রাখা হয় স্প্লিণ্ট বেঁধে বা হাতের কাছে পাওয়া অন্য কোন জিনিষ ব্যবহার করে। পুরনো ডিস্লোকেশনের চেয়ে সদ্য-হওয়া ডিস্লোকেশনকে ঠিক করে স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসা (রিডিউস করা) অনেক সহজ। আঘাতের পর ৩-৪ ঘণ্টার মধ্যেই জখম হওয়া অস্থিসন্ধি অঞ্চলে কলা স্ফীত হতে থাকে, জমা হয় রক্ত, যার জন্য বিচ্যুত অস্থিকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দেওয়া মুস্কিল হয়ে ওঠে। সন্ধিবিচ্যুতিতে বিচ্যুত অস্থিকে স্বস্থানে বসিয়ে দেওয়া, ডাক্তারের কাজ, তাই আহতকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। ঊর্দ্ধ প্রান্তের সন্ধিবিচ্যুতিতে রোগীরা নিজেরাই হাসপাতালে চলে আসতে পারে, অথবা যে কোন যানবাহনে করে বসা-অবস্থায় তাদের নিয়ে আসা যায়। যে রোগীদের নিম্ন দেহপ্রান্তে সন্ধিবিচ্যুতি হয়েছে তাদের পরিবহণ করতে হয় শোয়ানো অবস্থায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যকারীদের ডিস্লোকেশন রিডিউস করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কেননা এক এক সময় বোঝা কষ্টকর, সন্ধিবিচ্যুতি হয়েছে না অস্থিভঙ্গ হয়েছে। তাছাড়াও বহু ক্ষেত্রে সন্ধিবিচ্যুতির সঙ্গে একই সঙ্গে থাকে হাড়ের ফাটল ও অস্থিভঙ্গ।

অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

হাড়ের সমগ্রতা নষ্ট হওয়াকে বলে অস্থিভঙ্গ বা ফ্র্যাক্চার। প্রভেদ করা হয় আঘাতের ফলে অস্থিভঙ্গ (ট্রমাটিক ফ্র্যাক্চার) ও অসুখের ফলে অস্থিভঙ্গের (প্যাথোলজিকাল ফ্র্যাকচার) ভেতর। শেষোক্ত অস্থিভঙ্গের কারণ হল হাড়ের ভেতর অসুখের প্রক্রিয়া (টিউবারকুলোসিস, অস্টিওমায়েলাইটিস, হাড়ের টিউমার), যাতে সাধারণত হাড়ের ওপর যে চাপ পড়ে তাতেই ঐসব অসুখের বিশেষ পর্যায়ে অস্থি ভেঙ্গে যায়। ট্রম্যাটিক ফ্র্যাক্চার বা আঘাত জনিত অস্থিভঙ্গকে দুভাগে ভাগ করা
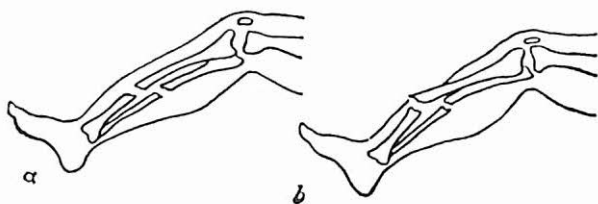
চিত্র — 55: অস্থিভঙ্গের রকমভেদ
a — বদ্ধ অস্থিভঙ্গ; b — উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গ

হয় — একটি বদ্ধ ফ্র্যাক্‌চার যাতে চামড়া জখম হয় না, অন্যটি উন্মুক্ত ফ্র্যাক্‌চার যাতে অস্থিভঙ্গের জায়গায় চামড়ারও ক্ষতি হয় (চিত্র — ৫৫)। উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গ, বদ্ধ অস্থিভঙ্গের তুলনায় বেশী বিপদজনক, কেননা তাতে হাড়ের টুকরোগুলির ইনফেকশন হওয়া ও অস্টিওমায়েলাইটিস সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী এবং তা ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগাতে বাধা সৃষ্টি করে।

অস্থিভঙ্গ হতে পারে যেমন সম্পূর্ণ তেমনি অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ অস্থিভঙ্গে, ভেঙ্গে যায় হাড়ের গোটা আড়াআড়ি মাপের কোন এক অংশ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তাতে হাড়ে সৃষ্টি হয় লম্বালম্বি ফাটলের মতন একক ফাঁক — যাকে বলে অস্থির ফাটল।

অস্থিভঙ্গ হয় নানা আকারের: আড়াআড়ি, বাঁকা, ঘোরানো সিঁড়ির মত, লম্বালম্বি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আলাদা আলাদা খোঁচা খোঁচা ধারযুক্ত টুকরো টুকরো হওয়া অস্থিভঙ্গ, যাকে বলে স্প্লিণ্টার্ড ফ্র্যাক্‌চার। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এই প্রকারের অস্থিভঙ্গ হয় আগ্নেয়াস্ত্রের গুলির জখমে। ওপর-নিচ চাপের ফলে বা চেপটানো চোটের ফলে যে প্রকারের অস্থিভঙ্গ হয় তাকে বলে কম্প্রেস্‌ড ফ্র্যাকচার।

বেশীর ভাগ অস্থিভঙ্গে হাড়ের ভাঙ্গা অংশগুলি কোন না কোন দিকে সরে যায়। তা নির্ভর করে একদিকে যেমন কোন্‌ দিক থেকে আঘাত এসেছে যার জন্য অস্থিভঙ্গ হয়েছে, অন্যদিকে আঘাতের পর হাড়ের টুকরোগুলিতে আটকানো মাংসপেশীগুলির সংকোচনও তার জন্য দায়ী। আঘাতের চরিত্র, কোথায় হাড় ভেঙ্গেছে, ভাঙ্গা হাড়ের

টুকরোগুলির সঙ্গে আটকানো মাংসপেশীগুলি কত শক্তিশালী, প্রভৃতি সমস্ত জিনিষের ওপর নির্ভর করে হাড়ের টুকরোগুলির স্থান পরিবর্তন নানা রূপ গ্রহণ করে: সরে গিয়ে দুই টুকরোতে নিজেদের মধ্যে কোণ রচনা করে থাকতে পারে, স্থান পরিবর্তন হতে পারে লম্বালম্বি তলে, একটা চলে যেতে পারে আর এক টুকরোর পাশে। হাড়ের একটুকরোর সাথে আর এক টুকরোর আট্‌কে যাওয়া যাতে একটুকরো আর এক টুকরোর মধ্যে গেঁথে যায়, তাও তেমন বিরল নয়।

অস্থিভঙ্গের বিশেষত্ব এই যে, তাতে দেখা দেয় ভীষণ ব্যথা, যা জায়গাটির যে কোন রকম নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় অথবা জায়গাটি দেহপ্রান্ত হলে তার ওপর ভর করলে। অস্থিভঙ্গে দেহপ্রান্তের অবস্থান ও তার বাইরের রূপ পরিবর্তিত হয়, তার ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হয় (দেহপ্রান্তকে ব্যবহারই করা যায় না)। অস্থিভঙ্গের জায়গায় দেখা দেয় স্ফীতি ও কালশিটে, দেহপ্রান্ত হলে তা লম্বায় ছোট হয়ে যায় ও তাতে কতগুলি অস্বাভাবিক সচলতা দেখা দেয় (প্যাথোলজিকাল মুভমেণ্ট)। অস্থিভঙ্গের জায়গাটি হাত দিয়ে অনুভব করলে রোগী ভীষণ ব্যথা পায়। স্পর্শে অস্থিভঙ্গের জায়গায় অনুভব করা যায় অস্থির অসমতা, ভেঙ্গে যাওয়া অস্থি টুকরোগুলির খোঁচা খোঁচা ধার ও সে জায়গায় সামান্য চাপ দিলে জায়গাটির মচমচানি। অস্থিভঙ্গেও জায়গা ধরে অনুভব করা বা সে জায়গায় বেশী রকম সচলতা (প্যাথোলজিক্যাল মুভমেণ্ট) আছে কি না — তা পরীক্ষা করার কাজটা খুবই সাবধাণে, একই সঙ্গে দুহাত ব্যবহার করে করা উচিত, রোগী যেন তাতে

বেশী ব্যথা না পায় ও রোগীর যেন তাতে কোন জটিলতা সৃষ্টি না হয় (ভাঙ্গা হাড়ের ধারাল ধারগুলির চোট লেগে যেন রক্তবাহী শিরা, স্নায়ু, মাংসপেশী, চামড়ার ঢাকনা ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী নতুন করে জখম না হয়)।

উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গে, ক্ষতের ভেতর দিয়ে ভগ্ন অস্থিখন্ড দেখা যাওয়া বিরল নয়। এর থেকেই বোঝা যায় যে, অস্থিভঙ্গ হয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে ভগ্ন হওয়া জায়গাটি অনুভব করা বা তার সচলতা পরীক্ষা করা নিষেধ।

অস্থিভঙ্গে, সঠিক ও সময়মত প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান তার চিকিৎসার এক অতি মূল্যবান অঙ্গ। তাড়াতাড়ি প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান অনেক পরিমাণে অস্থিভঙ্গের জোড়া লাগা প্রভাবিত করে ও নানা রকমের জটিলতা (রক্তপাত, অস্থিখন্ডগুলির এদিকওদিক সরে যাওয়া ইত্যাদি) সৃষ্টি নিবারিত করে।

অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের মূল ব্যবস্থাগুলি হল: ১) ভগ্ন স্থানের হাড়গুলিকে নিশ্চল করে রাখা; ২)সকের চিকিৎসা করা অথবা সক্ নিবারণের সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা; ৩) যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা, ভঙ্গ হওয়া স্থানের হাড়গুলিকে নিশ্চল করে রাখা — যাকে বলে ইম্মবিলাইজেশন, তা এক দিকে যেমন ব্যথা কমায়, অন্যদিকে তা সক্ নিবারণের প্রধান অঙ্গ। হাড় ভাঙ্গার ভেতর, সবচেয়ে বেশী ভাঙ্গে দেহপ্রান্তের অস্থিগুলি। ঠিক মত দেহপ্রান্তের নিশ্চল অবস্থা সৃষ্টি করা, রোগীকে ওঠানো-নামানো ও হাসপাতালে পরিবহণ কালে ভাঙ্গা অস্থির খন্ডগুলির এদিক-ওদিক সরে যাওয়া নিবারিত
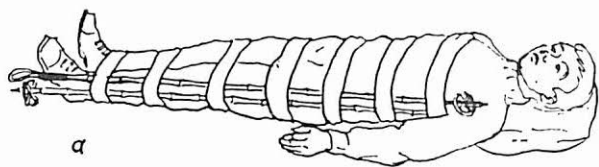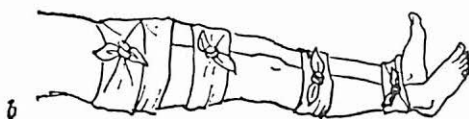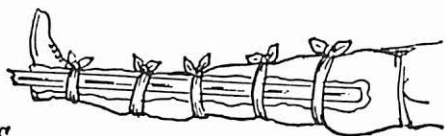
চিত্র — 56: হাতের কাছে পাওয়া জিনিষ দিয়ে দেহপ্রান্ত নিশ্চল করা

a — উরুর অস্থিভঙ্গে দুইখানা তক্তা দিয়ে নিশ্চলকরণ; b — উরুর অস্থিভঙ্গে ও জঙ্ঘার অস্থিভঙ্গে সুস্থ পায়ের সঙ্গে অনড়ভাবে বেঁধে; c — জঙ্ঘার অস্থিভঙ্গে

করে, ভাঙ্গা হাড়গুলির ধারাল ধারগুলির খোঁচায় বড় রক্তবাহী শিরা, স্নায়ু ও মাংসপেশী জখম হওয়ার বিপদ কমায় ও ভাঙ্গা হাড়ের খন্ডগুলির খোঁচায় চামড়া বিক্ষত হয়ে বদ্ধ অস্থিভঙ্গের উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে দূর করে। দেহপ্রান্তকে নিশ্চল করার জন্য ব্যবহৃত হয় পরিবহণের স্প্লিণ্ট বা হাতের কাছে পাওয়া শক্ত জিনিষ দিয়ে তখন তখন তৈরী করে নেওয়া স্প্লিণ্ট।

স্প্লিণ্ট পরাতে হয় একেবারে দুর্ঘটনাস্থলে, এবং কেবলমাত্র স্প্লিণ্ট বাঁধার পরই রোগীকে স্থানান্তরিত করা

চলে। স্প্লিণ্ট পরিয়ে বাঁধতে হয় খুবই সাবধাণে, অস্থি-খণ্ডগুলি যেন তাতে সরে না যায়, আর রোগীর যেন তাতে ব্যথা না লাগে। অস্থিখণ্ডগুলিকে সরিয়ে ঠিক জায়গায় বসানো বা সেগুলিকে মুখোমুখি আনার কোন চেষ্টা করা উচিত নয়। রোগীকে স্থানান্তরিত করতে হয় খুবই সাবধাণে, তাকে ওঠাতে-নামাতে, তার দেহপ্রান্ত ও ধড় ওঠাতে-নামাতে হয় একসঙ্গে ওদুটিকে সর্বদা একই লেভেলে বা সমতলে ধরে রেখে।

উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গে দেহপ্রান্তকে নিশ্চল করার আগে ক্ষতের চারপাশের চামড়াকে, স্পিরিট, আয়োডিন সলিউশন বা অন্য এণ্টিসেপ্টিক দিয়ে নির্বীজিত করে নিয়ে তার ওপর জীবাণুবিহীন ড্রেসিং সামগ্রী চাপা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে নিতে হয়। যদি স্টেরাইল ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সামগ্রী না থাকে, ক্ষতকে যে কোন কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেঁধে নিতে হয় — ক্ষত যেন ঢাকা থাকে। ক্ষতের ভেতর বেরিয়ে-পড়া অস্থিখণ্ডকে ছিঁড়ে বের করে নিয়ে আসা বা তাকে জায়গা মতন ঢুকিয়ে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে নেই — তাতে রক্তপাত হতে পারে ও উপরি ইনফেকশন ঢুকে পড়তে পারে অস্থি ও নরম কলার ভেতর। যদি ক্ষত থেকে বেশি রক্ত পড়তে যাকে তাহলে সাময়িক ভাবে রক্ত বন্ধ করার সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয় (চাপযুক্ত ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, টুর্নিকেট বাঁধা, ফাঁস পড়িয়ে তার ভেতর কাঠি ঢুকিয়ে তাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফাঁসের চাপ সৃষ্টি করা ও অন্যান্য ব্যবস্থা)।

নিম্ন দেহপ্রান্তকে নিশ্চল করতে সবচেয়ে সুবিধাজনক হল ডিটেরিক্স-এর, স্থানান্তরিতকরণের জন্য ব্যবহৃত

স্প্লিণ্ট; আর ঊর্দ্ধ দেহপ্রান্তের জন্য সবচেয়ে ভাল ক্রামারেরর সিঁড়ি আকারের স্প্লিণ্ট বা হাওয়া দিয়ে ফুলিয়ে ব্যবহার করার নিউম্যাটিক স্প্লিণ্ট (দেখুন তৃতীয় পরিচ্ছেদ)। যদি স্থানান্তরিত করার কোন স্প্লিণ্ট হাতের কাছে না থাকে তবে ব্যবহার করতে হয় হাতের কাছে পাওয়া জিনিষ-পত্র দিয়ে তৈরী করে নেওয়া অস্থিধারক (কাঠের পাটা, স্কি, বন্দুক, লাঠি, গাছের ডাল, পিচ-বোর্ড প্রভৃতি)। দেহপ্রান্তের অস্থিগুলিকে ভাল করে, নড়ে চড়ে না যায় এমন ভাবে নিশ্চল করা দরকার কম পক্ষে দুটি শক্ত লগা বা পরিবহণের জন্য ব্যবহৃত স্প্লিণ্ট দিয়ে, যেগুলিকে দেহপ্রান্তে লাগাতে হয় দুই উল্টো দিক থেকে। যদি তেমন কিছু হাতের কাছে না পাওয়া যায় তা হলে নিশ্চল করতে হয় আহত দেহপ্রান্তটিকে দেহের সুস্থ অংশের সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বেঁধে: — ঊর্দ্ধ দেহপ্রান্তকে বাঁধতে হয় ধড়ের সঙ্গে ব্যাণ্ডেজ বা রুমালের সাহায্যে, আর নিম্ন দেহপ্রান্তকে, সুস্থ নিম্ন দেহপ্রান্তের সঙ্গে।

গাড়িতে করে স্থানান্তরিত করতে নিশ্চলকরণের নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করতে হয়: ১) স্প্লিণ্টগুলিকে নির্ভরযোগ্য ভাবে আটকাতে হয় ও ভাল করে নড়াচড়াবিহীন করে বাঁধতে হয় সেগুলিকে অস্থিভঙ্গের অঞ্চলে; ২) স্প্লিণ্টকে কখনো খোলা দেহপ্রান্তের ওপর বাঁধতে নেই, শেষোক্তকে আগে তুলো বা ন্যাকড়া অথবা কাপড় দিয়ে জড়িয়ে নিতে হয়; ৩) ঠিক অস্থিভঙ্গের জায়গাটিকে নিশ্চল করে নিয়ে তার নিকটবর্তী ওপর ও নিচের অস্থিসন্ধি দুটিকেও নিশ্চল করতে হয় (যেমন নিম্নপায়ের অস্থি ভেঙ্গে গেলে নিশ্চল করতে হয় পায়ের

কব্জি ও হাঁটুর অস্থিসন্ধিকে) এমনভাবে ও এমন অবস্থায় যা রোগীর পক্ষে ও তাকে পরিবহণের পক্ষে সুবিধাজনক; ৪) যদি উরুর অস্থি ভাঙ্গে তা হলে নিশ্চল করে নিতে হয় নিম্ন দেহপ্রান্তের সমস্ত অস্থিসন্ধিগুলিকে।

জখম হওয়া অঙ্গটিকে ঠিকমত নিশ্চল করার ওপর সক্ ও অন্যান্য উপসর্গের আবির্ভাব নিবারণ করা, অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, অর্থাৎ এমন অবস্থায় রেখে তাকে নিশ্চল করতে হয় যে অবস্থানভঙ্গিতে রোগীর ব্যথা অনুভূতি হয় সবচেয়ে কম। অনর্থক খুব তাড়াতাড়ি ভীষণ চেঁচামেচি, রোগীর দুর্ঘটনা বিষয়ে আলোচনা তারই সামনে — এই সমস্তই রোগীর ওপর খুবই খারাপ প্রভাব বিস্তার করে। ঠান্ডা লাগা, সক্ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। তাই, রোগীকে গরম জামা-কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হয়, রোগী আরাম পায় যদি তাকে পান করতে দেওয়া হয় সামান্য ইথাইল এলকোহল, ভদকা, মদ, গরম চা ও কফি। ব্যথা কমানো যায় যদি রোগীকে ০·৫ থেকে ১ গ্রাম এনালজিন বা এমিডোপাইরিন গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। সুবিধা থাকলে দিতে হয় ব্যথাহারী ইঞ্জেকশন।

রোগীকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করার পক্ষে সবচেয়ে সুবিধাজনক হল বিশেষীকৃত এম্বুলেন্স। তা যদি না পাওয়া যায়, ব্যবহার করতে হয় যে কোন যানবাহন। যে সব রোগীদের দেহের ঊর্দ্ধপ্রান্তে হাড় ভেঙ্গেছে তাদের গাড়ীতে বসা-অবস্থাতেই পরিবহণ করা চলে। যাদের হাড় ভেঙ্গেছে নিম্ন দেহ প্রান্তের, তাদের পরিবহণ করতে হয় স্ট্রেচারের ওপর চিৎ করে শুইয়ে দেহ প্রান্তটিকে কোন জিনিষের ওপর খানিকটা উঁচু

করে রেখে। এ সব কেসে পরিবহণ করতে হয়, বিশেষ করে ওঠাতে-নামাতে হয় রোগীকে খুব যত্ন সহকারে। সে সময় মনে রাখা দরকার যে, হাড়ের ভগ্ন খণ্ডগুলি যদি এদিক-ওদিক একটুও সরে যায়, রোগী ভীষণ ব্যথা পায়। তা ছাড়াও হাড়ের খণ্ডগুলি, একটি আর একটির ওপর উঠে যেতে পারে, নরম কলা জখম করতে পারে ও তাতে করে নতুন কঠিন জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।

মাথার খুলি ও মস্তিষ্কের জখম। মাথায় বাড়ি লাগলে সবচেয়ে বিপদজনক যা হতে পারে তাহল মস্তিষ্কের জখম। মাথার খুলি না ভেঙ্গেও মস্তিষ্কের জখম হওয়া অসম্ভব নয়। মস্তিষ্কের বিভিন্ন ধরনের জখমকে, কঙ্কাশন বা মস্তিষ্কে ঝাঁকি লাগা, কণ্টিউশন বা মস্তিষ্কে চোট লাগা ও মস্তিষ্কে চাপ সৃষ্টি -- এই কয়েক ভাগে বিভক্ত করা হয়। মস্তিষ্কের কঙ্কাশনে সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কের শোথ বা ইডিমা এবং মস্তিষ্কের স্ফীতি; আর মস্তিষ্কের কণ্টিউশন ও মস্তিষ্কের ওপর চাপ সৃষ্টিতে মস্তিষ্ককলা আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মস্তিষ্ক জখম হলে কতগুলি বিশেষ লক্ষণ দেখা দেয় — মাথা ঘোরা, মাথা ব্যথা করা, বমির ভাব ও বমি হওয়া, নাড়ীর গতি মন্থর হওয়া। এই সব লক্ষণগুলির উগ্রতা নির্ভর করে মস্তিষ্কে জখমের পরিসর ও জখমের উগ্রতার মানের ওপর। সবচেয়ে বেশী হতে দেখা যায় মস্তিষ্কের কঙ্কাশন। তার মূল লক্ষণগুলি হল: সংজ্ঞা হারানো (সে সংজ্ঞাবিহীন অবস্থা কয়েক মিনিট থেকে এক দিন বা তারও বেশীক্ষণ ধরে চলতে পারে) ও স্মৃতিহীনতা — রোগী, চোট লাগার ঠিক আগের ঘটনাগুলি কিছুতেই মনে

করতে পারে না। কণ্টিউশনে বা মস্তিষ্কে চোট লাগলে অথবা তার ওপর চাপ সৃষ্টি হলে দেখা দেয় মস্তিষ্কের স্থানীয় পরিবর্তন জনিত উপসর্গগুলি — বাকশক্তি ব্যাহত হওয়া, অনুভূতিশক্তি ব্যাহত হওয়া, দেহপ্রান্তগুলির চলৎ শক্তি ব্যাহত হওয়া, ভাব প্রকাশের মাংসপেশীগুলির শক্তি ব্যাহত হওয়া ইত্যাদি।

আরো বেশী জোরের আঘাতে মাথার খুলির অস্থি ভেঙ্গে যেতে পারে। মস্তিষ্কের জখম এতে হওয়া সম্ভব আরও অনেক অনেক বেশী, কেবলমাত্র বাড়ির জোরেই নয়, ভাঙ্গা হাড়ের খণ্ড মস্তিষ্কে গেঁথে গিয়ে ও রক্তপাতের ফলে (মস্তিষ্কের ওপর জমাট রক্তের চাপে)। বিশেষ বিপদজনক মাথার খুলির উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গ। এতে মস্তিষ্ক পদার্থ বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারে এবং যা আরও বিপদজনক, মস্তিষ্কে ইনফেকশন ঢুকতে পারে।

মাথায় আঘাত লাগার পর মস্তিষ্ক কতখানি জখম হয়েছে তা ঠিক করা প্রথম মুহূর্তে খুবই কঠিন। তাই, যে সমস্ত রোগীর কঙকাশন, কণ্টিউশন বা মস্তিষ্কের ওপর চাপের উপসর্গ দেখা দিয়েছে তাদের সকলকে হাসপাতালে পাঠাতে হয় কালবিলম্ব না করে। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের কাজ — রোগীর জন্য শান্ত অবস্থা সৃষ্টি করা। তাকে শোয়াতে হয় চিৎ করে অনুভূমিক অবস্থায় ও শান্ত করার জন্য দিতে হয় এক্সট্রাক্ট ভ্যালেরিয়ান (১ থেকে ২০ ফোঁটা), জেলেনিনের ফোঁটা, মাথার রাখতে হয় বরফের ব্যাগ বা দিতে হয় ঠান্ডা জলের পটি। যদি দুর্দশাগ্রস্ত অজ্ঞান হয়ে থাকে তাহলে তার মুখ থেকে লালা, বমন পদার্থ সবকিছু পরিস্কার করে, তাকে স্থিরভাবে ভাল করে শুইয়ে, গ্রহণ

করতে হয় সেই সব ব্যবস্থা যাতে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ও হৃৎপিণ্ডের কাজ উন্নত হয় (দেখুন তৃতীয় পরিচ্ছেদ)।

মাথার খুলির উন্মুক্ত অস্থিভঙ্গে বিশেষ যত্ন নিতে হয় যাতে ক্ষতে সংক্রমণ না হয় — ক্ষতের ওপর জীবাণুবিহীন বন্ধনী সামগ্রী চাপা দিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হয়।

রোগীকে হাসপাতালে পরিবহণ করার সময়, সব সময় নজর রাখতে হয় তার ওপর, কেননা বারে বারে বমি হয়ে বমন পদার্থ ফুসফুসে চলে যেতে পারে ও এসফিক্সিয়া হতে পারে।

মাথার আঘাতে, মাথার খুলির অস্থি জখম হলে ও মস্তিষ্ক জখম হলে আহতকে স্ট্রেচারের ওপর চিৎকরে শোয়ানো অবস্থায় হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। যাতে মাথার ক্ষত বর্দ্ধিত না হয় ও মাথায় বেশী রকম ঝাঁকি না লাগে, তাই চলাকালে মাথাকে নিশ্চল ভাবে ধরে রাখার জন্য মাথার তলায় তুলো ও গজ দিয়ে তৈরী করা বিরা রাখতে হয়, বা ব্যবহার করতে হয় ফু দিয়ে ফোলানো রবারের চক্র অথবা (জামা-কাপড়, কম্বল, বিচালি, বালির থলে প্রভৃতি দিয়ে) তখন তখন তৈরী করে নেওয়া অনুরূপ ব্যবস্থা। দোলনা আকারের ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েও মাথাকে নিশ্চল রাখা যায়। তাতে ব্যাণ্ডেজের পেঁচগুলিকে থুতনির তলা দিয়ে নিয়ে গিয়ে স্ট্রেচারের ডাণ্ডার সঙ্গে আটকে রাখা হয় (চিত্র — ৫৭)। মাথার পেছনে শির-নিম্নাস্থি অঞ্চলে যদি জখম হয় অথবা ঐ অঞ্চলে যদি অস্থিভঙ্গ হয় তা হলে আহতকে পরিবহণ করতে হয় কাৎ-করা অবস্থায় শুইয়ে। অনুরূপ জখম হওয়া রোগীদের খুব ঘন ঘন বমি হয়, তাই তাদের প্রতি সর্বদা লক্ষ্য রাখা
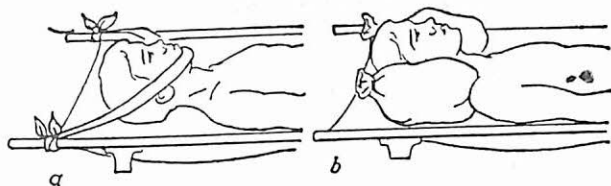
চিত্র — 57: মাথা নিশ্চলকরণ
a — অর্দ্ধচন্দ্রাকারের বন্ধনীর সাহায্যে স্ট্রেচারের সঙ্গে আটকান; b — বালি-ভরা কয়েকটি থলির সাহায্যে অনড় করা

দরকার যাতে বমন পদার্থ শ্বাসনালীতে ঢুকে রোগীর দম আটকে না যায় (এসফিক্সিয়া না হয়)।

মাথার আঘাতের রোগীরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকে। অনুরূপ রোগীদের স্থানান্তরিত করার সময় কাৎ-করা, ঝাঁকি না লাগা অবস্থায় রেখে পরিবহণ করতে হয়। এ অবস্থানভঙ্গিতে পরিবহণ করলে যেমন মাথায় ঝাঁকি কম লাগে তেমনি জিহ্বা পেছন দিকে সরে ও বমন পদার্থ শ্বাসনালীতে ঢুকে দম আটকানোর সম্ভাবনা থাকে না (চিত্র — ৫৭)। নাকের অস্থি ভাঙ্গলে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তার সঙ্গে নাক থেকে রক্তপাত হয়। অনুরূপ জখম হওয়া রোগীদেরও স্থানান্তরিত করতে হয় স্ট্রেচারে করে, তবে আধা-বসা অবস্থায় অর্থাৎ মাথাকে উন্নত অবস্থায় রেখে।

চোয়াল জখম হওয়া রোগীদের হাসপাতালে পরিবহণ করা হয় বসানো-অবস্থায়, মাথাকে একটু সামনের দিকে ঝোঁকানো অবস্থায়। কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত যদি সংজ্ঞাহীন

অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে স্থানান্তরিত করতে হয় উপুড় করে পেটের ওপর শুইয়ে, কপাল ও বুকের তলায় জামা-কাপড়, কম্বল বা অন্য জিনষ দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তৈরী করা বালিশের মত পুটুলি স্থাপন করে। এই অবস্থানভঙ্গিতে তাদের নেওয়া একান্ত প্রয়োজন এই জন্য, যাতে মুখে জমা রক্ত, লালা, অথবা পেছন দিকে সরে-যাওয়া জিহ্বা এসফিক্সিয়া সৃষ্টি করতে না পারে। পরিবহণ করার আগে চোয়ালকে নিশ্চল করে নিতে হয়: যদি ভাঙ্গে নিচের চোয়াল, তাহলে নিশ্চল করতে হয় ধনুকের মত ব্যান্ডেজ করে; আর ওপরেরর চোয়াল ভাঙ্গলে চোয়াল দুটি মাঝখানে প্লাই-উডের টুকরো অথবা স্কেল রেখে তাকে মাথার সঙ্গে ব্যান্ডেজের সাহায্যে বেঁধে।

কশেরুকাদণ্ডের অস্থিভঙ্গ। এই জখম সাধারণত হয় উঁচু থেকে নিচে পড়ে গেলে, ভারী জিনিষের নিচে চাপা পড়লে বা সোজাসুজি পিঠের ওপর জোরে আঘাত লাগলে (মোটরগাড়ীর ধাক্কা)। গ্রীবাদেশীয় কশেরুকার অস্থিভঙ্গ প্রায়ই হতে দেখা যায় কম জলে ডুব দিয়ে জলের তলার মাটিতে সজোরে মাথা ঠুকে গেলে। কশেরুকার অস্থিভঙ্গ খুবই ভয়ঙ্কর জখম। তার লক্ষণ হল সামান্যতম নড়াচড়ায় পিঠের ভীষণ ব্যথা। কশেরুকার অস্থিভঙ্গ হলে সুষুম্নাকাণ্ডে চোট লাগতে পারে (ছিঁড়ে যেতে বা চেপ্‌টে যেতে পারে)। তাতে দেহপ্রান্তগুলি অবশ হয়ে যায় (সেগুলি নিশ্চল হয়ে যায় ও অনুভূতিশক্তি হারায়)।

কশেরুকার অস্থিভঙ্গ হলে এমনকি কশেরুকার সামান্যতম স্থানচ্যুতিতেই সুষুম্নাকাণ্ড ছিঁড়ে যেতে পারে। এই কারণে

যদি সামান্যতম সন্দেহ হয় যে, কশেরুকার অস্থিভঙ্গ হয়েছে তাহলে আহতকে বসানো বা পায়ের ওপর দাঁড়-করানো একেবারে নিষেধ। সর্বপ্রথমে দরকার আহতকে কাঠের তক্তা বা ডেস্কের মতন সমান ও মসৃণ জিনিষের ওপর শুইয়ে শান্ত অবস্থা সৃষ্টি করা। ঐগুলিই ব্যবহার করতে হয় পরিবহণকালের নিশ্চল অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য। যদি ডেস্ক না থাকে এবং রোগী অজ্ঞান অবস্থায় থাকে তাহলে তাকে স্থানান্তরিত করার জন্য সবচেয়ে কম বিপদজনক হল স্ট্রেচারে উপুড় করে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া, কাঁধ দুটির তলায় ও যাথার তলায় কতগুলি বালিশ দিয়ে ঠেকা দিয়ে নিয়ে। যদি গ্রীবাদেশীয় কশেরুকাভঙ্গ হয় তাহলে পরিবহণ করা হয় চিৎ করে শুইয়ে নিয়ে মাথাকে নড়াচড়া বিহীন ভাবে আটকে রেখে যেমন করা হয় করোটির জখমে। কশেরুকার জখমে রোগীর পরিরবহণের ব্যবস্থা করতে হয় বিশেষ সাবধাণতা সহকারে। রোগীকে শোয়ানো, গাড়ীতে তোলা ও নিয়ে যাওয়ার কাজটা করতে হয় ৩-৪ জন লোক মিলে এক সঙ্গে, সব সময় রোগীর ধড়কে একই সমতলে, এক লেভেলে ধরে রেখে যাতে কশেরুকাদণ্ডের কোথাও কোন রকম বাঁক না সৃষ্টি হয়, ওঠানো-নামানোর সময় সবচেয়ে ভাল,রোগীকে ওঠানো-নামানো ঐ একই ডেস্কে বা তক্তাতে করে, যাতে সে শুয়ে আছে। শ্রোণীচক্রের অস্থিভঙ্গ হল সবচেয়ে মারাত্মক অস্থিভঙ্গ, যার সঙ্গে সঙ্গে বহু ক্ষেত্রে দেহের অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গও জখম হয় ও সৃষ্টি হয় মারাত্মক সক্। এই প্রকারের অস্থিভঙ্গ ঘটে উঁচু থেকে পড়ে গেলে, চেপ্টানো চোট লাগলে, সজোরে সোজাসুজি আঘাত লাগলে। জখমের
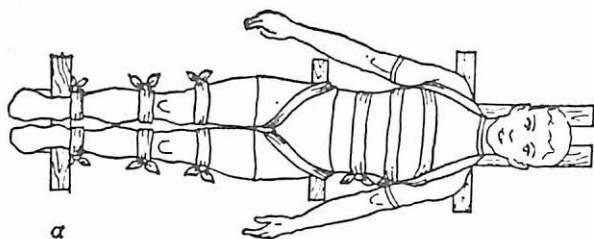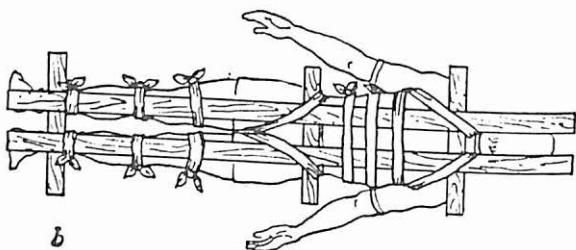
চিত্র — 58: কশেরুকার অস্থিভঙ্গে তা নিশ্চল করা
a — সামনে থেকে দেখতে; b — পেছন থেকে দেখতে

উপসর্গ হল নিম্ন দেহপ্রান্তগুলি সামান্য নড়ালে বা রোগীর অবস্থানের সামান্যতম পরিবর্তনেই মাজা-তলপেট অঞ্চলে (শ্রোণীঅঞ্চলে) অসম্ভব যন্ত্রণা।

শ্রোণীচক্রের অস্থিভঙ্গ হলে স্প্লিণ্টের সাহায্যে তা নিশ্চল করা সম্ভব নয়। তাই এসব কেসে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য হল রোগীকে এমন অবস্থানভঙ্গিতে রাখা, যাতে ব্যথা কম হয় অথবা বর্দ্ধিত হয় না এবং যে অবস্থায় ভাঙ্গা হাড়ের খণ্ডের খোঁচায় অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গের জখম হওয়ার সম্ভাবনা কম। রোগীকে শোয়ানো দরকার শক্ত জিনিষের ওপর হাঁটুদুটি ও হিপ জয়েণ্ট দুটির (শ্রোণী-উরু

অস্থিসন্ধিদ্বটির) খানিকটা ভাঁজ করা অবস্থায় ও উরুকে খানিকটা বাইরের দিকে হেলিয়ে দেওয়া অবস্থায় (যাকে বলে ব্যাঙের পোজে)। হাঁটুর তলায় রাখতে হয় শক্ত বালিশ, অথবা কম্বল, ওভারকোট, বিচালী বা অন্য জিনিষ দিয়ে তখন তখন বানিয়ে নেওয়া পুটুলি, যার উচ্চতা হবে ২৫ থেকে ৩০ সেণ্টিমিটার। খুব দরকার, সমস্ত সক্‌বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করা। স্থানান্তরিত করতে দুর্দশাগ্রস্তকে পরিবহণ করতে হয় পূর্বে উল্লিখিত পোজে স্ট্রেচারে বা তক্তার ওপর চিৎ করে শুইয়ে (দেখুন চিত্র — ৩০b)। উরু যাতে বালিশ থেকে সরে না যায়, তার জন্য ও দুটিকে কোন কিছু নরম জিনিষ দিয়ে (তোয়ালে, ব্যাণ্ডেজ বা অন্য কিছু) এক সঙ্গে বেঁধে আটকে রাখতে হয়।

পাঁজরের অস্থিভঙ্গ। পাঁজরের অস্থিভঙ্গে সোজাসুজি সজোর আঘাতে, চেপ্‌টানো আঘাতে, উঁচু থেকে নিচে পড়ে গেলে, এমনকি সজোরে কাশি বা হাঁচি দিলে। এই হাড় ভাঙ্গলে যে সব উপসর্গ দেখা দেয় তাহল হাড়ভাঙ্গা জায়গায় ভীষণ ব্যথা, যা জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিলে, কাশি দিলে, হাঁচি দিলে বা দেহের অবস্থানভঙ্গি পরিবর্তিত করলে বেড়ে যায়। অনেক পাঁজরের হাড় এক সঙ্গে ভাঙ্গলে তা এই জন্য বিপদজনক যে, তাতে দেখা দেয় ক্রমবর্দ্ধমান শ্বাস-প্রশ্বাসের অপর্য্যাপ্ততা। হাড়ের ভাঙ্গা টুকরোর ধারাল ধারের খোঁচায় ফুসফুস জখম হতে পারে যার ফলে দেখা দেয় নিউমোথোরাক্স ও প্লুরা গহ্বরে অভ্যন্তরীণ রক্তপাত।

এতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে পাঁজরের হাড়গুলির নড়াচড়া বিহীন অবস্থা সৃষ্টি করতে হয়
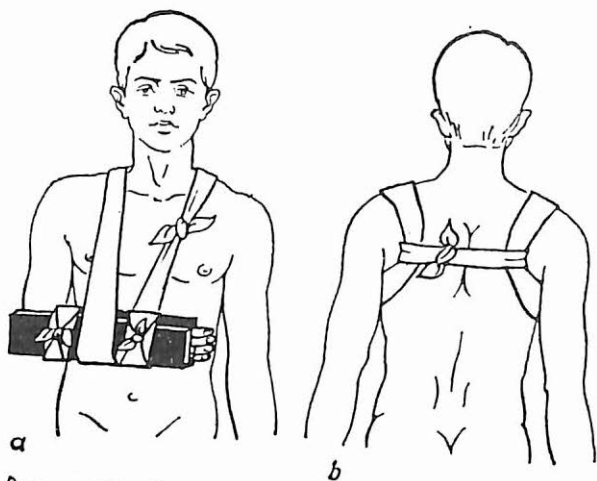
চিত্র — 59: নিম্নবাহুর অস্থিভঙ্গে (a) ও কণ্ঠাস্থিভঙ্গে (b) অঙ্গটিকে নিশ্চল করা

বুককে চক্রাকারে ব্যান্ডেজ করে। ব্যান্ডেজ না থাকলে একাজে তোয়ালে, বিছানার চাদর বা কাপড়ের টুকরো ব্যবহার করা চলে। ব্যথা কমানোর জন্য ও কাশি বন্ধ করে রাখার জন্য রোগীকে দেওয়া যায় এনালজিন, কোডেইন, এমিডোপাইরিন। সবচেয়ে কম ব্যথা অনুভূতি হয় যদি রোগীকে হাসপাতালে পরিবহণ করার সময় তাকে বসানো অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায়। গুরুতর অবস্থা হল, রোগী যখন বসে থাকতে পারে না। তখন তাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে আধা-বসা অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়।

পাঁজরের অস্থিভঙ্গের সাথে যদি জটিলতাগুলি (নিউমোথোরাক্স, হিমোথোরাক্স) দেখা দেয় তখন রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদান ও হাসপাতালে পরিবহণ

করতে হয় ঠিক সেইভাবে যেমন করা হয় বক্ষপিঞ্জরের ভেদ-করা জখমের কেসে (দেখুন সপ্তম পরিচ্ছেদ)।

অক্ষকাস্থির অস্থিভঙ্গে দেখা দেয় আঘাতের স্থানে ব্যথা এবং সে দিককার হাতের ক্রিয়াকলাপ ব্যাহত হওয়া। চামড়ার ওপর থেকেই সহজে অনুভব করা যায় অস্থি-খণ্ডের খোঁচা খোঁচা ধারাল ধারগুলি। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে করণীয় কাজের মধ্যে পড়ে, ভাঙ্গা জায়গাটির নড়াচড়াবিহীন অবস্থা সৃষ্টি করা। তা করা সম্ভব হয় হতেকে তিনকোনা বড় রুমাল দিয়ে বেঁধে আটকে রেখে (চিত্র — ৫৯) বা ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে 'ডেজো'র কায়দায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অথবা তুলো ও গজ দিয়ে বানানো গোল বিরের সাহায্যে (চিত্র-৫৯)।

দাহক্ষত ও তুষারাঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

দাহক্ষত

দাহক্ষত হল দেহের কোন জায়গায় তাপক্রিয়া বা সে জায়গার ওপর রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক বা বিকিরণক্রিয়ার ফলে কলা জখম হওয়া।

তাপদগ্ধ ক্ষত হতে দেখা যায় দেহের কোন জায়গায় সোজাসুজি উচ্চ মাত্রার তাপ লাগলে (আগুনের শিখা, ফুটন্তজল, জ্বলন্তসামগ্রী, ফুটন্ত যে কোন তরল পদার্থ)।

দাহক্ষতের জখমের গুরুত্ব বা গভীরতা নির্ভর করে তাপের প্রবলতা এবং কতক্ষণ ধরে সে তাপ কাজ করেছে, কতটুকু জায়গা দগ্ধ হয়েছে এবং দেহের কোন জায়গা দগ্ধ হয়েছে — এই সমস্তের ওপর। বিশেষ গুরুতর দাহক্ষত সৃষ্টি হয় অগ্নিশিখায় ও উচ্চ চাপ যুক্ত বাষ্পে পুড়ে গেলে। শেষোক্ত কেসে পুড়ে যেতে পারে মুখগহ্বর, নাক, শ্বাসনালী ও অন্যান্য দেহাঙ্গ, যা পরিবেশের সংস্পর্শে আসে।

সচরাচর দাহক্ষত হয় হাত, পা ও চোখে। তুলনামূলক কম দাহক্ষত হয় ধড় ও মস্তকে। দাহক্ষত যত পরিসরযুক্ত ও দাহ যতই গভীর, জীবনের পক্ষে ততই তা বিপদজনক।

গোটা দেহের উপরিভাগের ১/৩ অংশ পুড়ে গেলে তাতে শেষপর্যন্ত মৃত্যু হয়। দগ্ধ হওয়ার গভীরতার ওপর নির্ভর করে দাহক্ষতকে ৪টি মাত্রায় বা ডিগ্রীতে তফাৎ করা হয়।

প্রথম মাত্রার দাহক্ষত (এরিথেমা) — এতে দেখা দেয় চামড়া লাল হয়ে ওঠা, ফুলে ওঠা ও জ্বালা করা। এটাই হল সবচেয়ে হাল্কা দাহক্ষত যার বৈশিষ্ট্য — চামড়া স্ফীত হওয়া। স্ফীতি বেশ তাড়াতাড়ি (৩ থেকে ৬ দিনের মধ্যে) চলে যায়, কিন্তু পোড়া জায়গায় থেকে যায় এক রঞ্জিত দাগ। পরে দেখা যায় যে, সে জায়গা থেকে চামড়ার খোলস উঠে যাচ্ছে।

২য় মাত্রার দাহক্ষত (ফোস্কা পড়া) — অনুরূপ দাহক্ষতের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাতে ফুলে যাওয়ার প্রতিক্রিয়া হয় আরও জোরদার। তাতে ভীষণ জ্বালা করার সাথে সাথে চামড়া আরও বেশী লাল হয়ে ওঠে, তার এপিডার্মিস আল্গা হয়ে গিয়ে তলায় পড়ে ফোস্কা, যার ভেতর থাকে স্বচ্ছ ও সামান্য পরিমাণ ঘোলাটে জল। ২য় ডিগ্রীর দাহক্ষতে চামড়ার গভীর স্তরগুলি জখম হয় না। তাই দাহক্ষতে যদি ঘা হয়ে ইনফেকশন না হয় তাহলে ১ সপ্তাহের মধ্যেই চামড়ার সমস্ত স্তরগুলি পুনরুজ্জীবিত হয় এবং সে জায়গায় কোন ক্ষতচিহ্ন বা চল্টা সৃষ্টি হয় না। ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। ফোস্কায় যদি ইনফেকশন হয় তাহলে পুনরুজ্জীবনের প্রক্রিয়ায় ভীষণ বাধা দেখা দেয় ও শেষ-পর্যন্ত ঘা শুকায় পরোক্ষ উপায়ে, যাকে বলে সেকেণ্ড ইনটেনশনে, অনেক বেশী দিন ধরে।

৩য় ডিগ্রীর দাহক্ষতে (চামড়া মরে যায়) চামড়ার সমস্ত

স্তর বিনষ্ট হয়। চামড়ার প্রোটীণ ও রক্ত জমে গিয়ে এক চটা আকার ধারণ করে, যার তলায় থাকে জখম হওয়া ও মৃত কলা। ৩য় ডিগ্রীর দাহক্ষত সর্বদা শুকায় দ্বিতীয় টানে (সেকেন্ড ইনটেনশনে)। জখম হওয়া জায়গায় প্রথমে সৃষ্টি হয় দানা যুক্ত কলা (গ্র্যাণুলেশন টিসু), যেগুলি পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয় আঁশযুক্ত কলায়।

৪র্থ মাত্রার দাহক্ষত (পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া) — এই দাহক্ষত সৃষ্টি হয় দেহের কলার ওপর খুবই উচ্চ তাপের ক্রিয়ার ফলে (যেমন উন্মুক্ত অগ্নিশিখায়, বিগলিত ধাতু)। এটাই হল সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক রকমের দাহক্ষত যাতে দগ্ধ হয় চামড়া, মাংসপেশী, কন্ডরা, অস্থি ও দেহের অন্যান্য অংশ। ৩য় ও ৪র্থ মাত্রার দাহক্ষত শুকায় খুবই আস্তে আস্তে। অনেক ক্ষেত্রে ঐ না-শুকানো ঘা ঢাকার জন্য শেষ পর্যন্ত চামড়া পরিরোপণ করতে হয়।

দাহক্ষতে দেহে নানা বিপদজনক উপসর্গ সৃষ্টি হয়, যার কারণ এক দিকে যেমন কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের পরিবর্তন (ব্যথা জনিত সক্) অন্য দিকে তার কারণ — রক্তের ভেতরের পরিবর্তন ও বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গগুলির পরিবর্তন, বিষ ক্রিয়ার ফলে। দাহক্ষত আয়তনে যত বিস্তৃত তত বেশী জখম হয় স্নায়ুর অন্তভাগগুলি ও তত বেশী প্রকট আকার ধারণ করে আঘাত জনিত সকের লক্ষণগুলি। দাহক্ষতে অভ্যন্তরীণ দেহাঙ্গগুলির ক্রিয়াকলাপ নষ্ট হওয়ার কারণগুলি হল পোড়া জায়গার উপরিভাগ থেকে বেশী পরিমাণ রক্তের তরল পদার্থ, প্লাজমা নির্গত ও নিঃসৃত হওয়া ও পোড়া জায়গার মৃত কলার পচন জনিত মুক্ত বিষাক্ত পদার্থগুলি দেহে

শোষিত হওয়া। বিষক্রিয়া প্রকাশ পায় মাথা ধরা, সাধারণ দুর্বলতা, গাঘুলানি ও বমি হওয়ার ভেতর দিয়ে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের কাজ হল রোগীর দেহের ওপর থেকে উচ্চ তাপের ক্রিয়া বন্ধ করা। দরকার, দুর্দশা-গ্রস্তের পরিধানের পোষাক থেকে আগুন নিভিয়ে দেওয়া, রোগীকে উচ্চ তাপের অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়া, তার শরীর থেকে আগুনে জ্বলন্ত ও গরম পোষাকগুলি খুলে দেওয়া। রোগীকে উচ্চ তাপের অঞ্চল থেকে সরানো ও রোগীর ধিক ধিক করে জ্বলা ও জ্বলমান পোশাক-আসাকের আগুন নেভানোর কাজটা করতে হয় খুবই সাবধাণে যাতে অসতর্কতার জন্য তার চামড়ার সমগ্রতা কোন জায়গায় নষ্ট না হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে পোশাক-আসাক কেটে খোলাই ভাল, বিশেষ করে পোশাকের সেই জায়গাটা যেখানটায় চামড়ার দাহক্ষতের উপরিভাগের সঙ্গে সেঁটে গেছে। জামাপাকড় চামড়া থেকে টেনে খোলা নিষেধ, যেখানটা আটকে গেছে (দাহক্ষতের সঙ্গে পোশাকের), সে জায়গাটি তেমনি ভাবে রেখে তার চারধার থেকে পোশাক কেটে খুলতে হয় আর চামড়ার সঙ্গে রয়ে-যাওয়া পোশাকের অংশের ওপর দিয়েই জীবাণুবিহীন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিতে হয়। দুর্দশাগ্রস্তকে খালি গায়ে রাখা উচিত নয়, বিশেষ করে শীতের দিনে, কেননা ঠাণ্ডা লাগায় রোগীর দেহের সাধারণ অবস্থা ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ে এবং ঠাণ্ডা, সকের অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের পরবর্তী কাজ হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শুকনো জীবাণুবিহীন বা এসেপ্টিক

ব্যাণ্ডেজের সাহায্যে দাহক্ষতের জায়গাগুলি ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া, যাতে দাহক্ষতে ইনফেকশন না হয়। সেই উদ্দেশ্যে স্টেরাইল ব্যাণ্ডেজ বা বিশেষীকৃত প্যাকেটের বন্ধনী ব্যবহার বাঞ্ছনীয়। ব্যাণ্ডেজ করার জন্য বিশেষ ভাবে নির্বীজিত-করা সামগ্রী না থাকলে দাহক্ষতকে ঢাকা যায় গরম ইস্তিরি দিয়ে ইস্তিরি করা কাপড়ের টুকরো দিয়ে বা ইথাইল স্পিরিটে, ভদ্‌কাতে, এথাক্রিডিন সলিউশনে (রিভানল) অথবা পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট সলিউশনে ন্যাকড়া ভিজিয়ে, তাই দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করা চলে। অনুরূপ ব্যাণ্ডেজ খানিকটা জ্বালা কমায়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যকারীর জানা দরকার যে, দাহক্ষতের উপরিভাগের, সমস্ত রকম উপরি জখম ও তাতে ময়লা ঢোকা রোগীর পক্ষে বিপদজনক। তাই দাহক্ষতকে ধোয়ার চেষ্টা করা বা পোড়া জায়গাকে হাতে স্পর্শ করা, অথবা সূঁচ ফুটিয়ে ফোস্কার জল বের করা বা দাহক্ষতের উপরিভাগে সেঁটে যাওয়া জামা কাপড়ের অংশ টেনে আলগা করা এবং তেমনি দাহক্ষতের উপরিভাগে মলম ব্যবহার করা (ভেজেলিন, চর্বি, তেল প্রভৃতি) বা পাউডার ছিটানো কখনই উচিত নয়। মলম মাখানো বা পাউডার ছিটানো, দাহক্ষত শুকাতে বা তার জ্বালা দূর করতে কোন সাহায্যই করে না। কেবলমাত্র সাহায্য করে ইনফেকশন হতে এবং যা সবচেয়ে বিপদকর তা হল এই যে, এ সমস্তই পরবর্তী ডাক্তারী সাহায্যদান ও দাহক্ষতের প্রাথমিক সার্জিকাল পরিচর্য্যার পথে বাধা সৃষ্টি করে।

২য়, ৩য়, ৪র্থ মাত্রার বিস্তারিত দাহক্ষতে খুবই তাড়াতাড়ি সৃষ্টি হয় সকের উপসর্গগুলি। দুর্দশাগ্রস্তকে

তখন শুইয়ে দিতে হয় এমন অবস্থানভঙ্গিতে, যাতে তার জ্বালা অনুভূতি হয় সবচেয়ে কম। রোগীকে গরম কম্বল বা অন্য কিছু দিয়ে ঢেকে দিয়ে যত বেশী সম্ভব জলীয় পানীয় পান করতে দেওয়া হয়। তখনই শুরু করতে হয় সক্ বিরোধী চিকিৎসা। ব্যথা কমানোর জন্য সম্ভব হলে দিতে হয় গরম কফি, চায়ের সঙ্গে মদ মিশিয়ে, সামান্য ভদকাও পান করতে দেওয়া চলে।

দেহের অনেকখানি জায়গা যদি দগ্ধ হয় তাহলে সবচেয়ে ভাল, দুর্দশাগ্রস্তকে কাচা, ইস্তিরি-করা বিছানার চাদর দিয়ে জড়িয়ে তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে পাঠানো। পরিবহণ করার আগে দাহক্ষতগ্রস্ত রোগীকে গাড়ীতে নিশ্চল করে রাখার ব্যবস্থা করে নিতে হয়। নিশ্চলকরণের ব্যবস্থা করার সময় দেখতে হবে, রোগীর দেহের পুড়ে-যাওয়া অংশের চামড়া যেন সবচেয়ে টান করা অবস্থায় থাকে। যেমন, হাতের কনুই-এর ভাঁজের ভেতর দিক যদি পুড়ে যায় তাহলে পরিবহণ করার সময় সে হাতকে টান করা অবস্থায় রাখতে হয়, আর যদি কনুই-এর পেছনের দিকে থাকে দাহক্ষত, তাহলে তাকে পরিবহণ করার সময় হাত ভাঁজ করা অবস্থায় নিশ্চল করে রাখতে হয়। যদি দাহক্ষত থাকে হাতের পাতায় তাহলে আঙ্গুলগুলিকে রাখা হয় টান-করা অবস্থায় ইত্যাদি।

সবচেয়ে ভাল, রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা বিশেষ এম্বুলেন্সে করে, যদি তা না থাকে তা হলে যে কোন যানবাহন ব্যবহার করা চলে, রোগীকে যতদূর সম্ভব নিশ্চল ও সুবিধামত অবস্থানভঙ্গিতে রেখে। মনে রাখা দরকার যে, ঠাণ্ডায় রোগীর অবস্থা খারাপ হয় ও তা সকের

উপসর্গগুলি সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। তাই দাহক্ষত হওয়ার মুহূর্ত থেকে ডাক্তারী সাহায্য পাওয়ার আগ মুহূর্ত পর্যন্ত রোগীর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। তাকে গরম জামাকাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা ও গরম পানীয় পান করতে দেওয়া উচিত।

দেহের অনেকখানি জায়গা জুড়ে দগ্ধ-হওয়া রোগীকে গাড়িতে করে পরিবহণ করতে হয় খুবই সাবধানে, দেহের সেই অংশের উপর শুইয়ে, যে অংশ পুড়ে যায় নি (কাৎ-করে শুইয়ে, পেটের ওপর শুইয়ে ইত্যাদি)। রোগীকে নামানো-ওঠানোর সুবিধার জন্য আগে থেকেই শক্ত (ক্যানভাসের) চাদরের ওপর তার খোঁটগুলি ধরে খুব সহজেই স্ট্রেচারে স্থানান্তরিত করে বহন করা যায় এবং রোগীর তাতে বাড়তি ব্যথা অনুভূতি হয় না।

যে সমস্ত রোগীদের সামান্য জায়গায় ১ম ও ২য় মাত্রার দাহক্ষত হয়েছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সামান্য জায়গার ৩য় মাত্রার দাহক্ষত নিয়েও তারা নিজে নিজেই হাসপাতালে চলে আসতে পারে। কেবলমাত্র চোখের, যৌন অঙ্গের ও পেরিনিয়াম বা নিতম্বের দাহক্ষত ছাড়া অনুরূপ সমস্ত রোগীদের আউটডোর থেকেই চিকিৎসা করা হয়।

দাহক্ষতের রোগীদের হাসপাতালে গাড়িতে করে পরিবহণের সময় সক্ নিবারণের চিকিৎসা করা দরকার, আর যাদের সক্ ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে তাদের করতে হয় সক্ বিরোধী চিকিৎসা।

রাসায়নিক দাহক্ষত সৃষ্টি হয় দেহের ওপর কনসেণ্ট্রেটেড বা ঘন অম্লের ক্রিয়া (হাইড্রোক্লোরিক ও সালফিউরিক অম্ল, নাইট্রিক অম্ল, এসেটিক অম্ল, কার্বলিক অম্ল) ও ঘন ক্ষারের (পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড ও সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড) ক্রিয়ার ফলে এবং তাছাড়াও ফসফরাস ও অন্যান্য কতগুলি ভারী ধাতুর লবণের (সিলভার নাইট্রেট, জিঙ্কক্লোরাইড ও অন্যান্য) ক্রিয়ার ফলে।

সেই দাহক্ষতের জখমের উগ্রতা ও গভীরতা নির্ভর করে, কোন্ রাসায়নিক পদার্থ, কত তার ঘনত্ব ও কতক্ষণ সময় ধরে তা কাজ করেছে, তার ওপর। রাসায়নিক পদার্থের প্রতি কম সহনশীল হল শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, চামড়া, পেরিনিয়াম, গ্রীবাদেশ, আর বেশী সহনশীল — পায়ের তলা ও হাতের চেটো।

গাঢ় অম্লের ক্রিয়ার ফলে চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে তাড়াতাড়ি সৃষ্টি হয় শুক্নো কালো-মেটে রঙের অথবা একেবারে কালো রঙের, চার দিক থেকে ভাল ভাবে সীমাবদ্ধ চটা আর গাঢ় ক্ষারের সলিউশন হলে — ভিজে ছাই রঙের চটা, যার তেমন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা নেই।

রাসায়নিক দাহক্ষতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য নির্ভর করে, কোন্ রাসায়নিক পদার্থের ক্রিয়ায় দাহক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, তার ওপর। যদি দাহক্ষত হয় গাঢ় অম্লের ক্রিয়ার ফলে তাহলে (কেবলমাত্র সালফিউরিক অম্ল ছাড়া) পুড়ে-যাওয়া জায়গার উপরিভাগ ধুতে হয় ১৫ থেকে ২০ মিনিট ধরে ঠাণ্ডা জলের ধারায়। সালফিউরিক অম্ল জলের

সংস্পর্শে উত্তাপ নির্গত করে, যাতে জায়গাটা আরও পুড়ে যেতে পারে। ভাল ফল পাওয়া যায় ক্ষারীয় সলিউশন দিয়ে ধৌত করলে: সাবান জল, ৩% খাওয়ার সোডা সলিউশন (১ চায়ের চামচ সোডা ১ গেলাস জলে গুলে)। ক্ষারে পুড়ে যাওয়া জায়গাও প্রথমে জলের ধারায় ধুয়ে দিতে হয় ও পরে সেখানে লাগাতে হয় ২% এসেটিক অম্লের বা সাইট্রিক অম্লের সলিউশন (লেবুর রস)। এই ভাবে পোড়া জায়গার পরিচর্য্যা করে তার ওপর জীবাণুবিহীন (এসেপ্টিক উপায়ে) ব্যান্ডেজ করে দিতে হয় অথবা ব্যান্ডেজ করতে হয় ঐ সলিউশনে ভেজানো ব্যান্ডেজ দিয়ে, যে সলিউশন ব্যবহার করা হয়েছে পোড়া জায়গার পরিচর্য্যার জন্য।

ফসফরাসের দাহক্ষতের ও অম্ল বা ক্ষারে পুড়ে-যাওয়া দাহক্ষতের পার্থক্য এই যে, ফসফরাস হাওয়ায় জ্বলে ওঠে বলে সৃষ্টি হয় উত্তাপে দগ্ধ হওয়া ও রাসায়নিক পদার্থে (অম্ল) দগ্ধ হওয়া হচ্ছে মিশ্র দাহক্ষত। তাই ফসফরাসে দগ্ধ হওয়া জায়গাকে তৎক্ষণাৎ জলে ডুবিয়ে রাখতে হয় এবং জলের তলাতেই কাঠি দিয়ে, তুলো দিয়ে বা অন্য জিনিষ দিয়ে ফসফরাসের টুকরোগুলি অপসারিত করতে হয়। ফসফরাসের টুকরোগুলিকে জলের দ্রুত ধারা দিয়েও অপসারিত করা চলে। এই ভাবে জল দিয়ে ধুয়ে দগ্ধ-হওয়া জায়গার উপরিভাগে ৫% কপার সাল্ফেট সলিউশন লাগিয়ে সে জায়গাটি শুকনো স্টেরাইল ব্যান্ডেজ দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে হয়। সেই দগ্ধ হওয়া জায়গায় কিন্তু চর্বি বা মলম মাখানো নিষেধ, কেননা তাতে ফসফরাস দেহে শোষিত হয়।

চুনে পুড়ে-যাওয়া জায়গায় জল লাগাতে হয় না। চুন অপসারিত করতে হয় তেলের সাহায্যে (প্রাণীজ বা উদ্ভিজ্য তেল)। প্রথমে চুনের সমস্ত টুকরোগুলি অপসারিত করতে হয় এবং তারপর চুনে দাহক্ষত-হওয়া জায়গাটিকে গজের ব্যাণ্ডেজ দিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে ঢেকে দিতে হয়।

শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ওপর অম্ল ও ক্ষারের ক্রিয়া, বিশেষ করে তা পান করলে যে ক্রিয়া হয়, সে সম্বন্ধে পরে বলা হয়েছে "গাঢ় অম্ল ও ক্ষারের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক সাহায্য" নামক আলোচনা বিভাগে।

তুষারাঘাত

নিম্ন তাপের ক্রিয়ার ফলে কলার যে ক্ষতি সাধিত হয় তাকে বলা হয় তুষারাঘাত। তুষারাঘাত হতে পারে বিভিন্ন কারণে। কতগুলি বিশেষ অবস্থায় (অনেকক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা লাগা, ভীষণ হাওয়া, বেশীরকম আর্দ্রতা, আঁট বা ভেজা জুতো পরিধান, এক অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরে থাকা, খারাপ সাধারণ অবস্থা — অসুখ, ক্ষয়প্রাপ্ত দেহ, মদ খেয়ে মাতাল অবস্থা, বেশী রকম রক্তক্ষয়, ইত্যাদি) তুষারাঘাত সহজে হয় এবং ৩ থেকে ৭ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উত্তাপেই তা দেখা দেখা দিতে পারে। দেহের দূর অঞ্চলগুলিতে — দেহপ্রান্তগুলি, নাক, কান প্রভৃতি জায়গাতেই তুষারাঘাত বেশী হতে দেখা যায়। তুষারাঘাতের স্থানে প্রথমে দেখা দেয় ঠাণ্ডা অনুভূতি, তারপর সে জায়গাটি বোধশক্তিবিহীন হয়ে পড়ে, যাতে প্রথমে অন্তর্হিত হয় ব্যথা অনুভূতি তারপর সেখানে সমস্ত রকমের অনুভূতিই অন্তর্হিত

হয়। জায়গাটি অবশ হয়ে যায় বলে বোঝাই যায় না যে নিম্ন তাপমাত্রার মান তার ক্ষতিকারক কাজ করে চলেছে। সেই কারণেই কলার ভেতর দেখা দেয় বিপদজনক অপরিবর্তনশীল পরিবর্তন।

বিপদজনকতা ও গভীরতার ভিত্তিতে তুষারাঘাতকে ভাগ করা যায় ৪ টি মাত্রা বা পর্যায়ে। কোন মাত্রার তুষারাঘাত হয়েছে তা নির্দ্ধারিত করা যায় কেবলমাত্র তখনই, আহতকে যখন গরম পরিবেশে আনা হয়েছে। এক এক সময় তা ঠিক ভাবে নির্দ্ধারণ করতে কয়েকদিন সময় লাগে।

প্রথম মাত্রার তুষারাঘাতের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাতে দেখা দেয় কেবলমাত্র চামড়ার রক্তপ্রবাহের পরিবর্তনশীল অবস্থা। এতে আহতের চামড়া ফ্যাকাশে রঙ ধারণ করে ও চামড়া ফুলে যায়, তার বোধশক্তি কমে যায় বা একেবারে অন্তর্হিত হয়। গরমের পরিবেশে আনার পর রোগীর চামড়া নীলচে লাল রঙ ধারণ করে, তার ফুলো ভাবটা বাড়ে ও এ সময় তুষারাঘাত প্রাপ্ত জায়গাটিতে, অনেক সময় অনুভূত হতে থাকে ব্যথা ব্যথা ভাব। চামড়ার এই স্ফীতি, কয়েক দিন থাকে তারপর আস্তে আস্তে চলে যায়। আরও পরে দেখা যায় যে, সে জায়গার চামড়া থেকে খোসা উঠে যাচ্ছে ও জায়গাটি চুলকোচ্ছে, তুষারাঘাতের জায়গাটি বহু ক্ষেত্রে থেকে যায় খুবই শীত-কাতর।

২য় মাত্রার তুষারাঘাতে চামড়ার উপরিভাগের কতগুলি স্তর বিনষ্ট হয়। রোগীকে গরম পরিবেশে নিয়ে আসার পর তার ফ্যাকাশে হয়ে-যাওয়া চামড়া লাল্‌চে নীল রঙ ধারণ করে। তুষারাঘাতের জায়গাটি ও তার চারপাশও

তাড়াতাড়ি ফুলে ওঠে। সেখানে চামড়ার ওপর দেখা দেয় ফোস্কা, যাতে থাকে স্বচ্ছ বা সাদা রঙের জলীয় পদার্থ। জখম হওয়া জায়গাটির চামড়ার রক্তপ্রবাহ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় খুবই আস্তে আস্তে। সেখানকার বোধশক্তির অভাব অনেক দিন ধরে চললেও রোগী জায়গাটিতে ভীষণ ব্যথা অনুভব করে।

এই ডিগ্রীর তুষারাঘাতের উপসর্গগুলির বৈশিষ্ট্য হল যে, এতে কাঁপুনি দিয়ে জ্বর ওঠে, রোগীর ক্ষুধা ও ঘুম কমে যায় এবং এর পর যদি জখমের জায়গায় ইনফেকশন না হয় তা হলে সেখানকার বিনষ্ট হয়ে-যাওয়া চামড়ার স্তরগুলি আস্তে আস্তে (১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যেই) খোলস আকারে খসে পড়ে, সেখানে কোন দানাযুক্ত কলা বা চল্টা সৃষ্টি হয় না। সেখানকার চামড়া কিন্তু অনেক দিন ধরে কম বোধশক্তি সম্পন্ন হয়ে নীলচে রঙ ধারণ করে থাকে।

৩য় ডিগ্রীর তুষারাঘাতে রক্ত সরবরাহ বন্ধ হওয়ার ফলে (রক্তবাহী শিরাগুলির থ্রম্বোসিস) চামড়ার সমস্ত স্তর ও বিভিন্ন গভীরতায় অবস্থিত নরম কলা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কতখানি গভীরতা পর্যন্ত কলা নষ্ট হয়েছে তা ধরা পরে আস্তে আস্তে। প্রথম দিনগুলিতেই দেখা যায় যে, চামড়া নষ্ট হয়ে গেছে — তাতে দেখা দেয় কতগুলি কাল্চে লাল ও কালচে ধূসর রঙের জলযুক্ত ফোস্কা। নষ্ট হয়ে-যাওয়া জায়গার চার পাশে দেখা দেয় স্ফীত হওয়া কলার সীমানা-সূচক লাইন। গভীরের কলা যে নষ্ট হয়েছে তা ধরা পড়তে ৩ থেকে ৫ দিন সময় লাগে, যখন দেখা দেয় নষ্ট হওয়া কলার ভেজা গ্যাংগ্রীন বা পচন। তুষারাহত স্থানটির

কলাগুলির কোন বোধশক্তি থাকে না তবে রোগী ভীষণ ব্যথায় কষ্ট পায়।

এই মাত্রার তুষারাঘাতের সাধারণ উপসর্গগুলি আরও অনেক প্রকট ভাবে প্রকাশ পায়। এর বিষক্রিয়ার উপসর্গগুলি হল ভীষণ কাঁপুনি ও ভীষণ ঘাম হওয়া, এতে শরীরের সাধারণ অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে, দেখা দেয় পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীনতা।

৪র্থ মাত্রার তুষারাঘাতের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাতে কলার সমস্ত স্তরগুলি এমনকি অস্থি পর্যন্ত মৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। জখমের এই গভীরতার জন্য দেহের জখম হওয়া অংশটিকে গরম করে তোলা সম্ভব হয় না, জায়গাটি রয়ে যায় ঠান্ডা ও একেবারে বোধশক্তিবিহীন। চামড়ার ওপর তাড়াতাড়ি কালো জলে ভর্তি বহু ফোস্কা দেখা দেয়। জখম হওয়া জায়গার সীমানা বা পরিসর বোঝা যেতে আরম্ভ করে বেশ কয়েকদিন পর থেকে। তুষারাঘাতের সীমানাসূচক লাইন পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে ১০ দিন থেকে ১৭ দিন পর। তুষারাহত অঞ্চলটি তাড়াতাড়ি কালো হয় ও শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করে (যাকে বলে মামিফিকেশন)। দেহপ্রান্তের মৃত স্থানটির আল্‌গা হয়ে ঝরে যাওয়ার প্রক্রিয়া চলে দেড় মাস থেকে ২ মাস পর্যন্ত, তারপর ঘা শুকায় খুবই আস্তে আস্তে, যেন কিছুতেই শুকাতে চায় না।

এই সময় রোগীর সাধারণ অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে পড়ে, বিভিন্ন দেহাঙ্গে দেখা দেয় বিকৃতিযুক্ত ক্ষয়ের চিহ্ন (ডিষ্ট্রফি)। সর্বক্ষণের জন্য স্থায়ী ব্যথা ও বিষক্রিয়া রোগীকে দুর্বল ও শীর্ণ করে ফেলে, রক্তের উপাদানে

পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় ও রোগীরা সহজেই অন্যান্য অসুখে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

তুষারাঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের কাজ হল অনতিবিলম্বে দুর্দশাগ্রস্তকে গরম পরিবেশে নিয়ে আসা, বিশেষ করে তুষারাঘাতের জায়গাটিকে গরম করা। এরই জন্যে যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি তাকে গরম কামরার ভেতর নিয়ে আসতে হয়। সর্বাগ্রে উত্তপ্ত করার চেষ্টা করতে হয় দেহের তুষারাহত অঞ্চলটিকে ও তাতে রক্ত চলাচল পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এ কাজ সবচেয়ে ভাল ও বিপদবিহীন ভাবে করা যায় গরম জলে জায়গাটি ডুবিয়ে রেখে (২০ থেকে ৩০ মিনিট ধরে) এবং সে জলের উত্তাপ আস্তে আস্তে ২০° থেকে ৪০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত বর্দ্ধিত করে। এই জলের সেক্ দেওয়ার সময় দেহপ্রান্তটিকে সাবান দিয়ে ভাল করে ধুয়ে সমস্ত ময়লা পরিষ্কার করে ফেলতে হয়।

জলে ডুবিয়ে সেক দেওয়ার পর তুষারাহত জায়গাটিকে মুছে শুকিয়ে তাকে ব্যাণ্ডেজ করে গরম কিছু দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। তুষারাহত অংশে চর্বি ও মলম মাখাতে নেই, কেননা তাতে তার ওপর পরবর্তী প্রাথমিক পরিচর্য্যা খুবই কঠিন হয়। তুষারাহত অংশের ওপর বরফ ঘষাও উচিত নয় কেননা জায়গাটিতে তাতে ঠাণ্ডার ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় ও বরফকণিকার ঘষায় চামড়া জখম হয়ে সেখানে ইনফেকশনের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়।

নাক, কানের মত দেহের খুবই সীমাবদ্ধ জায়গায় ১ম মাত্রার তুষারাঘাত হলে, প্রাথমিক সাহায্যদানকারী নিজের

হাতের গরমের সাহায্যে বা গরম জলের ব্যাগের সাহায্যে সে জায়গা গরম করে তুলতে পারে।

দেহের ঠান্ডায় জমে যাওয়া অংশটিকে সজোরে হাত দিয়ে ঘষা বা মালিশ করা উচিত নয়, কেননা ২য়, ৩য় বা ৪র্থ মাত্রার তুষারাঘাত হয়ে থাকলে, এতে সেখানে রক্তবাহী শিরাগুলির জখম হওয়ার সম্ভাবনা বেশী, যা আপন ক্ষেত্রে সে শিরাগুলিতে থ্রম্বোসিস হওয়ার বিপদ বৃদ্ধি করে তুষারাঘাতে কলা জখমের গভীরতা বাড়িয়ে তোলে।

তুষারাঘাতে প্রাথমিক সাহায্য দিতে, তুষারাহতকে গরম জায়গায় এনে সাধারণ ভাবে তাকে গরম করে তোলার সার্থকতা খুবই বেশী। রোগীকে গরম কফি, চা বা দুধ পান করতে দেওয়া হয়। তুষারাহতকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করাও এক প্রাথমিক সাহায্য। গাড়িতে করে স্থানান্তরিত করার সময় লক্ষ্য রাখা দরকার, তুষারাহত যেন পুনর্বার ঠান্ডায় কষ্ট না পায়।

যদি এম্বুলেন্স আসার আগ পর্যন্ত রোগীকে কোন প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া না হয়ে থাকে, তাহলে তা দিতে হয় গাড়ীতে, পরিবহণ করা কালে।

ঠান্ডায় জমে যাওয়া অবস্থা

ঠান্ডায় জমে যাওয়া অবস্থা সৃষ্টি হয় যখন ঠান্ডা লাগে গোটা শরীরে। এই অবস্থা হয় সেই সমস্ত লোকেদের যারা ভীষণ ঠান্ডার ভেতর পথ হারিয়ে ফেলে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ঠান্ডায় জমে যায় তারা, যারা মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় ঠান্ডার ভেতর ছিল।

ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ার সময় প্রথমে দেখা দেয় ভীষণ হয়রান হওয়ার অনুভূতি, নড়চড়ার শক্তি বিহীনতা, ঘুম ঘুম ভাব, পারিপার্শ্বিকের প্রতি উদাসীনতা। দেহের উত্তাপ কয়েক ডিগ্রী নেমে গেলে দেখা দেয় মূর্ছা বা অচেতন অবস্থা। আরও বেশীক্ষণ ধরে ঠাণ্ডা ক্রিয়া করলে শীঘ্রই বন্ধ হয়ে যায় শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া ও রক্তপ্রবাহ।

এ সব কেসে দুর্দশাগ্রস্তকে সর্বাগ্রে নিয়ে আসতে হয় গরম ঘরের ভেতর, তারপর আরম্ভ করতে হয় তাকে আস্তে আস্তে গরম করে তোলার কাজ। সবচেয়ে ভাল তাকে ঘরে গরম জলে শুইয়ে গরম করা। একই সঙ্গে সাবধাণে করতে হয় তার দেহের সর্বাঙ্গের মালিশ ও সেই সময় জলের উত্তাপ একটু একটু করে বর্দ্ধিত করে নিয়ে যেতে হয় ৩৬ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত। যখন দেখা যায় চামড়া গোলাপী রঙ ধারণ করছে ও দেহপ্রান্তগুলির অসাড় ভাব চলে যাচ্ছে, তখন আরম্ভ করা হয় তাকে পুনরুজ্জীবিত করার সমস্ত ব্যবস্থা: কৃত্রিম শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা, হৃৎপিণ্ড মালিশ করা। রোগীর স্বয়ংপরিচালিত শ্বাসপ্রশ্বাস ও জ্ঞান ফেরামাত্র তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গরম কম্বল দিয়ে ঢেকে দিতে হয় ও পান করতে দিতে হয় গরম কফি, চা বা দুধ। যদি দেখা যায় যে, দেহের অন্তভাগগুলির কোথাও তুষারাঘাত হয়েছে তাহলে তার জন্য প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হয়। দুর্দশাগ্রস্তকে হাসপাতালে পাঠানো অবশ্য প্রয়োজন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

দুর্ঘটনা ও আকস্মিক রোগে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য

দুর্ঘটনা ও আকস্মিক প্রকট রোগে অনেক সময় সামান্য সময়ের মধ্যে দেহে এমন উপসর্গ ও পরিবর্তন দেখা দেয় যা তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কারণ হয়ে ওঠে। এই সব প্রকট রোগ ও হঠাৎ হওয়া জখমের পরিণতি অনেক পরিমাণে নির্ভর করে ঘটনাস্থলে সময়মত ও সঠিক ভাবে পূর্ণ প্রাথমিক সাহায্য দানের ওপর।

বিদ্যুতাঘাত ও বজ্রাঘাত

উচ্চ শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহের ক্রিয়ার ফলে অথবা বজ্র — যা হল আসলে প্রাকৃতিক বৈদ্যুতিক ডিস্চার্য, ক্রিয়ার ফলে যে জখম সৃষ্টি হয় তাকে বলে বিদ্যুতাঘাত।

বিদ্যুৎ-আঘাত দেহের যেমন স্থানীয় তেমনি সাধারণ ক্ষতি সৃষ্টি করে। স্থানীয় পরিবর্তন প্রকাশ পায় বৈদ্যুতিক প্রবাহের নির্গমনের স্থানটির ও প্রবেশস্থলের দাহক্ষতের ভেতর দিয়ে। আঘাতপ্রাপ্তের বিভিন্ন অবস্থার উপর নির্ভর করে (আঘাত প্রাপ্তের চামড়ার জলসিক্ত অবস্থা, তার হয়রান অবস্থা, ভীষণ রুগ্ন অবস্থা ও আরও অন্যান্য) ও বিদ্যুৎ

প্রবাহের শক্তি ও তীব্রতার ওপর নির্ভর করে বিদ্যুতাঘাতে নানা রকমের স্থানীয় পরিবর্তন সৃষ্টি হতে পারে (স্থানীয় বোধশক্তিহীনতা থেকে আরম্ভ করে গভীর গর্তের মত দাহক্ষত)। এতে চামড়ার ওপর যে পরিবর্তন হয় তা মনে করিয়ে দেয় ৩য় ও ৪র্থ মাত্রার দাহক্ষতের কথা। এতে আগ্নেয়গিরির মুখের মত দেখতে গভীর জখম সৃষ্টি হয় যার ধারগুলি কড়া-পড়া ধূসর হলদে রঙের। এক এক সময় জখম এত গভীর হয় যে তা অস্থি পর্যন্ত চলে যায়। অত্যধিক তীব্রতা যুক্ত বৈদ্যুতিক প্রবাহের ক্রিয়ায় এক এক সময় কলার স্তরগুলি বিভক্ত হয়ে বা ছিঁড়ে যেতে পারে বা কোন কোন সময় দেহপ্রান্ত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।

বজ্রাঘাতের জখমে যে স্থানীয় পরিবর্তন দেখা যায়, তা কারিগরি কার্যে প্রযুক্ত বৈদ্যুতিক প্রবাহের আঘাতে যে স্থানীয় জখম হয়, তারই অনুরূপ। চামড়ায় প্রায়ই দেখা দেয় গভীর নীল রঙের কতগুলি দাগ, যা মনে করিয়ে দেয় শাখা-প্রশাখাযুক্ত বৃক্ষের চিত্র। দাগগুলির কারণ স্থানীয় রক্তবাহী শিরাগুলির স্ফীতি।

বৈদ্যুতিক আঘাতে সাধারণ উপসর্গগুলি তুলনামূলক-ভাবে অনেক বেশী ভয়ংকর। এতে স্নায়বিক কোষগুলি জখম হওয়ার ফলে দেখা দেয় কতগুলি মারাত্মক উপসর্গ: অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, দেহের উত্তাপ কমে যাওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হওয়া, হৃৎপিণ্ডের কাজের গভীর দুর্বলতা দেখা দেওয়া, অবশ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। মাংসপেশীগুলির টৌনিক সংকোচনের ফলে এক এক সময় দুর্দশাগ্রস্তকে বৈদ্যুতিক তার থেকে সরিয়ে আনাই কঠিন হয়। বৈদ্যুতিক

আঘাতের মুহূর্তে আহতের অবস্থা এমন সাংঘাতিক হতে পারে যে বাইরে থেকে বোঝা শক্ত, সে মরে গেছে না বেঁচে আছে। চামড়া ধারণ করে ফ্যাকাশে রঙ, চোখের মণি স্ফীত হয় এবং তা আলোর প্রতি প্রতিক্রিয়া করে না, শ্বাস-প্রশ্বাস ও নাড়ী বন্ধ হয়ে যায় — একেবারে ঠিক যেন মৃত। কেবল মাত্র গভীর মনোযোগের সাথে শুনলে, শোনা যায় হৃৎপিন্ডের ধুকধুকানির আওয়াজ, যা প্রমাণ করে যে, বিদ্যুতাহত বেঁচে আছে।

অধিকতর হাল্কা বিদ্যুতাঘাতের সাধারণ উপসর্গগুলির মধ্যে পড়ে মূর্ছা যাওয়া, স্নায়বিক তন্ত্রের ওপর বেশী রকম ঝাঁকি লাগার উপসর্গ, মাথাঘুরানি, সাধারণ দুর্বলতা।

বজ্রাঘাতের সাধারণ উপসর্গগুলি এর চেয়ে যথেষ্ট উগ্র। তার বৈশিষ্ট্য — অবশ হয়ে যাওয়া, শ্রবণ ও বাকশক্তি হারান, শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানে অন্যতম প্রধান কাজ হল অবিলম্বে বিদ্যুৎপ্রবাহ ব্যাহত করা। তা করা সম্ভব হয় বিদ্যুৎপ্রবাহ একেবারে বন্ধ করে দিয়ে (প্রধান সুইচের হাতল ঘুরিয়ে, সুইচ বন্ধ করে, ফিউজ খুলে নিয়ে, বিদ্যুৎ পরিবাহী তার বিচ্ছিন্ন করে), দুর্দশাগ্রস্তের গা থেকে বিদ্যুতের তার অপসারিত ক'রে (শুকনো দড়ি, লাঠির সাহায্যে), বিদ্যুতের তারকে মাটির সঙ্গে যুক্ত করে বা তার দিক পরিবর্তন করে (বিদ্যুত পরিবাহী দুই তার একত্রে সংযুক্ত করে)। তাদের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ না করে এবং রক্ষা ব্যবস্থার সাহায্য না নিয়ে খালি হাতে বিদ্যুতাহতকে স্পর্শ করা বিপদজনক। বিদ্যুতাহতকে বিদ্যুতের তার থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খুব ভাল করে তাকে

পরীক্ষা করতে হয়। স্থানীয় জখম যা হয়েছে তার পরিচর্য্যা করতে হয় এবং দাহক্ষতের মতই সে স্থানটিকে ব্যান্ডেজ ক'রে ঢেকে দিতে হয়।

যদি জখমের সঙ্গে হাল্কা সাধারণ উপসর্গ দেখা দেয় (মূর্ছা যাওয়া, সামান্য সময়ের জন্য জ্ঞান হারান, মাথা ঘোরা, মাথা ধরা, হৃৎপিন্ড অঞ্চলে ব্যথা করা) তা হলে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের কাজ হল রোগীর জন্য শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা ও রোগীকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর ব্যবস্থা করা। মনে রাখা দরকার যে, আহতের সাধারণ অবস্থা ঘণ্টা খানেকের মধ্যে হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়তে পারে, দেখা দিতে পারে হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীতে রক্ত সরবরাহের গন্ডগোল (স্টেনোকার্ডিয়া বা হৃৎপিন্ডের ব্যথা ও হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশন) ও তৎপরবর্তী সকের অবস্থা (যাকে বলা হয় সেকেন্ডারি বা পরোক্ষ সক্) ইত্যাদি। অনুরূপ অবস্থা এক এক সময় তাদের মধ্যেও দেখা যায়, যাদের বিদ্যুতাঘাতের জখমে দেখা দিয়েছিল খুবই হাল্কা সাধারণ উপসর্গ (মাথা ধরা, সাধারণ দুর্বলতা)। এই কারণেই, যাদেরই বিদ্যুতাঘাত হয়েছে, সকলকেই হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত।

প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে দেওয়া চলে ব্যথা কমানোর ওষুধ (এমিডোপাইরিন ০·২৫ গ্রাম, এনালজিন ০·২৫ গ্রাম), শান্ত করার ওষুধ (বেখটেরেভের মিকশ্চার, ভ্যালেরিয়ানের নির্য্যাস, মেপ্রোটান ০·২-০·৪ গ্রাম), হৃৎপিন্ডের কাজ ভাল করার ওষুধ (জেলেনিনের ফোঁটা ইত্যাদি)। রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয় শোয়ানো অবস্থায় গরম বস্ত্র দিয়ে ঢেকে।

গাড়িতে করে বহন করা কালে এরকম রোগীর প্রতি তীক্ষ্ন দৃষ্টি রাখতে হয় কেননা এমন রোগীর যে কোন সময় শ্বাস-প্রশ্বাস বা হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে। পথে তাড়াতাড়ি ও কার্য্যকরি ভাবে সাহায্য দানের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকতে হয়।

যদি এমন সব সাধারণ উপসর্গ দেখা দেয় যে, শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে বা শ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, সৃষ্টি হচ্ছে মৃতবৎ অবস্থা, প্রাথমিক সাহায্যের মধ্যে তখন একমাত্র কার্য্যকরি ব্যবস্থা হল কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা। এক এক সময় তা পরিচালনা করতে হয় এক সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা ধরে। হৃৎপিন্ডের কাজ চলতে থাকলে এমতাবস্থায় কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা দ্রুত রোগীর অবস্থা উন্নত করে, চামড়ার রঙ স্বাভাবিক হয়ে ওঠে, হাত দিয়ে নাড়ী অনুভব করা যেতে পারে, রক্তের চাপ মাপার উপযুক্ত হয়। মিনিটে ১৬ থেকে ২০ বার করে মুখ থেকে মুখে নিশ্বাস পরিচালনা করার উপায়টিই সবচেয়ে কার্য্যকরি কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করার উপায়। মুখ থেকে মুখে নিশ্বাস পরিচালনা করতে বেশী সুবিধাজনক হল সে কাজে টিউব ব্যবহার করা বা হাওয়া পরিচালনা করার বিশেষ টিউবের সাহায্য নেওয়া। সিলভেস্তার বা শেফারের উপায় অবলম্বন করেও কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা চলে, তবে সেগুলি তেমন কার্য্যকরি নয় (দেখুন পঞ্চম পরিচ্ছেদ)।

সম্ভব হলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিন্ডের কাজ উত্তেজিত করার ওষুধও দেওয়া দরকার (২ থেকে ৪ সি.সি. কর্ডিয়ামিন মাংসপেশী বা শিরার

ভেতর ইঞ্জেকশন করা, ১ সি.সি. ১০% কেফিন সলিউশন, ১ সি.সি. ৫% এফেড্রিন সলিউশন ইঞ্জেকশন করা)। রোগীর জ্ঞান ফিরলে তাকে জল, চা, ফলের রস ইত্যাদি অনেক পরিমাণে পান করতে দেওয়া দরকার ও গরম বস্ত্রে ঢেকে দেওয়া দরকার। মদ্য বা কফি পান করতে দেওয়া একেবারে নিষেধ।

চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে গাড়িতে করে স্থানান্তরিত করার সময় রোগী যদি অজ্ঞান অবস্থায় থাকে বা ভাল করে নিজে নিজে নিঃশ্বাস নিতে না পারে; তাহলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা বন্ধ করতে নেই, তা নিয়মমত চালিয়ে যেতে হয় অনেক ঘণ্টা ধরে।

হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হলে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া আরম্ভ করতে হয় অর্থাৎ তা বন্ধ হওয়ার প্রথম ৫ মিনিটের মধ্যে, যে সময় তখনও বেঁচে থাকে মস্তিষ্কের ও সুষুম্নাকাণ্ডের স্নায়ুকোষগুলি। সে সাহায্যের মধ্যে পড়ে একই সঙ্গে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা ও বুকের বাইরে থেকে মিনিটে ৫০ থেকে ৭০ বার গতিতে হৃৎপিণ্ড মালিশ করা। মালিশ কার্যকরি হচ্ছে কিনা তার বিচার করতে হয় ক্যারটিড ধমনীগুলিতে নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যাচ্ছে কি না তাই দিয়ে। কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করার সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ড মালিশ করতে, প্রতিবার ফুসফুসে হাওয়া প্রবেশ করানোর সঙ্গে সঙ্গে ৫-৬ বার করে হৃৎপিণ্ড অঞ্চলে চাপ দিতে হয়, প্রধানতঃ প্রশ্বাসের সময়। হৃৎপিণ্ডের মালিশ ও কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা সুপারিশ করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ

সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে অথবা নিশ্চিত মৃত্যুর উপসর্গগুলি দেখা দিচ্ছে। সম্ভব হলে হৃৎপিন্ড মালিশের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিন্ডের ক্রিয়া উন্নত করার ওষুধও প্রয়োগ করতে হয় (১ থেকে ২ সি.সি. কর্ডিয়ামিন ও এড্রিনালিন সলিউশন, ১ থেকে ৩ সি.সি. কেফিন, কোরাজল ও অন্যান্য ওষুধ)।

বজ্রাহতকে মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা কখনই উচিত নয়। মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা, বাড়তি অসুবিধা সৃষ্টি করে: তা দুর্দশাগ্রস্তের শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ায় বাধা সৃষ্টি করে(যদি তা আদৌ থেকে থাকে), তাতে তার ঠান্ডা লাগে, রক্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টি হয় এবং এ সবের চেয়ে যা আরও মূল্যবান, এতে সত্যিকারের সাহায্য দান বিলম্বিত হয়।

জলে নিমজ্জিত হওয়া, শ্বাসরোধ হওয়া ও মাটির ধ্বসে চাপা পড়া

ফুসফুসে অম্লজান ঢোকা সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়ার অবস্থাকে বলে এসফিক্সিয়া। এতে খুবই তাড়াতাড়ি, ২ থেকে ৩ মিনিটের মধ্যেই দেখা দেয় অন্তিম অবস্থা। ফুসফুসে গ্যাস বিনিময় বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ মস্তিষ্কের কোষগুলিতে অম্লজান পেঁাছানো থেমে যায়, সৃষ্টি হয় অম্লজান ক্ষুধা ও মানুষ জ্ঞান হারায়। আরও কিছুক্ষণ পরে মস্তিষ্কের মৃত্যু হওয়ার ফলে ও অম্লজানের ক্ষুধার কারণে থেমে যায় হৃৎপিন্ডের কাজ এবং মানুষের মৃত্যু হয়। এসফিক্সিয়া সৃষ্টি হয় শ্বাসপথের ওপর চাপ পড়লে (গলা টিপে ধরলে, ফাঁস লাগালে), বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গলা ও শ্বাসনালীর

ওপর চাপ পড়লে (দম আটকে যাওয়াতে), শ্বাসপথ জলে ভরে উঠলে (জলে নিমজ্জিত হলে) অথবা তা শ্লেষ্মা, বমনপদার্থের দলা, মাটি প্রভৃতি জিনিষ দিয়ে রুদ্ধ হয়ে গেলে, বাকযন্ত্রের পথে বহিরাগত বস্তু আটকালে বা জিহ্বা পেছন দিকে ঢুকে গিয়ে তা আটকে দিলে (যেমন হয় ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করার সময়, বা অন্য কারণে মানুষ অজ্ঞান হয়ে গেলে), শ্বাস-প্রশ্বাসকেন্দ্র অবশ হয়ে গেলে; বিষ, ইথার বা কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস প্রভৃতির বিষক্রিয়া হলে), সোজাসুজি মস্তিষ্কে আঘাত লাগলে (বৈদ্যুতিক সক্, বজ্রাঘাতের জখমের ফলে)। শিশুদের মধ্যে বাকযন্ত্রের স্ফীতি জনিত এসফিক্সিয়া হওয়া বিরল নয়। সে স্ফীতির কারণ সংক্রামক ব্যাধি — ডিফথেরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, সেপ্টিক টনসিলাইটিস।

নিমজ্জিতকে জল থেকে উদ্ধার করতে, উদ্ধার করা কালে যথেষ্ট সাবধাণ হওয়া দরকার। সাঁতার কেটে নিমজ্জিতের কাছে পোঁছতে হয় তার পেছন দিক থেকে। তারপর ডুবে-যাওয়া লোকটির চুল ধরে বা তার দুই বগলতলা ধরে তাকে উল্টে তার মুখ ওপর দিকে করে সাঁতার কেটে তাকে এমনভাবে তীরে নিয়ে আসতে হয় যাতে সে আপনাকে জড়িয়ে ধরতে না পারে।

নিমজ্জিতকে, জল থেকে তোলা মাত্র প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদান করা আরম্ভ করতে হয়। দুর্দশাগ্রস্তকে উপুড় করে তার পেট রাখতে হয় সাহায্যকারীর হাঁটু ভাঁজ-করা পায়ে, উরুর ওপর এমন ভাবে যাতে তার মাথা ঝুলে পড়ে বুকের নিচে। তারপর যে কোন কাপড়ের টুকরো দিয়ে নিমজ্জিতের মুখ ও গলা থেকে মুছে বের করে দিতে হয়
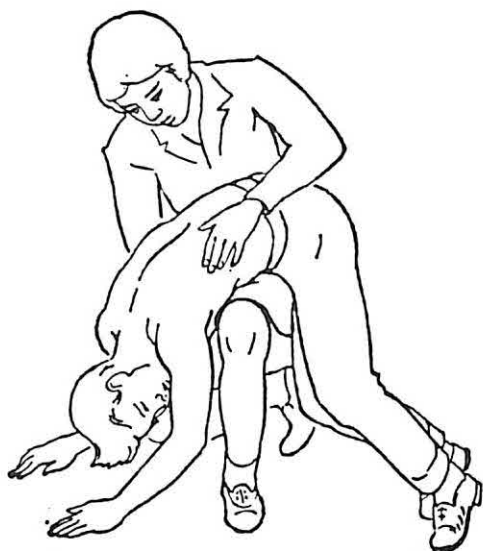
চিত্র — 60: শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ থেকে জল নিষ্কাশন করা

জল, বমন পদার্থের ঢেলা ও শেওলা (চিত্র—৬০)। এর পর কয়েকবার জোরে জোরে বুকের ওপর চাপ দিয়ে চেষ্টা করতে হয় শ্বাসনালী ও ক্লোমশাখাগুলি থেকে সমস্ত জল বের করে দিতে। মনে রাখা দরকার যে, নিমজ্জিতের শ্বাসপ্রশ্বাস কেন্দ্র অবশ হয়ে যায় ৪ থেকে ৫ মিনিটের মধ্যে কিন্তু হৃৎপিন্ডের কাজ সংরক্ষিত থাকতে পারে ১৫ মিনিট পর্যন্ত। শ্বাসের পথ থেকে জল বের করে দিয়ে শ্বাসপথকে মুক্ত করে নিয়ে দুর্দশাগ্রস্তকে শোয়ানো হয় সমতল মাটির ওপর এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ তখনও বন্ধ থাকলে আরম্ভ করা হয় কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা, তালে তালে মিনিটে ১৬ থেকে ২০ বার করে, এ কাজের জন্য

প্রচলিত কোন একটি উপায় অবলম্বন করে। যদি হৃৎপিন্ডের ক্রিয়াও বন্ধ হয়ে থাকে তা হলে একই সঙ্গে পরিচালিত করতে হয় হৃৎপিন্ডের মালিশ।

কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনাকে বেশী কার্যকরি করার জন্য দুর্দশাগ্রস্তের বুক-চাপা জামা-কাপড় খুলে দিতে হয়। কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা ও বাইরে থেকে হৃৎপিন্ড মালিশ করা চালিয়ে যেতে হয় অনেকক্ষণ পর্যন্ত — কয়েক ঘণ্টা ধরে, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজে নিজে শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়ার ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ও হৃৎপিন্ডের কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসছে অথবা নিঃসন্দেহ মৃত্যুর সমস্ত উপসর্গগুলি দেখা দিচ্ছে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া ছাড়াও সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার যাতে দুর্দশাগ্রস্তকে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো যায়।

গাড়িতে করে পরিবহণের সময় দরকার, এক সেকেন্ডের জন্যও ফাঁক না দিয়ে বিরামহীন ভাবে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করে যাওয়া ও হৃৎপিন্ড মালিশ করা।

দম আটকানোতেও এই একই রকমে প্রাথমিক সাহায্য দেওয়া হয়: প্রথমে দূর করা হয় সেই সমস্ত কারণ, যার ফলে চাপ সৃষ্টি হয়েছে শ্বাস চলাচলের পথের ওপর। মুখগহ্বর ও গলা থেকে বের করে দিতে হয় বহিরাগত বস্তু ও আরম্ভ করতে হয় কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা।

বাক্‌যন্ত্রের স্ফীতি বা ইডিমা হলে দেখা দেয় শব্দযুক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া ও শ্বাসের কষ্ট, রোগী অনুভব করে

দম আটকানোভাব, চামড়া ও শ্লৈষ্মিক আবরণী নীলাভ রঙ ধারণ করে। এতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের মধ্যে পড়ে রোগীর গলার বাইরের চামড়ার ওপর ঠাণ্ডা কম্প্রেস দেওয়া, আর পা দুটি গরম জলে ডোবানো। যদি সুযোগ থাকে তাহলে ১% ডিমিড্রল সলিউশনের ১ সি.সি. অথবা ২·৫% ডিপ্রাজিন সলিউশনের ১ সি.সি. ইঞ্জেকশন করে দিতে হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করা প্রয়োজন।

যদি বাক্‌যন্ত্রের পথ পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় ও দেখা দেয় অন্তিম অবস্থা, জরুরী অস্ত্রোপচার — "ট্র্যাকিওস্টোমি" করা (ট্র্যাকিয়া সামান্য কেটে তার ফুটোর ভেতর কোন একটি টিউব ঢুকিয়ে দেওয়া) (দেখুন পঞ্চম পরিচ্ছেদ, চিত্র— ৩৮) প্রয়োজন।

মাটির ধ্বসে চাপা পড়লে সাংঘাতিক জখম হতে পারে। বুকের ওপর ভীষণ চাপের ফলে ঊর্দ্ধমহাশিরার রক্ত অববাহিকা অঞ্চলে রক্ত চলাচলে বড় বাধা সৃষ্টি হয়। শিরা তন্ত্রের ভেতর এর জন্য যে ক্রমবর্দ্ধমান চাপ সৃষ্টি হয়, যার ফলে মুখমণ্ডল ও গ্রীবাদেশের ছোট ছোট শিরাগুলি ফেটে যায় এবং এরই সঙ্গে দেখা দেয় প্রকট শ্বাসকষ্ট। তা ছাড়াও দুর্দশাগ্রস্তকে মাটির ধ্বসের চাপের তলা থেকে উদ্ধার করার পর দেখা দিতে পারে, যাকে বলে অনেকক্ষণ ধরে চেপ্‌টে যাওয়া অবস্থায় থাকার সিন্ড্রোম বা উপসর্গগুচ্ছ। নরম কলা, বিশেষ করে অস্থি-সংলগ্ন মাংসপেশী অনেকক্ষণ ধরে চাপের তলায় চেপ্‌টানো অবস্থায় থাকলে সেগুলিতে জমা হয় শরীরের পক্ষে কতগুলি বিষাক্ত পদার্থ। চাপ অপসারিত করার পর সেই

পদার্থগুলি শোষিত হয়ে সাধারণ রক্তপ্রবাহে চলে যায় ও সৃষ্টি করে বিপদজনক বিষক্রিয়া ও অম্লাধিক্য (এসিডোসিস), নষ্ট করে হৃৎপিন্ড, বৃক্ক ও যকৃতের ক্রিয়াকলাপ। এই সব পরিবর্তনের ফলে মৃত্যু হওয়া সম্ভব।

মাটির ধ্বসের তলা থেকে উদ্ধারকৃতকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান করা হয় তার জখমের মারাত্মকতা অনুযায়ী। যদি দুর্দশাগ্রস্ত অন্তিম অবস্থায় পৌঁছে থাকে, তা হলে সর্বাগ্রে দরকার শ্বাস-প্রশ্বাস গমনের পথ পরিষ্কার করে দেওয়া। মুখগহ্বর ও গলার ভেতর থেকে মাটি বের করে তা পরিষ্কার করে নিয়ে আরম্ভ করতে হয় পুনরুজ্জীবিতকরণের ব্যবস্থাগুলি — কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করা ও বাইরে থেকে হৃৎপিন্ড মালিশ করা। ক্লিনিকাল মৃত্যুর অবস্থা থেকে প্রথমে উদ্ধার করে নিয়ে তারপরই শুধু আরম্ভ করা যায় জখমের পরীক্ষা এবং তার সেবা ও চিকিৎসা করা — দেহপ্রান্তকে নিশ্চল করা ও তাতে টুর্নিকেট বাঁধা, যদি তা জখম হয়ে থকে ও অনেকক্ষণ চাপের তলায় থাকার উপসর্গ দেখা দিয়ে থাকে, ব্যথাহারী ওষুধ ইঞ্জেকশন দেওয়া — প্রোমেডল বা অম্নাপোন। দুর্দশাগ্রস্তকে খুব তাড়াতাড়ি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়। সমস্ত কেসে, তা সে জলে নিমজ্জন সংক্রান্ত কেসই হোক বা ভারী জিনিষের তলা থেকে উদ্ধার করা চাপা-পড়ার কেসই হোক, লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন সামান্য সময়ের জন্যও সে সব রোগীর ঠান্ডা না লাগে। রোগীর দেহপ্রান্তগুলিকে গরম করা চলে তার হাত-পা শুক্‌নো হাতে হাল্কা ভাবে মালিশ করে বা তাতে যে কোন হাল্কা জ্বালা-করার ওষুধ (ক্যাম্ফর, ভিনিগার,

ভদ্‌কা, স্পিরিট, এমোনিয়া প্রভৃতি) ঘষে। গরম জলের ব্যাগ, গরম জলের বোতল দিয়ে গরম করা নিষেধ, কেননা অন্তিম অবস্থায় তাতে খারাপ ফল হতে পারে (রক্তস্রোত অন্য দিকে ধাবিত হতে পারে, দাহক্ষত হতে পারে)।

কার্বন মনক্সাইড গ্যাসের বিষক্রিয়া

কার্বন মনক্সাইড গ্যাসের বিষক্রিয়া হওয়া সম্ভব সেই সব উৎপাদন প্রতিষ্ঠানে যেখানে কার্বন মনক্সাইড গ্যাস ব্যবহৃত হয় নানা জৈব পদার্থ সংশ্লেষণের জন্য (এসিটোন, মিথাইল স্পিরিট, ফিনল ও অন্যান্য বস্তু), মোটর গাড়ির গ্যারেজে, যেখানে হাওয়া ঢোকার ব্যবস্থা খারাপ, নতুন রঙ-লাগানো ঘরে যেখানে বাতাস ঢোকে না এবং তা ছাড়াও বসতবাটীতে, যেখানে ঘর গরম করার জন্য চুল্লি ব্যবহার করা হয় — আগুন জ্বালিয়ে সময় মত সে চুল্লির খিড়কি বন্ধ না করলে।

এ বিষক্রিয়ার প্রাথমিক উপসর্গগুলি হল মাথা ধরা, মাথা ভার-ভার লাগা,বমি বমি ভাব, মাথা ঘোরা, কান ভোঁ ভোঁ করা, বুক ধড়ফড় করা। আরও কিছু পরে দেখা দেয় মাংসপেশীর দুর্বলতা, বমি। সে বিষাক্ত আবহাওয়ায় আরও কিছুক্ষণ থাকলে দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়, দেখা দেয় ঘুমের ভাব, চেতনা ঝাপসা হয়ে আসে, দেখা দেয় শ্বাসকষ্ট। এই সময়ে দুর্দশাগ্রস্তের চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, দেহে এক এক সময় দেখা যায় উজ্জ্বল লাল বর্ণের ছোপ ছোপ দাগ। এর পরও যদি নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন মনক্সাইড গ্যাস গ্রহণ করা চলতে থাকে তাহলে

শ্বাস-প্রশ্বাস অগভীর হয়ে আসে, দেখা দেয় মাংসপেশীর খিঁচুনি ও শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্র অবশ হয়ে যাওয়ার ফলে মৃত্যু। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের কাজ হল যে ঘর বা যে স্থানে রোগীর ওপর গ্যাসের বিষক্রিয়া হয়েছে সে ঘর বা সে স্থান থেকে বিষক্রিয়াগ্রস্তকে অবিলম্বে বের করে নিয়ে আসা। গরম আবহাওয়ায় সবচেয়ে ভাল তাকে বাইরে রাস্তায় নিয়ে আসা। যদি রোগীর দুর্বল অগভীর শ্বাস-প্রশ্বাস চলতে থাকে বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ একেবারে বন্ধ হয় তাহলে দরকার কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস-প্রশ্বাস পরিচালনা করতে আরম্ভ করা এবং তা পরিচালনা করা, যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজে নিজে উপযুক্ত ভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া ফিরে আসছে অথবা দেখা দিচ্ছে তার জৈব মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণ। বিষক্রিয়ার ফল দূর করতে সাহায্য করে দেহ ঘষে ঘষে মালিশ করা, পায়ে গরম জলের ব্যাগ দেওয়া, অল্প সময়ের জন্য স্পিরিট অফ এমোনিয়া (স্মেলিঙ্গ সল্টের) বাষ্প শোঁকা (ঘ্রাণ নেওয়া)। যে সব রোগীর এ গ্যাসের প্রকট বিষক্রিয়া হয়েছে তাদেরকে নিয়ে যেতে হয় হাসপাতালে কেননা এর ফলে আরও পরে ফুসফুসের ও স্নায়ু তন্ত্রের বিপদজনক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।

খাদ্যের বিষক্রিয়া

নষ্ট হয়ে যাওয়া (জীবাণুদুষ্ট) আমিষ খাদ্য (মাংস, মাছ, সসেজ জাতীয় চাপা মাংস, টিনের কৌটোয় সংরক্ষিত মাছ ও মাংস, দুধ ও দুধের তৈরী খাদ্য, ক্রিম, কুল্পিবরফ ইত্যাদি) খেলে সৃষ্টি হয় খাদ্যের বিষক্রিয়া বা খাবারের

টক্সিকো ইনফেকশন। অসুখ সৃষ্টি হয় সেই খাদ্যে অবস্থিত জীবাণুগুলির আক্রমণে ও সেই জীবাণগুলির জৈবক্রিয়ায় সৃষ্টি বিষাক্ত পদার্থের (টক্সিনের) সাহায্যে। জীবিত অবস্থাতেই পশুর মাংসপেশীতে ও মাছের গায়ে জীবাণুর ইনফেকশন ঢুকে থাকতে পারে। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে খাদ্যে ইনফেকশন প্রবেশ করে (খাদ্য নষ্ট হয়) তা তৈরী করার প্রক্রিয়ায় বা খাদ্যদ্রব্যের ত্রুটিপূর্ণ সংরক্ষণের ফলে। সহজে জীবাণুদুষ্ট হয় কুচি কুচি করে কাটা মাংস (মাংস বাটা,, ঠান্ডায় জমানো মাংসের বেনুন, কিমা ও আরও অন্যান্য খাবার)। অসুখের প্রথম উপসর্গগুলি দেখা দেয় জীবাণুদুষ্ট খাদ্য দ্রব্য খাওয়ার ২ থেকে ৩ ঘণ্টা পরে। কোন কোন ক্ষেত্রে তা দেখা দিতে পারে অনেকক্ষণ পরে — ২০ থেকে ২৬ ঘণ্টা পরে।

সাধারণত অসুখটি আরম্ভ হয় হঠাৎ। দেখা দেয় গা ম্যাজ ম্যাজ করা, গা ঘুলানি, অনেক বার বমি, পেটের ভেতর মুচড়ে মুচড়ে ব্যথা, ঘন ঘন পাতলা পায়খানা, কখনো আম ও রক্ত মিশ্রিত। তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় বিষক্রিয়ার মাদকতা যা প্রকাশ পায় রক্তের চাপ কমে যাওয়া, নাড়ীর গতি ও তার দুর্বলতা বৃদ্ধি পাওয়া, চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, পিপাসা বৃদ্ধি পাওয়া, ভীষণ জ্বর (৩৮-৪০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড) হওয়া প্রভৃতির ভেতর দিয়ে। চিকিৎসা সাহায্য না পেলে রোগীর অবস্থা বিপর্যয়কর দ্রুতগতিতে খারাপ হতে থাকে, দেখা দেয় হৃৎপিণ্ড ও রক্তশিরা তন্ত্রের অপর্যাপ্ততা, মাংসপেশীর খিঁচুনি, রোগীর দেহ অসাড় হয় ও মৃত্যু হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের মধ্যে পড়ে কালবিলম্ব না

করে পাকস্থলীর টিউবের সাহায্যে পাকস্থলী ধৌত করা অথবা কৃত্রিম উপায়ে বমন করানোর সাহায্যে — পান করতে দিতে হয় দেড় থেকে ২ লিটার গরম জল তারপর জিহ্বার শেষ অংশে চাপ দিয়ে বমন করিয়ে দিতে হয়। ধৌত করতে হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না বেরোচ্ছে পরিষ্কার জল। নিজে নিজে বমি করলেও রোগীকে অনেক পরিমাণ জল পান করতে দিতে হয়। অন্ত্রের নাড়ী থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জীবাণুদুষ্ট খাদ্য বের করে নেওয়ার জন্য রোগীকে দিতে হয় কার্বোলেন বড়ি (পাকস্থলীতে ব্যবহার্য্য কাঠকয়লা) ও জোলাপের ওষুধ (২৫ গ্রাম লবণ-জোলাপ আধ গ্লাস জলে গুলে অথবা ৩০ সি.সি. ক্যাষ্টর তেল)। এক থেকে দুই দিন মুখ দিয়ে কোন রকম খাদ্য খেতে দেওয়া নিষেধ। তবে প্রচুর পরিমাণে জল পান করার ব্যবস্থা করতে হয়। অসুখের প্রকট অবস্থায় (পাকস্থলী ধৌত করে দেওয়ার পর) গরম চা বা কফি পান করতে দিলে ভাল হয়। হাত-পায়ে গরম জলের ব্যাগ দিয়ে রোগীকে গরম করে রাখা দরকার। মুখ দিয়ে সালফানিল এমাইডের ওষুধ (সুলগিন, থ্যালাজল ০·৫ গ্রাম করে দিনে ৪ থেকে ৬ বার) বা এণ্টিবাইওটিক (লেভোমাইসেটিন ০·৫ গ্রাম করে দিনে ৪ থেকে ৬ বার, ক্লোরটেট্রাসাইক্লিন হাইড্রোক্লোরাইড ৩০০ ০০০ ইউনিট করে দিনে ৪ বার, ২ থেকে ৩ দিন) সেবন করতে দেওয়া রোগীকে রোগমুক্ত হতে সাহায্য করে। রোগীর পায়খানা ও বমন সোজাসুজি ডিসইনফেক্ট করা দরকার (বেড-প্যানের ভেতর তাতে শুকনো ব্লিচিংপাউডার মিশিয়ে)। রোগীর জন্য এম্বুলেন্স ডাকা

দরকার অথবা অন্য উপায়ে তাকে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরিত করতে হয়।

সমস্ত লোক, যারা খাদ্যের সঙ্গে সন্দেহজনক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেছে তাদেরকে ১ থেকে ২ দিন ধরে নজরে রাখা দরকার ও অনুরূপ উপসর্গ দেখা দিলে হাসপাতালে ভর্তি করা দরকার।

ব্যাঙের ছাতার বিষক্রিয়া হওয়া সম্ভব যদি বিষাক্ত অভক্ষণীয় ব্যাঙের ছাতা গ্রহণ করা হয়, আর তা ছাড়াও যদি নষ্ট হয়ে যাওয়া ভক্ষণীয় ব্যাঙের ছাতা (ছত্রাক পড়া, শ্লেষ্মাবৃত হয়ে ঘেমে ওঠা, বহু দিনের রক্ষিত ব্যাঙের ছাতা) খাওয়া হয়। সব চেয়ে বেশী বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা বিষাক্ত ফ্যাকাশে পাগানকা (death cup) — তাতে মাত্র একটি ব্যাঙের ছাতা খেলেই বিষক্রিয়া হয়ে এমনকি মৃত্যু হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, অনেকক্ষণ ধরে ফোটালেও, তাতে বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতার বিষ একটুও নষ্ট হয় না। বিষক্রিয়ার প্রথম লক্ষণ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই (দেড় থেকে ৩ ঘণ্টা) পরিলক্ষিত হয়। দ্রুত বর্দ্ধমান দুর্বলতার সঙ্গে দেখা দেয় বেশী রকম লালা নিঃসরণ, গা ঘুলানি, বারে বারে কষ্টদায়ক বমি, ভীষণ পেট-মোচড় দিয়ে কলিকের মত ব্যথা, মাথা ব্যথা, মাথা ঘুরানি। শীঘ্রই শুরু হয় পাতলা পায়খানা (বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে রক্ত পায়খানা) ও স্নায়ু তন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ: — চোখের দৃষ্টির গন্ডগোল, বিকার, দুঃস্বপ্ন, স্নায়বিক চলৎ তন্ত্রের উত্তেজনা, মাংসপেশীর খিঁচুনি ও খিল-ধরা।

বেশী রকম বিষক্রিয়ায়, বিশেষ করে ফ্যাকাশে পাগানকা (death cup) ব্যাঙের ছাতার বিষক্রিয়ায় উত্তেজনার

উপসর্গগুলি দেখা দেয় খুব তাড়াতাড়ি (৬ থেকে ১০ ঘণ্টার মধ্যে)। তার পর সে ভাব কেটে গিয়ে আসে ঘুমের ভাব, পারিপার্শ্বিকের প্রতি নির্বিকারের ভাব। এই সময় হৃৎপিণ্ডের কাজ খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে, নেমে যায় রক্তের চাপ, শরীরের উত্তাপ কমে, দেখা দেয় চোখ হলদে-হওয়া (জণ্ডিস)। রোগীকে সাহায্য না করলে দেখা দেয় দেহের অসাড়তা যা তাড়াতাড়ি মৃত্যুর কারণ হয়।

ব্যাঙের ছাতার বিষক্রিয়ায় রোগীকে বাঁচাতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য প্রায়শই বড় ভূমিকা পালন করে। প্রয়োজন, অবিলম্বে জল দিয়ে পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া আরম্ভ করা, ভাল হয় যদি পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেটের হাল্কা (গোলাপী রঙের) সলিউশন দিয়ে পাকস্থলীর টিউবের সাহায্যে তা ধোয়া হয়, না হলে কৃত্রিম বমন উদ্রেকের উপায়েও তা ধুয়ে দেওয়া চলে। এ ক্ষেত্রে উপকারী যদি সে সলিউশনের সঙ্গে যোগ করা হয় এ্যাডসর্প্যাণ্ট রেডিওএ্যাকটিভ চারকোল কার্বোলেন। তারপর দিতে হয় জোলাপের ওষুধ (ক্যাষ্টরের তেল অথবা লবণাক্ত জোলাপ), কয়েক বার নাড়ী পরিষ্কার করা, ডুসও দিতে হয়। এই সব ব্যবস্থা পরিপালনের পর রোগীকে গরম আবরণী দিয়ে ঢেকে চারপাশে গরম জলের ব্যাগ চাপা দিয়ে তাকে গরম করে রাখতে হয় ও পান করতে দিতে হয় গরম, মিষ্টি, চা ও কফি। রোগীকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা উচিত, যেখানে সে পাবে ডাক্তারী সাহায্য। এ রকম রোগীদের সকলের ডাক্তারী সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

বটুলিজম হল এক প্রকট সংক্রামক ব্যাধি যাতে

আত্মরক্ষার আবরণী সৃষ্টিকারী (স্পোর সৃষ্টিকারী), অম্লজানবিহীন অবস্থায় বংশবৃদ্ধিক্ষম (এনিরোবিক) জীবাণুর দেহ-নিসৃত বিষের ক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্র আক্রান্ত হয়। বটুলিজমকে ধরা হয় খাদ্য উদ্ভূত বিষ ও জীবাণু সংক্রমণের রোগ হিসাবে, কেননা এই রোগ সংক্রামিত হয় জীবাণুদূষিত খাদ্য গ্রহণ করলে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বটুলিজমে দূষিত হয় সেই সমস্ত খাদ্য, যেগুলিকে প্রস্তুত করতে যথেষ্ট পরিমাণে আগুনে গরম করতে হয় না। যেমন শুট্‌কি ও স্মোক্‌ড মাংস ও মাছ, স্মোক্‌ড সসেজ, অনেক দিনের পুরনো হয়ে-যাওয়া, কৌটোয় রক্ষিত মাংস, মাছ বা তরকারি ইত্যাদি। দূষিত খাদ্য ব্যবহারের পর অসুখের প্রথম লক্ষণগুলি দেখা দিতে ১২ ঘণ্টা থেকে ২৪ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। কোন কোন কেসে তা দেখা দিতে কয়েকদিন বিলম্ব হতে পারে।

অসুখটি আরম্ভ হয় মাথা ব্যথা, গা ম্যাজ ম্যাজ করা, মাথা ঘোরা — এই সমস্ত উপসর্গ নিয়ে। পায়খানা হয় না, পেট ফাঁপে। দেহের উত্তাপ তখনও থাকে স্বাভাবিক। অবস্থা এরপর খারাপ হতে থাকে। অসুখ আরম্ভ হওয়ার এক দিন পর থেকে দেখা দেয়, কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের সাঙ্ঘাতিক ভাবে আক্রান্ত হওয়ার উপসর্গগুলি: চোখে দেখা দিতে থাকে একটি বস্তুর দুই প্রতিবিম্ব, চোখ টেরা হয়ে যায়, চোখের ওপরের পাতা নিচমুখি হয়ে নেমে আসে, নরম তালু অবশ হয়ে যায় — গলার আওয়াজ অস্পষ্ট হয় ও গিলতে কষ্ট হয়। পেট ফাঁপা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়, প্রস্রাব আটকে যায়। অসুখটি তারপর তাড়াতাড়ি খারাপের দিকে যেতে থাকে ও ৫ দিনের মধ্যেই

শ্বাসপ্রশ্বাস কেন্দ্র অবশ হয়ে ও হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতার ফলে রোগীর মৃত্যু হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য, এই অসুখে দিতে হয় ঠিক তেমনি ভাবে যেমন দেওয়া হয় অন্যান্য খাদ্যের বিষক্রিয়া জনিত অসুখে: পাকস্থলী ধুয়ে দিতে হয় দুর্বল সোডিবাইকার্ব, পটাসিয়াম পার্মাঙ্গানেট সলিউশন দিয়ে এবং তার সঙ্গে এডসর্বেণ্ট এক্টিভেটেড চারকোল, কার্বোলেন যুক্ত করে, দিতে হয় জোলাপ, নাড়ী পরিস্কার করা ডুস এবং পান করতে দিতে হয় প্রচুর পরিমাণ গরম পানীয় (চা বা দুধ)।

জানা দরকার যে, এর প্রধান চিকিৎসা হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে বিশেষ এণ্টিবটুলিনিক সিরাম দেওয়া। এই কারণেই বটুলিজমের রোগীকে অনতিবিলম্বে হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া

বর্তমানে কৃষিকাজে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয় রাসায়নিক পদার্থ — বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার প্রচলন হয়েছে আগাছার বিরুদ্ধে, ফলনের অসুখের বিরুদ্ধে ও পোকার আক্রমণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য।

কৃষি কাজে ও পশুপালনে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ কী ভাবে প্রয়োগ করতে হবে সে বিষয়ে, রাসায়নিক দ্রব্যের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সরকারী কমিটি কর্তৃক ও সরকারী স্যানিটারী পরিদর্শন বিভাগ কতৃক কড়াকড়ি নিয়ম বেঁধে দেওয়া আছে। যদি সেই বিষাক্ত রাসায়নিক

পদার্থগুলি ব্যবহার করার ও সঞ্চিত রাখার উপদেশগুলি কড়াকড়ি ভাবে পালন করা যায় তাহলে জনসাধারণের ওপর তার বিষক্রিয়া কখনও ঘটতে পারে না। যদি কখনো তা ঘটে তাহলে বুঝতে হবে সে নিয়ম ভীষণ ভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিষক্রিয়া হতে দেখা যায় ফসফরাসের কম্পাউন্ডগুলি দিয়ে (থিওফস, ক্লোরফস), যা দেহে প্রবেশ করে নিশ্বাসের হাওয়ার সঙ্গে নিশ্বাসের পথে ও খাদ্যের সঙ্গে, খাদ্যে মিশ্রিত হয়ে। ওগুলি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর সংস্পর্শে এলে তাতে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী পুড়ে যেতে পারে।

এই বিষক্রিয়ার অসুখের সুপ্তাবস্থা বা ইনকিউবেশন পিরিয়ড হল ১৫ থেকে ৬০ মিনিট। তারপর দেখা দেয় স্নায়ুতন্ত্রের আক্রান্ত হওয়ার উপসর্গগুলি: বেশী রকম লালা নিঃসরণ, কফ নিঃসরণ, ঘাম হওয়া। শ্বাসের গতি বৃদ্ধি পায়, শ্বাস-প্রশ্বাসে ঘড়ঘড় আওয়াজ হতে থাকে যা দূর থেকে শোনা যায়। দেখা দেয় রোগীর অস্থিরতা ও উত্তেজনা এবং শীঘ্রই তার সঙ্গে যুক্ত হয় পায়ে খিল-ধরা ও পেটের নাড়ীর সংকোচন (Peristalsis), আরও কিছু পরে দেখা দেয় মাংসপেশীর অবশ হয়ে যাওয়া তথা শ্বাস-প্রশ্বাসের মাংসপেশীগুলির প্যারালাইসিস। শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে এসফিক্সিয়া হয়ে রোগীর মৃত্যু হয়।

বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ নিঃশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করায় বিষক্রিয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দাতার প্রধান কাজ হল দুর্দশাগ্রস্তকে অবিলম্বে গাড়ি করে হাসপাতালে পাঠানো। যদি সম্ভব হয় তাহলে রোগীকে দেওয়া দরকার ০·১% এট্রপিন সলিউশনের ৬ থেকে ৮ ফোঁটা অথবা ১

থেকে ২ টি বেলাডোনা ট্যাবলেট। যদি নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায় তাহলে বিরামহীন ভাবে চালিয়ে যেতে হয় কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা। যদি পাকস্থলী-অন্ত্রপথে বিষ প্রবেশ করে তাহলে পাকস্থলী ধুয়ে দিতে হয় জল ও তার সঙ্গে মেশানো একটিভেটেড চারকোল দিয়ে ও দিতে হয় লবণাক্ত জোলাপ।

বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থকে চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে ধুয়ে ফেলতে হয় জলের ধারা দিয়ে।

ঘনীভূত অম্ল ও ক্ষয়কারক ক্ষারের বিষক্রিয়া

ঘনীভূত অম্ল ও ক্ষয়কারক ক্ষারের বিষক্রিয়ায় (পান করলে) খুবই তাড়াতাড়ি কঠিন অবস্থার সৃষ্টি হয়। সে অবস্থার কারণ ব্যাখ্যা করা যায় প্রথমত মুখগহ্বর, গলা, খাদ্যনালী, পাকস্থলী ও অনেক ক্ষেত্রে কণ্ঠনালীর শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর বিস্তৃত অংশ পুড়ে যাওয়ার ফল হিসাবে এবং দ্বিতীয়তঃ পরে দেহের অভ্যন্তরে শোষিত ঐ পদার্থগুলির জীবনধারণের জন্য অতি প্রয়োজনীয় দেহাংশগুলির ওপর বিষক্রিয়ার ফল হিসাবে (যকৃৎ, বৃক্ক, ফসফুস, হৃৎপিন্ড)। ঘনীভূত অম্ল ও ক্ষার ভীষণভাবে কলা বিনষ্ট করার ক্ষমতা রাখে। শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী, চামড়ার চেয়ে অনেক কম সহনশীল কলা, তাই তা অনেক তাড়াতাড়ি ও অনেক গভীর ভাবে বিনষ্ট হয়।

মুখের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী ও ঠোঁটের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীতে দেখা দেয় পোড়া ঘা ও ফোস্কা। যদি পুড়ে যায় সাল্ফিউরিক অম্লে — ফোষ্কার রঙ হয় কালো ; নাইট্রিক

অম্লে, ফোস্কা ধূসর-হলদে রঙ ধারণ করে; হাইড্রোক্লোরিক অম্লে হলদে-সবুজ এবং এসেটিক অম্লে ধূসর সাদা রঙের ফোস্কা দেখা দেয়।

ক্ষারীয় পদার্থ কলার ভেতর দিয়ে সহজে প্রবেশ করে বলে তাতে কলা বিনষ্ট হয় অনেক গভীরতা পর্যন্ত। ক্ষারীয় পদার্থে পুড়ে-যাওয়া দাহক্ষতের উপরিভাগ হয় দেখতে খুবই অসমতল ,গলিত ও সাদাটে রঙের।

অম্ল অথবা ক্ষার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে রোগীর মুখে, উরঃফলকের পেছনে ও পেটের ঊর্দ্ধভাগে সৃষ্টি হয় ভীষণ ব্যথা। রোগী ব্যথায় কোঁকাতে থাকে। প্রায় সব ক্ষেত্রেই কষ্টকর বমি হতে দেখা যায় ও বমনের সঙ্গে রক্ত মিশ্রিত থাকে। শীঘ্রই সৃষ্টি হয় ব্যথা উদ্ভূত সক্। এতে কণ্ঠনালীর স্ফীতি হয়ে এসফিক্সিয়া দেখা দেওয়াও সম্ভব। বেশী পরিমাণ অম্ল বা ক্ষারীয় পদার্থ গ্রহণ করলে খুব তাড়াতাড়ি দেখা দেয় হৃৎপিন্ডের দুর্বলতা ও কোলাপস।

স্পিরিট অব এমোনিয়া (এ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড) দ্বারা বিষক্রিয়া হলে তা ভীষণ আকার ধারণ করে। ব্যথার যন্ত্রণার সাথে এই বিষক্রিয়ায় দেখা দেয় শ্বাসের কষ্ট কেননা একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শ্বাস-প্রশ্বাসের পথ।

এই সমস্ত বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য যে দেবে তাকে প্রথমেই নিশ্চিত ভাবে নির্ণয় করে নিতে হয় কোন্ পদার্থের বিষক্রিয়া হয়েছে, কেননা তার ওপর নির্ভর করে সাহায্য দানের ব্যবস্থার প্রণালী।

যদি ঘনীভূত অম্ল গ্রহণের ফলে বিষক্রিয়া হয়ে থাকে এবং খাদ্যনালী ও পাকস্থলী ফুটো হয়ে যাওয়ার কোন উপসর্গ না থাকে, তা হলে সর্বাগ্রে দরকার মোটা টিউবের

সাহায্যে ৬ থেকে ১০ লিটার উষ্ণ জলের সঙ্গে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড মিশিয়ে (প্রতি ১ লিটার জলে ২০ গ্রাম) তাই দিয়ে পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড না থাকলে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের জলও ব্যবহার করা চলে। পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়ার জন্য সোডা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সামান্য ধুয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাতে, অর্থাৎ ৪ থেকে ৫ গেলাস জল খাইয়ে তারপর বমির উদ্রেক করাতে তেমন কোন কাজ হয় না রবঞ্চ তাতে বিষ ভেতরে শোষিত হওয়ায় সাহায্য হতে পারে।

যদি টিউবের সাহায্যে পাকস্থলী ধৌত করে দেবার কোনই সুবিধা না থাকে তাহলে এ রকম রোগীদের দুধ, তেল, ডিমের সাদা অংশ, ভাতের মাড় ও অন্যান্য পদার্থ দেওয়া যায়, যেগুলি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ওপর প্রলেপ বা কোটিং সৃষ্টি করে। কার্বালিক অম্লের দ্বারা বিষক্রিয়া হলে বা ঐ অম্লযুক্ত অন্য কোন পদার্থের বিষক্রিয়া হলে (ফিনল, লাইজল) দুধ, তেল, চর্বি দেওয়া নিষেধ। ঐ সব ক্ষেত্রে পান করতে দিতে হয় ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড জলের সঙ্গে মিশিয়ে ও ক্যালসিয়াম অক্সাইডের জল। এই সব পদার্থ অন্য সমস্ত অম্লের বিষক্রিয়ায় প্রযোজ্য। ব্যথা কমানোর জন্য ওপর-পেটে ঠাণ্ডা জলের অথবা বরফের ব্যাগ প্রয়োগ করা চলে।

যদি পয়জনিং বা বিষক্রিয়া হয় ঘনীভূত ক্ষারীয় পদার্থ গ্রহণের ফলে, তাতেও কালবিলম্ব না করে পাকস্থলী ধৌত করে দিতে হয় উষ্ম জলের সাহায্যে অথবা ১% সাইট্রিক বা এসেটিক অম্লের সাহায্যে। এই ভাবে ধৌত করা যায় ঐ সব বিষ গ্রহণের ৪ ঘণ্টার মধ্যে যদি পাকস্থলী

ধৌত করার টিউব না থাকে ও রোগীর তেমন অবস্থা না থাকে (ভীষণ খারাপ অবস্থা, কণ্ঠনালীর স্ফীতি ও অন্যান্য), দেওয়া হয় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ওপর প্রলেপ সৃষ্টিকারী পদার্থ পান করতে, ২ থেকে ৩% সাইট্রিক বা এসেটিক অম্লের সলিউশন (১ টেবিল চামচ করে ৫ মিনিট পরপর)। লেবুর জলও পান করতে দেওয়া চলে। সোডিয়াম হাইড্রোক্লোরাইড সলিউশন দিয়ে কুলকুচি করতে দেওয়া বা তা পান করতে দেওয়া নিষেধ।

প্রাথমিক সাহায্যের মূল কাজ এসব ক্ষেত্রে কালবিলম্ব না করে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করা, যেখানে তাকে সুদক্ষ ডাক্তারী সাহায্য দেওয়া হবে।

মনে রাখা দরকার, যদি সন্দেহ হয় যে রোগীর খাদ্যনালী বা পাকস্থলী ফুটো হয়ে গেছে (ভীষণ পেটব্যথা, উরঃফলকের পেছনে অসহ্য ব্যথা), রোগীকে কোন কিছু পান করতে দেওয়া, বিশেষ করে পাকস্থলী ধৌত করা কখনই উচিত নয়।

ওষুধ ও মদ্যপানের বিষক্রিয়া

ওষুধের বিষক্রিয়া বেশী হতে দেখা যায় সেই সব পরিবারের শিশুদের মধ্যে, যেখানে ওষুধ-পত্র যত্ন করে রাখা হয় না, ছড়িয়ে থাকে যেখানে-সেখানে, শিশুর নাগালের মধ্যে। বড়দের মধ্যে ওষুধের বিষক্রিয়া হয় ঘটনাচক্রে ওষুধ বেশী ডোজে গ্রহণ করলে, আত্মহত্যার প্রচেষ্টায় তা ব্যবহার করলে, মাদকতার প্রতি আসক্তি থাকলে। নানা ধরনের উপসর্গ নিয়ে এই বিষক্রিয়া দেখা

দিতে পারে এবং তা নির্ভর করে, কোন্ বিশেষ ওষুধের বিষক্রিয়া হয়েছে তার ওপর।

যদি বেশী রকম ডোজে ব্যথাহারী ওষুধ ও জ্বর কমানোর ওষুধ (ফেনিল, বুটাজোন, এনালজিন, প্রোমেডল, এস্পিরিন প্রভৃতি) ব্যবহার করা হয় তা হলে কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের অবদমন ও উত্তেজনার প্রতিক্রিয়ায় ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, দেখা দেয় কৈশিক রক্তবাহী শিরাগুলির স্ফীতি ও দেহ থেকে উত্তাপ নির্গমন বর্দ্ধিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় অত্যধিক ঘাম হওয়া, দেখা দেয় ভীষণ দুর্বলতা, ঘুম ঘুম ভাব যা পরে গভীর ঘুমে এমনকি সংজ্ঞাহীনতায় পর্য্যবসিত হয়, আর কখনো কখনো শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াও ব্যাহত হয়।

অনুরূপ রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। রোগীর শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের কাজ ব্যাহত হয়ে থাকলে তখনই তাকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন (দেখুন পরিচ্ছেদ ৫)।

বেশী রকম ডোজে ঘুমের ওষুধ খাওয়ায় (বার্বামিল, নেম্বুটাল প্রভৃতি) বিষক্রিয়া যথেষ্ট ঘন ঘন হতে দেখা যায়। এর বিষক্রিয়াতে দেখা দেয় কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের গভীর অবদমিত অবস্থা, ঘুম পরে পর্য্যবসিত হয় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়, তাপর দেখা দেয় শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্রের প্যারালিসিস বা অবশ হওয়া। রোগীর গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চলতে থাকে অগভীর ও মন্থর ভাবে ছন্দবিহীন শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া ও শ্বাসের সঙ্গে গলায় ঘড় ঘড় আওয়াজ হওয়া।

রোগীর যদি জ্ঞান থাকে তাহলে এমতাবস্থায় তার

পাকস্থলী ধৌত করে দিতে হয়, বমি করাতে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট দেখা দিলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করতে হয়।

নেশার দ্রব্যের বিষক্রিয়া হলে (মর্ফিন, আফিম কোডেইন প্রভৃতি) দেখা দেয় মাথাঘোরা, বমির ভাব বা বমি হওয়া, ভীষণ দুর্বলতা ও ঘুম ঘুম ভাব। খুব বেশী ডোজে নেশার ওষুধ গ্রহণ করলে দেখা দেয় গভীর ঘুম, অজ্ঞান অবস্থা যার শেষ পরিণতি শ্বাস-প্রশ্বাস কেন্দ্র, রক্তশিরা ও গতিসঞ্চালন কেন্দ্রের প্যারালিসিস। রোগীর চেহারা এতে ফ্যাকাশে হয়ে যায়, ঠোঁট নীলাভা রঙ ধারণ করে নিঃশ্বাস এলোমেলো হয়ে যায়, চোখের তারা ভীষণ ভাবে সংকুচিত হয়।

প্রাথমিক সাহায্যের মধ্যে পড়ে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দুর্দশাগ্রস্তকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। শ্বাসের কাজ ও রক্ত চলাচলের কাজ বন্ধ হলে পুনরুজ্জীবিতকরণের সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিষক্রিয়া হয় — এমন পরিমাণ মদ্যপান (এলকোহল) করলে তাতে বিষক্রিয়া হয়ে মৃত্যু হতে পারে। ইথাইল স্পিরিটের প্রাণঘাতী ডোজ হল দেহের ওজনের প্রতি কিলোগ্রাম অনুপাতে ৮ সি. সি. এলকোহল, যা হৃৎপিন্ড, রক্তবাহী শিরা, পাকস্থলী ও অন্ত্রপথ, যকৃৎ, বৃক্ক এবং বিশেষ করে কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্রের ওপর ক্রিয়া করে। অধিক মদ্যপান করে খুব মাতাল হলে লোকে ঘুমিয়ে পড়ে এবং তারপর সে ঘুম জ্ঞান হারানো অবস্থায় পর্যবসিত হয়। ঘনঘন বমি ও অসাড়ে প্রস্রাব নির্গত হতে দেখা যায়। ভীষণভাবে ব্যাহত হয় শ্বাসপ্রশ্বাসের

কাজ — শ্বাস চলে মন্থর ও এলোমেলো ভাবে। শ্বাসপ্রশ্বাস কেন্দ্রের প্যারালিসিস হয়ে গেলে দেখা দেয় মৃত্যু।

এলকোহলের বিষক্রিয়ায় সর্বাগ্রে দরকার, খোলা হাওয়া (জানালা খুলে দিতে হয়, বিষক্রিয়ায় আক্রান্তকে খোলা জায়গায় নিয়ে যেতে হয়), জ্ঞান যদি বজায় থাকে তাহলে লোকটিকে জল খাইয়ে বমি করিয়ে পেট পরিষ্কার করে দিতে হয় ও গরম কড়া কফি পান করতে দিতে হয়। তার যদি শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে যায় তা হলে পুনরুজ্জীবিতকরণের সমস্ত ব্যাবস্থাগুলি অবলম্বন করা দরকার

তাপাঘাত ও সূর্য্যাঘতে

অনেকক্ষণ ধরে বাইরের পরিবেশের উচ্চ তাপের ক্রিয়ার ফলে দেহের ভেতরকার তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে প্রকট ভাবে দ্রুত বিকশিত অসুখের নাম হল তাপাঘাত। দেহের অধিক উত্তাপের কারণগুলি হল দেহের উপরিভাগ থেকে তাপ নির্গমনে বাধা (বাইরের উচ্চ তাপমাত্রা, বায়ুর আর্দ্রতা ও বাতাসের নিশ্চলতা) ও দেহের ভেতর বেশী রকম তাপসৃষ্টি (শারীরিক পরিশ্রম, দেহের ভেতরকার তাপ নিয়ন্ত্রণের কাজ ব্যাহত হওয়া)। দেহের উপর সোজাসুজি রৌদ্রের কিরণের ক্রিয়া জনিত তাপাঘাতের নাম হল সূর্য্যাঘাত।

এই উভয় রকমের অসুস্থতার উপসর্গগুলি সবই এক। রোগী প্রথমে অনুভব করে ক্লান্তি, মাথা ধরা। তারপর দেখা দেয় মাথা ঘোরানো, দুর্বলতা, পায়ে ব্যথা, পিঠে

ব্যথা, এক এক সময় বমি। আরও পরে দেখা দেয় কান ভোঁ ভোঁ করা, চোখে অন্ধকরা দেখা, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড়ফড় করা। এই সময় যদি যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায় তাহলে অসুখ আর বাড়তে পারে না। কিন্তু সাহায্য যদি সময়মত না দেওয়া যায় এবং দুর্দশাগ্রস্ত যদি সেই একই পরিবেশের মধ্যে থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় স্নায়বিক তন্ত্র আক্রান্ত হয়ে তার অবস্থা খুবই তাড়াতাড়ি সাংঘাতিক খারাপ হয়ে পড়ে। মুখের চেহারা নীল হয়ে যায়, দেখা দেয় ভীষণ শ্বাসকষ্ট (মিনিটে ৭০ বার পর্যন্ত নিঃশ্বাসে বুক ওঠা-নামা করে), নাড়ীও দ্রুত এবং দুর্বল হয়। রোগী অজ্ঞান হয়ে যায়, মাংসপেশীর খিঁচুনি আরম্ভ হয়, দেখা দেয় বিকার ও মতিভ্রম, দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় ৪১ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত। রোগীর অবস্থা এর পর খুবই তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে পড়ে — শ্বাসপ্রশ্বাস এলোমেলো হয়ে যায়, হাতে নাড়ীর স্পন্দন অন্তর্হিত হয় এবং রোগী, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই শ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়ে প্রাণ ত্যাগ করতে পারে।

রোগীকে কালবিলম্ব না করে অধিকতর ঠাণ্ডা জায়গায়, ছায়াতে নিয়ে এসে শুইয়ে দিতে হয়, তার মাথা খানিকটা উঁচুতে রেখে। তাকে পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হয় এবং মাথা ও হৃৎপিণ্ড অঞ্চল ঠাণ্ডা করতে হয় (ঠাণ্ডা জল ঢেলে বা ঠাণ্ডা জলের পটি দিয়ে)। খুব তাড়াতাড়ি, হঠাৎ করে ঠাণ্ডা করা কিন্তু উচিত নয়। রোগীকে যথেষ্ট পরিমাণ ঠাণ্ডা পানীয় প্যান করাতে হয়। শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ উত্তেজিত করার জন্য তাকে স্পিরিট অব এমোনিয়ার ঘ্রাণ নিতে ও জেলেনিনের ফোঁটা জলে মিশিয়ে তা পান

করতে দিতে হয়। এ কাজে খুব ভাল ফল দেয় মে মাসের ল্যান্ডাসি ফুলের নির্যাস। শ্বাসের কাজে যদি ব্যাঘাত ঘটে বা দম একেবারে আটকে যায় তা হলে পূর্বে উল্লিখিত উপায়গুলির কোন একটি উপায় অবলম্বন করে কৃত্রিম শ্বাস পরিচালনা আরম্ভ করা দরকার।

রেবিস (জলাতঙ্ক) রোগে আক্রান্ত জীবজন্তুর কামড়, বিষাক্ত সর্প ও কীট-পতঙ্গের দংশন

রেবিস রোগে আক্রান্ত জীব জন্তুর কামড়। রেবিস হল এক অতি বিপদজনক ভাইরাস সৃষ্ট রোগ, যাতে সে ভাইরাস আক্রমণ করে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ডের কলাগুলিকে। ভাইরাস মানুষে সংক্রামিত হয় রেবিস রোগে আক্রান্ত জীব-জন্তুর কামড়ের মাধ্যমে। রেবিসের ভাইরাস নির্গত হয় কুকুরের, এক এক সময় বেড়ালের লালার সঙ্গে ও মানুষের দেহে প্রবেশ করে চামড়ার ক্ষতের বা শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ভেতর দিয়ে। এই রোগের সুপ্তাবস্থার বা ইনকিউবেশন পিরিয়ডের মেয়াদ হল ১২ থেকে ৬০ দিন, অসুখ চলে ৩ থেকে ৫ দিন পর্যন্ত এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর পরিণতি — মৃত্যু। যখন কামড় দিয়েছে সে সময় জন্তুটির নিজের রেবিস রোগে আক্রান্ত হওয়ার বাইরের কোন উপসর্গ নাও থাকতে পারে। তাই জীবজন্তুর কামড়কে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, রেবিসের ইনফেকশন হওয়ার দিক থেকে বিপদজনক বলে ধরা দরকার।

জীব-জন্তুর কামড়ে দুর্দশাগ্রস্ত সকলকে নিয়ে যেতে হয়

ভাইরাস বিরোধী স্টেশনে, যেখানে কামড়ে আহত হওয়ার দিন থেকেই রেবিস রোগ বিরোধী ভ্যাকসিনের ইঞ্জেকসন দিতে আরম্ভ করতে হয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়াকালে তৎক্ষণাৎ রক্তপাত বন্ধ করার চেষ্টা করা উচিত নয়, কেননা রক্তপাত ক্ষত থেকে জানোয়ারের লালা ধুয়ে বের করে দিতে সাহায্য করে। প্রয়োজন, কয়েক বার কামড়ের ক্ষতের চারপাশের চামড়ার প্রশস্ত অঞ্চলে জীবাণুবিহীন করার সলিউশন মাখিয়ে (টিংচার আয়োডিন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, স্পিরিট ও অন্যান্য) ও তারপর জায়গাটির ওপর এসেপ্টিক উপায়ে ব্যান্ডেজ বেধে দুর্দশাগ্রস্তকে হাসপাতালে পাঠানো, যে সার্জিক্যাল উপায়ে তার ক্ষতস্থানের পরিচর্য্যা করা হবে ও দেওয়া হবে টিটেনাস প্রতিরোধের ইঞ্জেকশন।

বিষাক্ত সর্পের দংশন (কোবরা, কেউটে, ভাইপার সাপ) জীবনের পক্ষে খুবই বিপদজনক। দংশনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা দেয় ভীষণ জ্বালা-করা ব্যথা, জায়গাটা লাল হয়ে ওঠে ও কালসিটে পড়ে। খুবই তাড়াতাড়ি সে জায়গাটা ফুলে ওঠে (ইডিমা) এবং লসিকাবাহী শিরার পথগুলি লাল সুতোর মত হয়ে ওঠে (লিম্ফ্যানজাইটিস)। এর প্রায় একই সঙ্গে সৃষ্টি হয় সাধারণ বিষক্রিয়ার উপসর্গগুলি: মুখ শুকিয়ে যাওয়া, তৃষ্ণা, বমি, পাতলা পায়খানা, ঘুমের ভাব, মাংসপেশীর খিঁচুনি, কথা জড়িয়ে যাওয়া, গিলতে কষ্ট হওয়া, কখনো কখনো গতি সঞ্চালক তন্ত্রের প্যারালিসিস (কেউটে সাপের দংশনে)। এতে মৃত্যু হয় শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ বন্ধ হয়ে।

এতে অনতিবিলম্বে, দংশনের পর ২ মিনিটের মধ্যে

দংশিত স্থানের যথেষ্ট ওপরে, কলার ওপর হাল্কা চাপ সৃষ্টিকারী টুর্নিকেট বা ঘুরিয়ে টাইট-করা ফাঁস বেঁধে দেওয়া দরকার। তারপর দংশনের জায়গার চামড়া কেটে দিতে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না রক্ত বের হচ্ছে (এর জন্য ছুরি আগুনে পুড়িয়ে নেওয়াই যথেষ্ট) ও সেখানে তার ওপর বসাতে হয় এক রকমের রক্ত শুষে নেওয়ার কাঁচের পাত্র, যাকে বলে মেডিক্যাল কাপ। মেডিক্যাল কাপ না থাকলে এ কাজের জন্য মোটা কাঁচের মদের পেগ বা ছোট কাচের গেলাস প্রভৃতিও ব্যবহার করা চলে। কাপ বসাতে হয় নিম্নলিখিত উপায়ে: একটি কাঠির ওপর তুলো জড়িয়ে তা স্পিরিটে বা ইথারে ভিজিয়ে তাতে আগুন লাগান হয়। জ্বলমান তুলোটিকে তখন কাঁচের পাত্র, কাপের ভেতর ১ থেকে ২ সেকেন্ড রেখে তা বের করে নিয়ে ঐ পাত্রটিকে তাড়াতাড়ি উপুড় করে দংশিত জায়গার ওপর বসিয়ে দিতে হয়। মায়ের বুকের দুধ শুষে নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত চুষিও একাজের জন্য ব্যবহার করা যায়। বিষ শুষে নেওয়ার পর পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট সলিউশন বা সোডি বাইকার্বনেট সলিউশন দিয়ে ক্ষতের পরিচর্য্যা করে স্থানটিকে এসেপ্টিক উপায়ে ব্যান্ডেজ করে দিতে হয়।

যদি দংশনের স্থানে ইতিমধ্যেই স্ফীতি সৃষ্টি হয়ে থাকে বা দুর্দশাগ্রস্তকে যদি ইতিমধ্যেই সর্পবিষ বিরোধী সিরাম দেওয়া হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তখন আর বিষ শোষণের ব্যবস্থার বা টুর্নিকেট বন্ধনের কোন সার্থকতা থাকে না। রোগীর ক্ষতের ওপর তখন এসেপ্টিক ড্রেসিং চাপা দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিতে হয়, দেহপ্রান্তটিকে নিশ্চল করে রাখতে হয়, শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়, দেহপ্রান্তটিকে

চারপাশ থেকে বরফের ব্যাগ দিয়ে ঢেকে ঠাণ্ডা করে রাখতে হয় (অন্য উপায়েও তা ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা করা চলে)। ব্যথা উপশম করার জন্য ব্যবহার করা হয় ব্যথাহারী ওষুধ (এস্পিরিন, এমিডোপাইরিন, এনালজিন), দুর্দশাগ্রস্তকে প্রচুর পরিমাণে পানীয় পান করতে দিতে হয় (দুধ, জল, চা)। মদ্যপান করতে দেওয়া একেবারে নিষেধ। আরও অনেকক্ষণ পরে দেখা দিতে পারে কণ্ঠনালীর স্ফীতি ও শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হওয়া, এমন কি হৃৎপিণ্ডের কাজ ব্যাহত হয়ে তা থেমে যাওয়া। সে সব ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসের কাজ পরিচালনা করতে হয় ও বাইরে থেকে হৃৎপিণ্ড মালিশ করতে হয়। কণ্ঠনালীর স্ফীতি দেখা দিলে রোগীর জীবনরক্ষার এক মাত্র উপায় হল জরুরী ট্রেকিওস্টোমি করে দেওয়া। দুর্দশাগ্রস্তকে সুদক্ষ ডাক্তারী সাহায্য পাওয়ার জন্য অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানো দরকার। গাড়ীতে করে রোগীকে পরিবহণ করতে স্ট্রেচারে শোয়ানো অবস্থায় পরিবহণ করতে হয়, সমস্ত রকমের সক্রিয় ভাবে নড়াচড়া বিষ শোষিত হওয়া ত্বরান্বীত করে।

সর্পদংশনের বিষক্রিয়া চিকিৎসার সবচেয়ে কার্যকরি ওষুধ হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সাপের বিষ বিরোধী পলিভ্যালেণ্ট সিরাম — এণ্টিভাইপার, ইঞ্জেকশন দেওয়া।

সিরাম সঞ্চিত রাখা হয় ২ সি.সি. এম্পিউলে এবং ইঞ্জেকশন করা হয় "বেজেরদকো" প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী, যাতে করে এনাফাইল্যাকটিক সক্ সৃষ্টি এড়ানো যায়। এই নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে ইঞ্জেকশন করা

হয় ০·৫ সি.সি.। তাতে যদি কোন প্রতিক্রিয়া না হয় তা হলে ৩০ মিনিট পর বাদ বাকি ডোজের অর্দ্ধেক ইঞ্জেকশন করতে হয় এবং আরও ৩০ মিনিট পর অবশিষ্ট অংশ পুরোপুরি ইঞ্জেকশন করে দিয়ে দিতে হয়।

বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের দংশন। এর ভেতর সচরাচর পড়ে মৌমাছি ও বল্লার দংশন। দংশনের মুহূর্তেই দেখা দেয় জ্বালা-করা ব্যথা এবং শীঘ্রই দংশন করা জায়গাটি ফুলে ওঠে। মৌমাছির দুই-এক কামড় সাধারণত গোটা শরীরের কোন সাধারণ উপসর্গ সৃষ্টি করে না, কিন্তু এক সঙ্গে অনেক কামড়ে এমন কি মৃত্যুও ঘটতে পারে।

সর্বপ্রথমে দরকার চামড়া থেকে আটকে-থাকা মৌমাছির হুল বের করে দেওয়া, তারপর হুল ফোটানো জায়গায় প্রয়োগ করতে হয় এন্টিসেপ্টিক সলিউশন। হাইড্রোকর্টিসোনের মলম চামড়ায় মাখালে ব্যথা ও স্ফীতি কমে। মৌমাছি বা বল্লার বহু দংশনে প্রাথমিক সাহায্য দান করার পর দুর্দশাগ্রস্তকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়।

কাঁকড়া, বিছার কামড়ে দংশনের স্থানে সৃষ্টি হয় অসম্ভব যন্ত্রণাদায়ক ব্যথা এবং খুবই তাড়াতাড়ি জায়গাটি স্ফীত ও সে জায়গার চামড়া লাল হয়ে ওঠে। প্রাথমিক সাহায্য দানের মধ্যে পড়ে কামড়ের জায়গাটিতে এন্টিসেপ্টিক প্রয়োগ করে সে জায়গা এসেপ্টিক উপায়ে ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া। ব্যথা উপশমিত করার জন্য দেওয়া হয় ব্যথাহারি ওষুধ (এনালজিন, এমিডোপাইরিন)। যদি খুব বেশী রকম ব্যথা হয় তাহলে দিতে হয় ন্যারকটিক ইঞ্জেকশন।

মাকড়সার বিষ সৃষ্টি করে ভীষণ ব্যথা ও মাংসপেশীর

সঙ্কোচন, বিশেষ করে পেটের দেওয়ালের মাংসপেশীর সঙ্কোচন। এতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের কাজ হল ক্ষতের ওপর পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সলিউশন প্রয়োগ করা, ব্যথা কমানোর ওষুধ দেওয়া ও ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট দেওয়া। মাকড়সার বিষে যদি ভীষণ রকম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, দুর্দশাগ্রস্তকে তখনই হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়, যেখানে প্রয়োগ করা হয় এর বিষ বিরোধী বিশেষ এণ্টিসিরাম।

কান, নাক, চোখ, শ্বাসপথ এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রপথে বহিরাগত বস্তু

কানে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তুর প্রবেশ। পার্থক্য করা হয় কানে প্রবেশ-করা অনুরূপ দুই প্রকারের বিজাতীয় বস্তুর ভেতর — জীবিত বস্তু ও নির্জীব বস্তু। জীবিত বস্তুগুলির ভেতর পড়ে, নানা কীট-পতঙ্গ (ছারপোকা, তেলাপোকা, মশা, মাছি ইত্যাদি) আর নির্জীব পদার্থগুলির মধ্যে পড়ে নানা রকম ছোট জিনিষ (বোতাম, পুঁতি, ডালের দানা, ফলের বিচি, শস্যের বীজ, তুলোর টুকরো প্রভৃতি) যেগুলি ঢুকে পড়ে বাইরের শ্রবণপথের ভেতর।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তুর প্রবেশ কানে কোন রকম ব্যথা বা বিপদজনক কোন পরিণতি সৃষ্টি করেনা। কাজেই এ সব কেসে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের কোন দরকারই পড়ে না। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অন্যের সাহায্যে বা নিজে নিজে কানে প্রবেশ করা

বহিরাগত বস্তু বের করতে গিয়ে প্রায়শই বস্তুটিকে আরও ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ঐ রকম বিজাতীয় বস্তু আনাড়ির হাত দিয়ে বের করতে যাওয়া কখনই উচিত নয়। তাতে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে: কর্ণপটাহ ছিদ্র হয়ে যাওয়া, মধ্যকর্ণে ইনফেকশন হওয়া ইত্যাদি।

জীবিত বস্তু কানে ঢুকলে নানা রকম অপ্রীতিকর অনুভূতির সৃষ্টি হতে পারে — মনে হতে পারে কী যেন কান ফুটো করছে, জ্বালা ও ব্যথা অনুভূতিও হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়ার সময় শ্রবণপথ তেল, স্পিরিট বা জল দিয়ে ভর্তি করে দুর্দশাগ্রস্তকে সুস্থ দিকে কাত করে কয়েক মিনিট শুইয়ে রাখতে হয়। এতে কীটের মৃত্যু হয় এবং তখনই অপ্রীতিকর অনুভূতি দূর হয়। কানের অপ্রীতিকর অনুভূতি চলে যাওয়ার পর রোগীকে আবার আক্রান্ত কানের দিকে কাত করে শোয়াতে হয় তাতে তেল, জল বা স্পিরিটের সাথে বহিরাগত বস্তু বেরিয়ে যাওয়া বিরল নয়। যদি বস্তুটি কানের ভেতর থেকে যায়, রোগীকে তখন নিয়ে যেতে হয় কান-নাক-গলা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছে।

নাকে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তুর প্রবেশ। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে নাকের ভেতর বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু প্রবেশ করতে দেখা যায় শিশুদের, যারা নিজেরাই নিজের নাকে নানা ক্ষুদ্রবস্তু (ছোট্ট গোল জিনিষ, পুঁতির দানা, কাগজ বা তুলোর টুকরো, ফলের গোটা, বোতাম, ইত্যাদি) ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য হিসাবে রোগীকে জোরে নাক

ঝাড়তে বলা হয়, নাকের অন্য ফুটো চেপে ধরে। নাকের ভেতর থেকে বিজাতীয় বস্তু বের করে দিতে হলে তা করাতে হয় কেবলমাত্র ডাক্তারের কাছে। বিজাতীয় বাইরের জিনিষ বের করে দেওয়ার কোন তাড়া না থাকলেও প্রথম দিনেই ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়া উচিত, কেননা দীর্ঘ সময় ধরে তা নাকের ভেতর থাকলে, তাতে ইনফেকশন, স্ফীতি এবং কখনো কখনো ঘা হয়ে যেতে পারে এবং রক্তপাত হতে পারে।

চোখের ভেতর বাইরের বিজাতীয় বস্তু পড়া। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোঁতা বস্তু চোখে পড়লে (কাঠির কুটো, পোকা, বালুকণা, প্রভৃতি), চোখের কঞ্জাংকটাইভাতে (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী) তা আটকে থেকে জ্বালা অনুভূতি সৃষ্টি করে যে-জ্বালা চোখে পিট পিট করাতে বর্দ্ধিত হয় এবং চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। বহিরাগত বিজাতীয় বস্তুকে যদি বের করে না দেওয়া হয় তাতে সৃষ্টি হয় কঞ্জাংকটাইভার স্ফীতি, চোখ লাল হয়, চোখের কাজ (দৃষ্টি) ব্যাহত হয়। বস্তুটি সাধারণত অবস্থান করে ওপরের বা নিচের চোখের পাতার তলায়। যত তাড়াতাড়ি সে বস্তু বের করে দেওয়া হয় তত তাড়াতাড়ি অন্তর্হিত হয় তার দ্বারা সৃষ্ট উপসর্গগুলি। এ সব ক্ষেত্রে চোখ কচলানো উচিত নয় কেননা তাতে আরও বেশী কঞ্জাংকটাইভার প্রদাহ সৃষ্টি হয়। প্রয়োজন হল চোখের ভেতরটা ভাল করে দেখে কুটো বের করে দেওয়া। প্রথমে দেখতে হয় নিচের চোখের পাতার কঞ্জাংকটাইভা: রোগীকে বলা হয় ওপর দিকে তাকাতে এবং সাহায্যকারী নিচের চোখের পাতাকে টানে নিচের দিকে, তাতে পরিষ্কার দেখা যায় কঞ্জাংকটাইভার গোটা
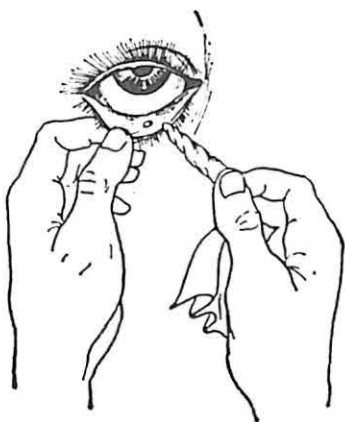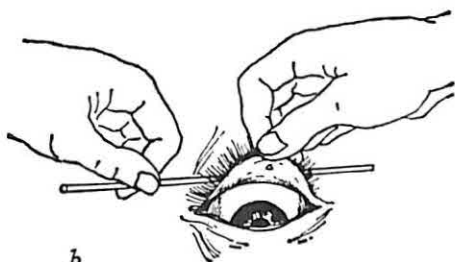
চিত্র — 61 : চোখ থেকে বহিরাগত বস্তু বের করা

নিচের অংশ। বহিরাগত বস্তুটি বের দেওয়া হয় শুকনো অথবা বোরিক অম্লের সলিউশনে ভেজানো শক্ত পোলতের সাহায্যে (চিত্র — ৬১a); ওপরের চোখের পাতার তলায় অবস্থিত বহিরাগত বস্তু বের করা খানিকটা কঠিন। তা করতে ওপরের চোখের পাতাকে বাইরের দিকে উল্টে দিতে হয়। এর জন্য রোগীকে বলতে হয় নিচের দিকে

তাকাতে, আর সাহায্যকারী তার নিজের ডান হাতের দুই আঙ্গুল দিয়ে ওপরের চোখের পাতা ধরে তাকে সম্মুখ ও নিচের দিকে টানে এবং তারপর বাম হাতের তর্জনী চোখের পাতার ওপর রেখে তাকে উল্টে দেয়, পাতাটিকে নিচ থেকে ওপরের দিকে তোলার টান লাগিয়ে (চিত্র — ৬১b)। এর পর চোখ থেকে বাইরের বিজাতীয় বস্তু বের করে দিয়ে রোগীকে বলা হয় ওপর দিকে তাকাতে এবং তা করলে আপনা থেকেই ওপরের চোখের পাতা স্বস্থানে ফিরে আসে। যে কোন গোল শলাকা, পেন্সিল ইত্যাদির সাহায্যেও চোখের পাতা উল্টে দেওয়া যায়। ইনফেকশন নিবারণের জন্য, বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু বের করে দেওয়ার পর চোখের ভেতর দিতে হয় ৩০% সাল্ফাসিল নাইট্রেট সলিউশনের (এলবুসিড সোডিয়াম) ২-৩ ফোঁটা। অচ্ছোদপটলে বিঁধে-যাওয়া বহিরাগত বিজাতীয় বস্তুকে প্রাথমিক সাহায্যকারীর পক্ষে বের করার চেষ্টা করা একেবারে নিষেধ। তা করতে হয় কেবলমাত্র হাসপাতালে।

বিঁধে যাওয়া বহিরাগত বস্তু এবং চোখের আপেলের গহ্বর ভেদ-করা জখমে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য হিসাবে চোখে কেবলমাত্র ২-৩ ফোঁটা সাল্ফাসিল নাইট্রেট সলিউশন দেওয়া চলে ও স্টেরাইল গজ চাপা দিয়ে চোখ ব্যান্ডেজ করে দেওয়া চলে। অনুরূপ রোগীদের অবিলম্বে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হয়।

শ্বাসপথে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু। শ্বাসপথে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু ঢুকে পড়ে, শ্বাসপথকে তা পুরোপুরি আটকে দিয়ে এসফিক্সিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শ্বাস-পথে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু ঢুকে পড়া বেশীর ভাগ

চিত্র — 62: শ্বাসপ্রশ্বাসের পথে বিজাতীয় বহিরাগত বস্তু
1 — ল্যারিংক্সের মুখে;
2 — ল্যারিংক্সের ভেতর
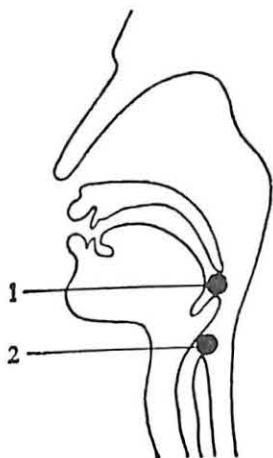
দেখতে পাওয়া যায় শিশুদের মধ্যে। বড়দের মধ্যে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে শ্বাসপথে প্রবেশ করে খাদ্যদ্রব্য, খেতে খেতে কথা বলার সময় অথবা এপিগ্লটিসের অসুখ থাকলে, যাতে গেলার সময় এপিগ্লটিস কণ্ঠনালীর পথ শক্ত করে বন্ধ করতে পারে না। মুখের ভেতরকার যে কোন জিনিষ গভীর নিঃশ্বাস নেওয়ার সময় হাওয়ার সঙ্গে কণ্ঠনালী ও শ্বাসনালীতে ঢুকে পড়তে পারে (চিত্র — ৬২), যাতে সৃষ্টি হয় ভীষণ কাশি। বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু অনেক সময় কাশির মুহূর্তে কাশির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে।

বড় আকারের বাইরের বিজাতীয় বস্তু হলে তাতে স্বর-গ্রন্থির সংকোচন সৃষ্টি হতে পারে। বহিরাগত বস্তু তখন শক্তভাবে আটকে যায় এবং কণ্ঠনালীর ফুটো পুরোপুরি বন্ধ হয়ে দম আটকানোর অবস্থা সৃষ্টি হয়।
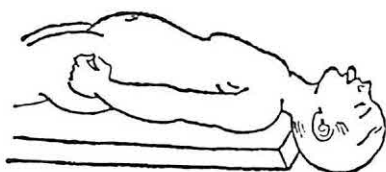
চিত্র — 63: শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ থেকে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু বের করে দেওয়া
a — বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু ভেতর থেকে টেনে বের করার জন্য যেভাবে দূর্দশাগ্রস্তকে শোয়াতে হয়; b — যাতে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু নিজে থেকে বেরিয়ে যেতে পারে — সেই প্রচেষ্টা

যদি জোরে কাশি দেওয়া সত্ত্বেও বহিরাগত বস্তু বেরিয়ে না যায় তাহলে তখন সক্রিয় ভাবে তাকে বের করে দেওয়ার

চেষ্টা করতে হয়। দুর্দশাগ্রস্তকে ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর উপুড় করে এমন ভাবে স্থাপন করতে হয় যাতে তার মাথা যতদূর সম্ভব নিচের দিকে নুইয়ে পড়ে। এই অবস্থায় হাতের সাহায্যে তার পিঠের ওপর চাপড় দিয়ে দিয়ে বক্ষপিঞ্জরে কম্পন সৃষ্টি করতে হয়। এতেও যদি কাজ না হয় তখন রোগীকে টেবিলে চিৎ করে শুইয়ে তার মাথা যতদূর সম্ভব পেছন দিকে বাঁকিয়ে খোলা মুখের ভেতর দিয়ে দেখতে হয় কণ্ঠনালীর ভেতরটা (চিত্র — ৬৩a)। যদি দেখা যায় বহিরাগত বস্তু রয়েছে তা হলে তাকে ফরসেপ্‌স, আঙ্গুল বা কর্ণসাঙ্গ দিয়ে ধরে টেনে বের করে নিয়ে আসা হয়। দুর্দশাগ্রস্তকে এরপরও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা উচিত। যদি শ্বাসের পথ পুরোপুরি আটকে গিয়ে দেখা দেয় এসফিক্সিয়া ও বহিরাগত বিজাতীয় বস্তুটিকে বের করে দেওয়া সম্ভব না হয়, তখন রোগীর জীবন রক্ষা করার এক মাত্র উপায় হল জরুরী ট্রেকিওস্টোমি অপারেশন করে দেওয়া।

পাকস্থলী ও অন্ত্রপথে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তুর প্রবেশ। খাদ্যনালী ও পাকস্থলীতে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু ঢুকে পড়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আচমকা ভাবে এবং তাও আবার অনেক বেশী দেখা যায় তাদের মধ্যে, কাজের সময় যারা ছোট ছোট বস্তু (পেরেক, সূঁচ, মাথার কাঁটা, টিপ-বোতাম) দাঁতে করে ধরে রাখে এবং তা ছাড়াও তাদের মধ্যে, যারা খুব তাড়াতাড়ি খায়। আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে মানসিক রোগাক্রান্ত রোগীরা প্রায়ই বিজাতীয় বস্তু গিলে ফেলে। বিজাতীয় বস্তু গিলে ফেলা শিশুদের মধ্যেও যথেষ্ট ঘন ঘন দেখা যায়। ছোট্ট মসৃণ গোল বস্তু অন্ত্রের

গোটা পথ অতিক্রম করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পায়খানার সঙ্গে বেরিয়ে যায়। কিন্তু খোঁচা যুক্ত বা বড় আকারের বস্তু দেহাঙ্গ জখম করতে পারে এবং পাকস্থলী ও অন্ত্রপথের কোথাও না কোথাও আটকে যেতে পারে ও আটকে গিয়ে বিপদজনক জটিলতা সৃষ্টি করে — রক্তপাত, অন্ত্র ছেদা হয়ে যাওয়া।

ছোট গোল বস্তু গিলে ফেল্‌লে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহা-য্যের কাজ হল এমন ব্যবস্থা করা যাতে বস্তুটি তাড়াতাড়ি অন্ত্রপথে এগিয়ে যায়। দুর্দশাগ্রস্তকে পরামর্শ দিতে হয় এমন খাবার খেতে, যাতে কোষযুক্ত পদার্থ বেশী: পাউরুটি, আলু, বাঁধাকপি, গাঁজর, বিট। এ সব ক্ষেত্রে জোলাপ দেওয়া উচিত নয়। কি ভাবে শেষপর্যন্ত চিকিৎসা করতে হবে সে প্রশ্ন নিয়ে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। খোঁচা যুক্ত বস্তু বা আকারে বড় এমন বস্তু গিলে ফেলার পর যদি উরঃফলকের পেছনে ও পেটে ব্যথা আরম্ভ হয়, দুর্দশাগ্রস্তকে তখন খেতে ও পান করতে দেওয়া নিষেধ; তাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পাঠাতে হয়।

পেটের ভেতরকার দেহাঙ্গগুলির দ্রুত সৃষ্টি হওয়া প্রকট অসুখ

পেটের দেহাঙ্গগুলির আকস্মিক ভাবে দেখা দেওয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসরমান অসুখগুলিতে বহু ক্ষেত্রে এমন জটিলতা সৃষ্টি হয় যার জন্য অনতিবিলম্বে অস্ত্রচিকিৎসার সাহায্য নিতে হয়। অনুরূপ জটিলতগুলির মধ্যে পড়ে পেরিটোনিয়ামের স্ফীতি (পেরিটোনাইটিস) ও পেটের

গহ্বরে রক্তপাত। যেমন পেরিটোনাইটিস তেমনি অভ্যন্তরীণ রক্তপাতে সময়মত অস্ত্র চিকিৎসা সাহায্য দান না করলে রোগীর অবধারিত মৃত্যু হয়।

পেরিটোনিয়ামের স্ফীতি হলে অথবা পেটের ভেতরে রক্তপাত হলে যে ক্লিনিক্যাল চিত্র দেখা দেয় (অন্য কথায় বলতে গেলে, যে সব উপসর্গ সূচিত করে পেটগহ্বরের কোন না কোন বিপর্য্যয়), তাকে বলা হয় পেটের প্রকট অবস্থা বা এ্যকিউট এবডোমেন। পেটগহ্বরের বিপর্য্যয়সূচক প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর কর্তব্য — পেটের প্রকট অবস্থা (এ্যকিউট এবডোমেন) — এই বিশেষ বিপর্য্যয় সূচক ডাইয়াগ্নোসিস দিয়ে রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো।

পেটের ভেতরকার দেহাঙ্গগুলির যে সমস্ত অসুখকে পেটের প্রকট অবস্থা বলে বর্ণিত করা চলে তার মধ্যে বেশী হতে দেখা যায় প্রকট (এ্যকিউট) এপেন্ডিসাইটিস, পাকস্থলী বা ডুওডিনামের ফুটো হয়ে যাওয়া ঘা, প্রকট কোলেসিস্টাইটিস (পিত্তথলির স্ফীতি), আটকে যাওয়া (স্ট্রাঙ্গুলেটেড হার্নিয়া) হার্ণিয়া, ক্ষুদ্র অন্ত্রের প্রকট অগম্যতা (এ্যকিউট ইন্টেস্টাইন্যাল অবস্ট্রাকশন), পেটের দেহাঙ্গগুলির বদ্ধজখম, প্রকট প্যানক্রিয়াটাইটিস, জরায়ু-বহির্ভূত গর্ভধারণে জরায়ুনালী ফেটে যাওয়া, মুচড়ে যাওয়া ডিম্বাধারের সিস্ট। এই সমস্ত অসুখেরই সাধারণ চরিত্র হল এই যে, অসুখ আরম্ভ হবার পর থেকে সুদক্ষ চিকিৎসা সাহায্য পাওয়ার আগ পর্যন্ত যত বেশী সময় অতিবাহিত হবে রোগীর অবস্থা ততই ভীষণ ভাবে খারাপ

হয়ে যাবে এবং চিকিৎসায় খারাপ পরিণতির সংখ্যা ততই বেশী বৃদ্ধি পাবে।

এই সমস্ত অসুখের বেশীর ভাগের সাধারণ উপসর্গগুলি হল পেটের ভীষণ ব্যথা যদিও ব্যথার স্থান, তার পরিসর ও চরিত্রে (সব সময় ব্যথা, দমকে দমকে ব্যথা ইত্যাদি) কিছু পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। ব্যথা উঠতে পারে হঠাৎ সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থার ভেতর, আবার তা একটু একটু করে আরম্ভ হয়ে কিছু সময় পর উগ্রভাব ধারণ করতে পারে। দ্বিতীয় উপসর্গ হল গা বমি বমি করা ও বমি হওয়া। সে বমি এক এক সময় সমানে চলতে পারে, যাকে কিছুতেই বন্ধ করা যায় না। পেটের প্রকট অবস্থায় বেশীর ভাগ রোগীর পায়খানা হয় না ও পেটের বায়ু নিষ্কাশিত হয় না।

পেটের গহ্বরের দেহাঙ্গগুলির স্ফীতিযুক্ত অসুখের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, তাতে পেটের সামনের দেওয়ালের মাংসপেশীগুলি খুব শক্ত হয়ে ওঠে এবং ভীষণ ব্যথা করে, যদি স্ফীত দেহাঙ্গের অবস্থান অঞ্চলে পেট চাপ দিয়ে স্পর্শ করা যায়। তাতে সব কেসেই দেখা যায় যে শ্চেৎকিন-ব্লুমবের্গ লক্ষণ বিদ্যমান রয়েছে। এই লক্ষণটি পেরিটোনিয়ামের স্ফীতির অন্যতম সবচেয়ে পরিস্কার ও সর্বদা বিরাজমান লক্ষণ। তা পরীক্ষা করা হয় নিম্নলিখিত উপায়ে: — পরীক্ষক সাবধাণে রোগীর পেটের সামনের দেওয়ালে হাত রেখে আস্তে আস্তে চাপ সৃষ্টি ক'রে হঠাৎ তাড়াতাড়ি সে হাত উঠিয়ে নেয়। লক্ষণটিকে ধরা হয় ইতিবাচক যদি রোগীর পেট থেকে হাত উঠিয়ে নেওয়ার মুহূর্তে রোগীর পেটে প্রকট ব্যথা অনুভূতি সৃষ্টি হয়।

পেটের গহ্বরে রক্তপাত হলে তাতে আবির্ভূত ভীষণ রক্তাল্পতার উপসর্গগুলির পাশাপাশি (গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, ঠাণ্ডা ঘাম হওয়া, নাড়ী দুর্বল ও দ্রুতগতি হওয়া, রক্তের চাপ হ্রাস পাওয়া ও রক্তের হিমোগ্লোবিন কমে যাওয়া) পরিলক্ষিত হয় পেটের মাংসপেশীগুলির খানিকটা শক্ত হয়ে যাওয়া, পেট স্পর্শ করে চাপ দিলে ব্যথা সৃষ্টি হওয়া ও ইতিবাচক শ্বেৎকিন-ব্লুমবের্গ লক্ষণ। পেটের অভ্যন্তরীণ রক্তপাত যথেষ্ট অল্প সময়ের মধ্যে সৃষ্টি করতে পারে প্রকট রক্তাল্পতা ও রোগীর মৃত্যু।

আগে উল্লিখিত পেট গহ্বরের দেহাঙ্গগুলির প্রকট অসুখগুলির কোন একটি অসুখে যদি সময়মত চিকিৎসা সাহায্য না দেওয়া যায়, তাহলে তখন সৃষ্টি হয় পেরিটোনিয়ামের স্ফীতি যা আপন ক্ষেত্রে তা সে যে কারণেই উদ্ভূত হোক না কেন, রোগীর অবস্থাকে ভয়ংকর পরিণতির দিকে ঠেলে দেয়।

পুঁজ সৃষ্টিকারী ছড়ানো পেরিটোনাইটিস হলে রোগীকে বাঁচানো খুবই শক্ত হয়। তার চেয়ে ঢের সহজ পেরিটোনাইটিস নিবারণ করা। কাজেই যে সমস্ত অসুখে পেটের প্রকট অবস্থা সৃষ্টি হয় সেগুলিকে বিচার করা দরকার এমন অসুখ হিসাবে যাতে জরুরী শল্য চিকিৎসার অবশ্য প্রয়োজন।

পেটের ভেতরকার দেহাঙ্গগুলির প্রকট স্ফীতি দেখা দিলে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যকারীর প্রধান কাজ হল কালবিলম্ব না করে রোগীকে হাসপাতালে পাঠানো। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য হিসাবে রোগীকে বিশ্রামে রেখে

তার পেটের ওপর বরফের ব্যাগ বা ঠান্ডা জলের পটি দেওয়া আবশ্যক। অনুরূপ রোগীকে খেতে দেওয়া, ডুস দেওয়া, পাকস্থলী ধুইয়ে দেওয়া, জোলাপ দেওয়া সবই নিষেধ, কেননা এ সমস্ততে স্ফীতি প্রক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তে পারে।

এতে ব্যথাহারী বা ন্যারকটিক ওষুধ দেওয়া একেবারে নিষেধ এবং তেমনি এণ্টিবায়োটিক ও অন্যান্য ওষুধও ব্যবহার করতে নেই, কেননা রোগের ক্লিনিকাল চিত্র তাতে ঢেকে অস্পষ্ট হয়ে যায় ও সঠিক ভাবে রোগ নির্ণয় করা খুবই শক্ত হয়ে পড়ে। ফলে চিকিৎসায় ভুল হতে পারে বা সময়মত চিকিৎসা আরম্ভেও দেরী হতে পারে।

বৃক্কের কলিক ব্যথা ও হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া

বৃক্কের কলিক ব্যথা। বৃক্ক ও মূত্রনালীর নানান অসুখে (টিউবারকুলোসিস, পাইয়েলোনেফ্রাইটিস, টিউমার ও বিশেষ করে বৃক্কের পাথুরী রোগে) হঠাৎ দেখা দিতে পারে কোমরের ভীষণ দমকে দমকে ব্যথা, যা সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে কুচকি, যৌনাঙ্গ ও উরুতে। এই ব্যথাকে "বৃক্কের কলিক ব্যথা" নামে অভিহিত করা হয়। বিশেষ জায়গায় ব্যথা করা এবং বিশেষ জায়গায় সে ব্যথা ছড়িয়ে যাওয়া — এটাই বৃক্কের কলিক ব্যথার এক মাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। এই ব্যথার সঙ্গে বহুক্ষেত্রে দেখা দেয় প্রস্রাব করতে জ্বালা করা, ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া এবং প্রস্রাবের রঙ পরিবর্তিত হওয়া এবং আরও অন্যান্য উপসর্গ।

বৃক্কের কলিক ব্যথা, অতিতীব্র ব্যথা এবং দেহের অবস্থান পরিবর্তনে তার তীব্রতা একটুও উপসমিত হয় না। এই ব্যথা সৃষ্টি হয় বৃক্কের পাইয়েলাসের অধিক সম্প্রসারণে এবং পাথর বা পুঁজে মূত্রনালীর নালী পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার দরুণ, আর মাংসপেশীর স্প্যাজম বা সংকোচনের ফলে।

এই রকম রোগীদের ব্যথা দূর করার জন্য দেওয়া হয় কয়েক ফোঁটা ০·১% ঘনমাত্রার এট্রোপিন, বেলেডোনা ট্যাবলেট, ২ থেকে ৩ ফোঁটা সিস্টেনাল, চিনির ওপর ফেলে তা জিহ্বার তলায় রেখে; খুব ভাল কাজ করে এ সব কেসে গরম জলের ব্যাগ প্রয়োগ করা ও গরম জলের বাথ টাবে শুয়ে থাকা।

মনে রাখা দরকার অনুরূপ দমকে দমকে ব্যথা, পেটের ভেতরকার দেহাঙ্গগুলির প্রকট স্ফীতিযুক্ত অসুখেও — যাকে বলে পেটের প্রকট অবস্থা, দেখা দিতে পারে, যেটা হলে উপরে উল্লিখিত চিকিৎসা করা একেবারে নিষেধ। বৃক্কের কলিক ব্যথা চিকিৎসার উপায় নির্দ্ধারিত করেন ডাক্তার নিজে। তাই অনুরূপ রোগীদের হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া। হঠাৎ প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া অর্থাৎ রোগী যখন নিজে নিজে প্রস্রাব করতে অপারগ, সেই অবস্থাও এক ভয়ংকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এর কারণ হল প্রোষ্টেট গ্রন্থির টিউমার, মূত্রাশয়ের পাথুরী রোগ, সুষুম্নাকাণ্ডের অসুখ। প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য মূত্রাশয়ের দেওয়ালগুলি টান টান হয়ে যাওয়ার ফলে দেখা দেয় ভীষণ

পেটের ব্যথা এবং তা আপন ক্ষেত্রে প্রতিবর্তন উপায়ে অন্ত্র, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি অন্যান্য দেহাঙ্গের ক্রিয়া ব্যাহত করতে পারে। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য হিসাবে কতগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার যেগুলি এক এক সময় স্প্যাজম দূর করে এবং তার সাহায্যে নিজে নিজে প্রস্রাব হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

রোগীকে পান করতে দেওয়া হয় এক গেলাস ঠাণ্ডা জল, গুহ্যদ্বারের সম্মুখে দেওয়া হয় গরম জলের ব্যাগ, ধারা দিয়ে জল পড়ে যাওয়ার আওয়াজ সৃষ্টি করা হয়, নাড়ী পরিষ্কার করার ডুস দেওয়া হয় ও গুহ্যদ্বারে স্থাপন করা হয় বেলেডোনা সাপজিটারি। যদি এই সব ব্যবস্থায় কোন কাজ না হয় তাহলে অবিলম্বে রোগীকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়, যেখানে তার প্রস্রাব বের করে দেওয়া হবে ক্যাথিটারের সাহায্যে (রবারের বা ধাতুনির্মিত ক্যাথিটার মূত্রপথের ভেতর দিয়ে মূত্রাশয়ে প্রবেশ করিয়ে)।

মস্তিষ্কে রক্তপাত, এপিলেপ্সি (মৃগিরোগ) ও হিস্টিরিয়ার খিঁচুনি

মস্তিষ্কে রক্তপাত — হঠাৎ দেখা দেওয়া মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকণ্ডের রক্তচলাচলের গণ্ডগোল, যা দেখা দেয় ব্লাড-প্রেসার রোগের ও মস্তিষ্কের রক্তবাহী শিরাগুলির এথেরোস্ক্লেরোসিসের জটিলতার ফলে। এই রোগ হঠাৎ দেখা দেওয়া অসুখ। কোন রকম পূর্বলক্ষণ ছাড়াই, সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় চলাফেরা কালে বা ঘুমের মধ্যেও তা আকস্মিক ভাবে দেখা দিতে পারে। এতে রোগী অজ্ঞান

হয়ে যায়, তার বমি হয়, অসাড়ে প্রস্রাব ও পায়খানা হয়ে যায়। মুখমণ্ডল লাল হয়ে ফুলে ওঠে, নাকে ও কানে পরিলক্ষিত হয় নীলচে ভাব। এর বৈশিষ্ট্য — শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হওয়া (দেখা দেয় ভীষণ শ্বাসকষ্ট তার সঙ্গে গলায় জোর জোর ঘড়ঘড়ে আওয়াজ)। তারপর শ্বাসক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় অথবা চলতে থাকে কিছুক্ষণ পর পর এক একবার করে নিঃশ্বাস নেওয়া। নাড়ীর গতি মন্থর হয়ে নেমে যায় মিনিটে ৪০ থেকে ৫০ বার ধুকধুকানিতে। অনেক সময় একই সঙ্গে দেখা দেয় দেহপ্রান্তগুলির প্যারালিসিস, মুখের চেহারায় অসমতা (মুখের এক দিকের ভাব প্রকাশের মাংসপেশীগুলির অবশ হওয়া), তারারন্ধ্রের অসমতা (এক দিকের তারারন্ধ্র বড়, অন্য দিকেরটা ছোট)। এক এক সময় মস্তিষ্কে রক্তপাত তত সাংঘাতিক রূপ ধারণ করে না কিন্তু সব ক্ষেত্রেই তাতে দেখা যায় দেহপ্রান্তগুলির অবশ হয়ে যাওয়া ও কমবেশী বাকশক্তির কিছু গণ্ডগোল।

প্রথমে দরকার রোগীকে সুবিধাজনক ভাবে বিছানায় শোয়ানো ও শ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা করে দেওয়ার জন্য পোষাকের বোতাম খুলে আল্গা করে দেওয়া ও খোলা বাতাস আসার ব্যবস্থা করে দেওয়া। মাথায় দিতে হয় বরফের ব্যাগ অথবা ঠাণ্ডা জলের পটি ও পায়ে গরম জলের ব্যাগ। সর্বপ্রকারে রোগীর পূর্ণ বিশ্বাসের ব্যবস্থা করতে হয়। রোগীর যদি গেলার ক্ষমতা রক্ষিত থাকে, তাহলে তাকে মুখ দিয়ে দেওয়া হয় শান্ত করার ওষুধ (এক্সট্র্যাক্ট ভ্যালেরিয়ান, ব্রোমাইড প্রভৃতি), রক্তের চাপ হ্রাসকারী ওষুধ (ডিবাজল, প্যাপাভেরিন)। শ্বাস-প্রশ্বাসের

প্রতি সব সময় তীক্ষ্ন নজর রাখতে হয় এবং ব্যবস্থা করতে হয় যাতে জিহ্বা পেছন দিকে ঢুকে না যায়, বমন পদার্থ ও লালা মুখ থেকে বের করে দিয়ে মুখ সর্বদা পরিস্কার করে রাখতে হয়। রোগীকে জায়গা থেকে নড়ানো বা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা চলে কেবল মাত্র ডাক্তারের পরামর্শ পেলে, যদি তিনি বলেন যে রোগী পরিবহনের যোগ্য।

এপিলেপ্সি খিঁচুনি হল এক গুরুতর মানসিক ব্যাধি—এপিলেপ্সির (মৃগি রোগের) — বহিঃপ্রকাশের অন্যতম রূপ। এতে রোগী হঠাৎ জ্ঞান হারায় এবং একই সঙ্গে আরম্ভ হয় প্রথমে গা মোড়ানি ও পরে ঘন ঘন ঝাঁকি দিয়ে দিয়ে খিঁচুনি, মাথা এক দিকে বেঁকে যায় ও মুখ দিয়ে বের হতে থাকে ফেনা-ফেনা লালা ও থুতু। খিঁচুনি আরম্ভ হওয়ার প্রথম মুহূর্তে রোগী মাটিতে পড়ে যায় এবং পড়ে গিয়ে বহুক্ষেত্রেই চোট পায়। মুখের চেহারা নীলচে ভাব ধারণ করে এবং চোখের তারা-রন্ধ্রগুলি আলোতে কোন প্রতিক্রিয়া করে না।

খিঁচুনি চলে ১ থেকে ৩ মিনিট পর্যন্ত। খিঁচুনি শেষ হয়ে গেলেই রোগী ঘুমিয়ে পড়ে এবং তার কি হয়েছিল কিছুই মনে করতে পারে না। খিঁচুনি চলাকালীন অনেক সময় রোগীর অসারে প্রস্রাব ও পায়খানা হয়ে যায়।

খিঁচুনি চলা কালীন গোটা সময়টিতে রোগীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। যখন খিঁচুনি হচ্ছে তখন রোগীকে আটকে ধরে রাখতে নেই বা অন্য জায়গায় সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করাও উচিত নয়। প্রয়োজন, মাথার তলায় নরম কিছু পেতে দেওয়া, শ্বাসপ্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি করতে পারে

এমন জামা পোশাকের বোতাম খুলে আল্গা করে দেওয়া, জিহ্বায় যেন কামড় না লাগে তার জন্য দুইপাটি দাঁতের মাঝখানে এক ধারে শক্ত করে গুটানো রুমাল বা ওভার-কোটের আঁচল প্রভৃতি কিছু একটা ঢুকিয়ে রাখা। খিঁচুনি যদি রাস্তায় হয়ে থাকে তাহলে তা শেষ হয়ে গেলে রোগীকে বাসায় বা চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পরিবহণ করে নিয়ে যেতে হয়।

এপিলেপ্সির খিঁচুনি ও মস্তিষ্কে রক্তপাতের সংজ্ঞাহীনতার সঙ্গে হিস্টিরিয়ার খিঁচুনির তফাৎ করা বিশেষ প্রয়োজন।

হিস্টিরিয়ার খিঁচুনি। হিস্টিরিয়ার খিঁচুনি সাধারণত হয় দিনের বেলায় এবং খিঁচুনি হওয়ার আগে রোগীর পক্ষে ভীষণ রকম অপ্রীতিকর কোন একটা ঘটনা ঘটে যাতে রোগী খুবই মুহ্যমান হয়। হিস্টিরিয়ার রোগী পড়ে যাবার সময় আস্তে আস্তে সুবিধামত জায়গায় পড়ে, যাতে তার কোন চোট না লাগে। এতে দেখা যায় অভিনয়ের চরিত্রসম্পন্ন এলোমেলো খিঁচুনি এবং এতে মুখ থেকে কোন ফেনা বেরোয় না, রোগী সংজ্ঞা হারায় না, শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ ব্যাহত হয় না, চোখের তারারন্ধ্র আলোতে প্রতিক্রিয়া করে। এতে খিঁচুনি অনেকক্ষণ ধরে চলতে থাকে এবং রোগীর প্রতি যতই বেশী নজর দেওয়া হয় ততই বেশী সময় ধরে চলে তার খিঁচুনি। এতে সাধারণত অসারে প্রস্রাব হতে দেখা যায় না।

খিঁচুনি থেমে গেলে রোগী ঘুমিয়ে পড়ে না বা তার কানে তালে লাগে না, রোগী শান্তভাবে তার কাজ করে যেতে পারে।

হিস্টিরিয়ার খিঁচুনিতেও রোগীকে সাহায্যদান করা প্রয়োজন। তাকে আটকে ধরে রাখা উচিত নয়, প্রয়োজন— রোগীকে শান্ত জায়গায় নিয়ে গিয়ে শোয়ানো ও বাইরের লোকজনকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া, স্পিরিট অব এমোনিয়া শুকতে দেওয়া ও রোগীকে বিব্রত না করা। এ সব ব্যবস্থা করলে রোগী তাড়াতাড়ি শান্ত হয় ও খিঁচুনি বন্ধ হয়ে যায়।

হৃৎপিণ্ড ও রক্তবাহী শিরার প্রকট অক্ষমতা

রক্ত চলাচলের অন্যতম সবচেয়ে বিপদজনক গণ্ডগোলের কারণ হল হৃৎপিণ্ডের প্রকট অক্ষমতা। তা দেখা দিতে পারে দীর্ঘসময় ধরে অম্লজানের স্বল্পতার ফলে (হাই-পক্সিয়া) যা সৃষ্টি হয় বেশী রকম রক্তপাত হলে, আঘাত জনিত সক্ হলে, হৃৎপিণ্ডের ভাল্বের গণ্ডগোল থাকলে (মাইট্রাল স্টেনোসিস), রক্তের চাপ বেশী রকম বৃদ্ধি পেলে, হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশন হলে, বিভিন্ন রকমের বিষের বিষক্রিয়া হলে এবং আরও অন্যান্য কারণে।

হৃৎপিণ্ডের প্রকট অক্ষমতায় হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী তার সংকোচন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাই হৃৎপিণ্ড, তাতে ফিরে-আসা সমস্ত রক্ত নিক্ষেপ করতে অপারগ হয়, কমে যায় যাকে বলা হয় কার্ডিয়াক আউটপুট বা হৃৎপিণ্ড থেকে নিক্ষিপ্ত রক্তের পরিমাণ। ফলে সৃষ্টি হয় রক্ত জমে যাওয়া (স্ট্যাগনেশন)। যদি হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়ের অক্ষমতার প্রাধান্য দেখা দেয় তা হলে রক্ত জমা হতে থাকে প্রধানত
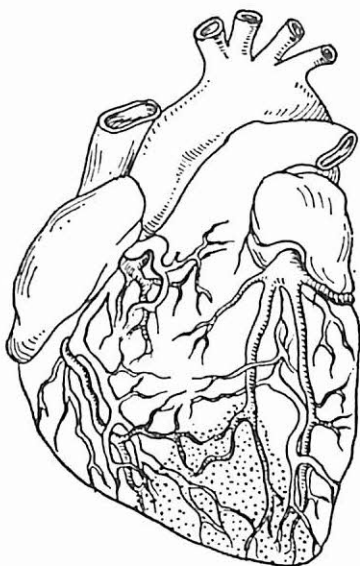
চিত্র — 64: হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশন। কালো রঙ দিয়ে দেখানো হয়েছে থ্রম্বাসের ধমনীতে আটকে যাওয়া ও ফুটকিগুলি দিয়ে দেখানো হয়েছে তাতে কোন অঞ্চল পচে গেছে

ফুসফুসের ভেতর। তা প্রকাশ পায় শ্বাসকষ্ট, নাড়ী দ্রুত হওয়া, রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে অম্লজান কমে যাওয়া, অম্লাধিক্য হওয়া ও অন্যান্য অতিপ্রয়োজনীয় দেহাঙ্গের কাজের গণ্ডগোলের ভেতর দিয়ে, বিশেষ করে বৃক্কের। বাম নিলয়ের বেশী রকম অক্ষমতা দেখা দিলে সৃষ্টি হতে পারে ফুসফুসের ইডিমা।

যদি অক্ষমতার প্রাধান্য দেখা দেয় দক্ষিণ নিলয়ে তাহলে

রক্ত জমা হতে থাকে রক্ত সরবরাহের বৃহৎ চক্রে, দেখা দেয় হাত-পায়ের স্ফীতি, আকারে বৃদ্ধি পায় যকৃৎ, হ্রাস পায় রক্তপ্রবাহের গতি ও বিভিন্ন দেহাঙ্গে অম্লজান সরবরাহ।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য। হৃৎপিণ্ডের প্রকট অক্ষমতায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য সর্বাগ্রে দিতে হয় এমন ধরনের, যাতে হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এর জন্য ব্যবহৃত হয় স্ট্রোপান্থিন, করগ্লিকন, ডিগক্সিন প্রভৃতি ওষুধ। ০·০৫% স্ট্রোপন্থিন সলিউশনের ০·৫ সি. সি. কে মেশানো হয় ২০ সি. সি. ৪০% অথবা ৫% গ্লুকোজ সলিউশনের সঙ্গে ও খুব আস্তে আস্তে শিরার ভেতর দিয়ে ইঞ্জেকশন করা হয়। হৃৎপিণ্ডের প্রকট অক্ষমতার সঙ্গে যদি স্টেনোকার্ডিয়া — হৃৎপিণ্ডের ব্যথা অনুভূতি থাকে তা হলে রোগীকে দিতে হয় নাইট্রোগ্লি-সারিনের একটি ট্যাবলেট জিহ্বার তলায়। ফুসফুসের রক্তবাহী শিরাগুলিতে রক্ত জমা হলে তা কমানোর জন্য খুব ভাল কাজ করে এ্যামিনোফাইলিন (এউফাইলিন)। ওষুধটিকে ২·৪% দ্রবণমাত্রায় দেওয়া হয় শিরার ভেতর দিয়ে আর ২৪% দ্রবণমাত্রায় দেওয়া হয় মাংসপেশীতে ইঞ্জেকশন করে। শিরার ভেতর দিয়ে ওষুধটিকে পরিসঞ্চালিত করতে, তা করতে হয় খুব ধীরে ধীরে। রোগীকে এর সঙ্গে সঙ্গে বেশী প্রস্রাব করানোর কোন একটি ওষুধ দিতে হয় — ফুরসেমিড বা নভুরিট। হাইপক্সিয়া কমানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয় নিঃশ্বাসের সঙ্গে জলের ভেতর দিয়ে সঞ্চালন করে নেওয়া অম্লজান দিতে।

হৃৎপিণ্ডের প্রকট অক্ষমতায় রোগীকে পরিবহণ করে নিয়ে যেতে হলে, তা করতে হয় খুবই সাবধাণে। রোগীর রক্তের চাপ যদি তেমন নিচু না হয় তা হলে তাকে নিয়ে যেতে হয় তার মাথার দিকটা খানিকটা উঁচুতে রেখে আর হৃৎপিণ্ডে রক্তের আগমন কমিয়ে রাখার জন্য দেহপ্রান্তগুলিতে বন্ধনী বেঁধে, এমন ভাবে যাতে কেবল মাত্র শিরার ভেতর দিয়ে রক্ত প্রবাহ বন্ধ থাকে। মনে রাখা দরকার যে, হৃৎপিণ্ডের প্রকট অক্ষমতায় সবচেয়ে সাফল্যের সঙ্গে চিকিৎসা হতে পারে একমাত্র হাসপাতালের পরিবেশে। তাই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন যাতে রোগীকে যত তাড়াড়ি সম্ভব হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা যায়।

রক্তবাহী শিরার প্রকট অক্ষমতা সৃষ্টি হয় রক্তবাহী শিরাগুলির টোনাস ভীষণভাবে কমে গেলে। এতে দেহে মজুদ মোট রক্তের পরিমাণের তুলনায় রক্তবাহী শিরাগুলির ভেতর রক্ত ধারণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই দেহের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় দেহাঙ্গগুলিতে তথা মস্তিষ্কে দেখা দেয় অম্লজানের অভাব যে অম্লজান তাতে নীত হয় রক্তের প্রবাহের মাধ্যমে। ফলে দেহাঙ্গগুলির কাজ ব্যাহত হয় এমনকি বন্ধ হয়ে যায়।

মূর্ছা। মূর্ছা হল রক্তবাহী শিরার প্রকট অক্ষমতার অন্যতম বহিঃপ্রকাশ। এতে মস্তিষ্কে রক্ত আগমনের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে হঠাৎ দেখা দেয় ক্ষণস্থায়ী সংজ্ঞাহীনতা। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মূর্ছা হতে দেখা যায় মানসিক আঘাত বা স্নায়বিক চাঞ্চল্যের সঙ্গে। মূর্ছা-অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করে ভীষণ রুগ্ন অবস্থা, রক্তাল্পতা, দৈহিক শ্রান্তি, গর্ভবতী অবস্থায় রক্তের উচ্চচাপ। এক এক

সময় মূর্ছার আগে রোগী বমি-বমি ভাব, শ্বাসকষ্ট, মাথা ঘোরা, চোখে অন্ধকার দেখা, দুর্বলতা প্রভৃতি অনুভব করে। মূর্ছাতে চামড়ার ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রঙ ফ্যাকাশে হয়ে যায়, এক এক সময় রক্তের চাপ কমে যায় ৭০-৬০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভে। মূর্ছার সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কমে যায়। মূর্ছাগত অবস্থা সাধারণত কয়েক সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী না হলেও কখনও কখনও তা মিনিট খানেক বা আরও বেশীক্ষণ স্থায়ী হতে পারে।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য — মূর্ছাগত অবস্থায় প্রাথমিক সাহায্য দিতে রোগীকে টান করে শুইয়ে দিতে হয়, ধড়ের তুলনায় মাথাকে খানিকটা নিচু করে রেখে। তাতে মাথার রক্তস্রোত পৌঁছান বর্দ্ধিত হয় ও শীঘ্রই শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিক হয়ে আসে। পোশাকের চাপ শিথিল করার জন্য বোতাম খুলে তা আল্গা করে দিতে হয়। শ্বাসপ্রশ্বাস ও রক্তবাহী শিরার গতি পরিচালক কেন্দ্রের উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য রোগীকে এমোনিয়া শুঁকতে দিতে হয়, ঠান্ডা জল দিয়ে মুখ মুছিয়ে দিতে বা মুখে ঠান্ডা জলের ঝাপ্‌টা দিতে হয়। খুব দরকার, যাতে রোগীর ঘরে খোলা হাওয়া আসে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এই সব ব্যবস্থাতেই শীঘ্রই পূর্বাবস্থা থেকে রোগীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

ক্যাল্যাপ্‌স বা ভেঙ্গেপড়া। রক্তশিরা তন্ত্রের অক্ষমতার আরও সাঙ্ঘাতিক অবস্থাকে বলা হয় ক্যাল্যাপ্‌স বা ভেঙ্গেপড়া। রক্ত শিরার টোনাসের গন্ডগোল এতে এত বৃদ্ধি পায় যে রক্তের চাপ আরও কমে যায় এবং হৃৎপিন্ডের ক্রিয়াকলাপও আরও ব্যাহত হয়। ক্যাল্যাপ্‌স

হল ব্যথা ও বিষক্রিয়া যুক্ত অসুখগুলির (টাইফাস, কলেরা নিউমোনিয়া, খাদ্যের বিষক্রিয়া, একিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস, পেরিটোনাইটিস) জটিলতা, যা অনেক ঘটতে দেখা যায়। ভয়ংকর সক্, অধিক রক্তপাতেও ক্যাল্যাপ্স হতে দেখা যায়। ওষুধ দিয়ে অজ্ঞান করার সময়ও ক্যাল্যাপ্স দেখা দিতে পারে। বেশী রকম উগ্র ব্যথার থেকেও ক্যাল্যাপ্স সৃষ্টি হতে পারে, যেমন সোলার স্নায়ুজালের অঞ্চলে (সোলার প্লেক্সাস), গুহ্যদ্বারের সম্মুখবর্তী অঞ্চলে চোট লাগা।

ক্যাল্যাপ্সে বা ভেঙ্গে পড়া অবস্থায় রোগী ফ্যাকাশে হয়ে যায়, চামড়ায় দেখা দেয় ঠান্ডা ঘাম এবং তা নীলাভ রঙ ধারণ করে, জ্ঞান ঝাপ্সা হয়ে আসে, শ্বাসপ্রশ্বাস চলে তাড়াতাড়ি ও অগভীর ভাবে, নাড়ী হয়ে যায় সুতোর মত, রক্তের চাপ নেমে যায় ৬০ মিলিমিটারেরও নীচে। যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা না অবলম্বন করা যায়, রোগী তাতে মরে যেতে পারে।

ক্যাল্যাপ্সে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের কাজ হল, যে কারণে ক্যাল্যাপ্স হয়েছে সেই কারণগুলি দূর করা এবং রক্তবাহী শিরা তন্ত্র ও হৃৎপিন্ডের অক্ষমতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা। মস্তিষ্কে রক্তপ্রবাহ বৃদ্ধি করার জন্য রোগীর পা উপরে তুলে ধরে রাখতে হয়। দেহপ্রান্তগুলিতে আঁট করে ব্যান্ডেজ জড়াতে হয়, তাতেও মস্তিষ্ক ও হৃৎপিন্ডে রক্ত পেঁাছানো বৃদ্ধি পায়।

রোগীকে তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে করে হাসপাতালে পাঠান দরকার, যেখানে ক্যাল্যাপ্সের উৎপত্তির কারণ বিচার করে উপযুক্ত চিকিৎসা করা হবে। সক্ হলে রক্তবাহী

শিরাতন্ত্রের অক্ষমতা সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার ভাবে দেখা দেয়।

হৃৎপিণ্ডের অসুখে উদ্ভূত হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা সাধারণত রক্তবাহী তন্ত্রেরও অক্ষমতা সৃষ্টি করে। ঐ সব কেসে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর সঙ্কোচনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার ওষুধ-পত্রের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় রক্তবাহী শিরা সরু করার ওষুধ—নরএড্রেনালিন, মেজাটোন, এফেড্রিন এবং তার সঙ্গে প্রেডনিজালোন অথবা হাইড্রোকর্টিসোন, ভাইটামিন, কার্বক্সিলেইজ।

ফুসফুসের শোথ (ইডিমা অব লাঙ্গস) হল কতকগুলি অসুখের সবচেয়ে ভয়াবহ জটিলতা এবং তা দেখা দিতে পারে নানা কারণে। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশনে ফুসফুসের ইডিমা বা শোথ দেখা দেওয়ার কারণ হল হৃৎপিণ্ডের অক্ষমতা ও তার থেকে উৎপন্ন হওয়া ফুসফুসের রক্তবাহী শিরাগুলির ভেতর দিয়ে রক্ত নিষ্কাশনের গণ্ডগোল। রক্তের উচ্চচাপের রোগীদের অথবা রক্তশূন্যতায় ভোগা রোগীদের ফুসফুসের শোথ বা ইডিমা দেখা দেয় বর্দ্ধনশীল বা ভেজিটেটিভ স্নায়ু তন্ত্রের উত্তেজনার ফলে, যাতে সৃষ্টি হয় রক্তবাহী শিরার স্প্যাজম এবং তার পরিণতি হিসাবে দেহের ভেতর রক্তের পুনর্বণ্টন ও ফুসফুসে রক্ত জমা হয়ে যাওয়া, মস্তিষ্কের আঘাত বা অসুখেও ঐ একই ব্যাপার ঘটে। ইউরিমিয়াতে (ক্লোরফসজেন প্রভৃতি বিষের বিষক্রিয়াতে) ফুসফুসে শোথ সৃষ্টি হওয়ায় বড় ভূমিকা পালন করে ফুসফুসের কৈশিক রক্তবাহী শিরাগুলির দেওয়ালের ভেদ্যতা বৃদ্ধি। যে কারণেই সৃষ্টি হোক না কেন, ফুসফুসের ইডিমা বা শোথে

শ্বাসপ্রশ্বাসের গণ্ডগোল — হাইপক্সিয়া দেখা দেয়। ফুসফুসের শোথের অন্যতম প্রথম উপসর্গগুলি হল ভীষণ হাঁপ ধরা, শরীরের অস্বস্তি হওয়া, নাড়ীর বেগ বর্দ্ধিত হওয়া। পরে শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে গলায় ঘড়ঘড়ানি আওয়াজ হতে থাকে, দেখা দেয় কাশি এবং কাশির সাথে বেরোতে থাকে সাদা সাদা বা গোলাপী রঙের ফেনা-ফেনা শ্লেষ্মা। ঐ ফেনা ফুসফুসের এলভিওলাসগুলিতে হাওয়া প্রবেশে বাধা সৃষ্টি করে, রোগীর দেখা দেয় অম্লজানের ক্ষুধা, যার অন্যতম লক্ষণ হল চামড়ার ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর নীলচে রঙ ধারণ করা (সাইয়ানোসিস)।

অম্লজানের ক্ষুধা রক্ত চলাচলের কাজে আরও গভীর গণ্ডগোল সৃষ্টি করে, যার ফলে তখন বিপাক ক্রিয়ায় দেখা দেয় অম্লাধিক্য।

ফুসফুসের শোথে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হয় হাইপক্সিয়া রোধের উদ্দেশ্যে। সর্বাগ্রে দরকার শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ থেকে ফেনা, শ্লেষ্মা বের করে দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে শ্লেষ্মা শুষে বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়, রোগীকে স্পিরিটের বাষ্প মেশানো অম্লজান গ্যাস নিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে দিতে হয়। স্পিরিট হল ফেনা যুক্ত শ্লেষ্মা নিবারণের অন্যতম কার্যকরি ওষুধ। ফুসফুসের রক্তবাহী শিরাগুলির রক্তে পরিপূর্ণতা কমানোর জন্য উপকারী হল উরুর কাছে নিম্ন দেহপ্রান্ত দুটিতে চাপ সৃষ্টিকারী টুর্নিকেট বা বন্ধনী বেঁধে দেওয়া যাতে শিরার ভেতর দিয়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয় অথচ ধমনীর ভেতর দিয়ে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক থাকে। তাই টুর্নিকেট বেঁধে পরীক্ষা করে নিতে হয়

টুর্নিকেটের নীচে ধমনীর নাড়ী রক্ষিত আছে কিনা। এ ছাড়াও ফুসফুসের রক্তবাহী শিরাগুলির রক্তে পরিপূর্ণতা কমানোর জন্য বিধেয় কতগুলি ওষুধ ব্যবহার করা: — প্রস্রাব বর্দ্ধিত করার ওষুধ (ল্যাসিক্স, ফুরোসেমাইড), রক্তের চাপ কমানোর ওষুধ। যদি রক্তের চাপ কম থাকে তাহলে খুবই সতর্কতা সহকারে এই সব ওষুধ ব্যবহার করতে হয়। ফুসফুসের শোথের রোগীকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেবার সময় তার নানা কারণ ও বিভিন্ন উপায়ে তা সৃষ্টি হওয়ার কথা মনে রাখা দরকার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, হৃৎপিন্ডের ভাল্বের অক্ষমতার দরুণ দেখা-দেওয়া ফুসফুসের শোথে, শ্বাসকষ্ট কমানোর জন্য যদি মর্ফিয়া ইঞ্জেকশন ভাল কাজ করে তবে, মস্তিষ্কের আঘাত বা অসুখ জনিত ফুসফুসের শোথে ঐ ওষুধ বিপরীত ফল দান করে। এই কারণেই ফুসফুসের শোথে ফেনাযুক্ত শ্লেষ্মা দূর করা, শ্বাসের সঙ্গে অম্লজান গ্রহণ করতে দেওয়া, টুর্নিকেট বাঁধা — এই সব প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া আরম্ভ করে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার ডাকা উচিত, যে বিচার করতে পারবে ফুসফুসের শোথের কারণ কি এবং চালিয়ে যেতে পারবে তার সঠিক চিকিৎসা।

হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশন

হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশন অর্থাৎ তার কোন অংশের পচন (মৃত্যু) মানুষের মৃত্যুর এক খুবই প্রচলিত কারণ। এর কারণ হল করোনারী রক্তবাহী শিরার আর্টেরিওস্ক্লেরোসিস, তার স্পাজ্‌ম বা তার ফুটোয় রক্তের

ঢেলা আটকে যাওয়া জনিত হৃৎপিন্ডে রক্ত সরবরাহের ভীষণ গন্ডগোল সৃষ্টি হওয়া (চিত্র — ৬৪)।

সাধারণত হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হওয়া প্রকাশ পায় হৃৎপিন্ডের ব্যথার ভেতর দিয়ে (cardiastesis), ভীষণ ব্যথা দেখা দেয় উরঃফলকের পেছনে। সময় মত রক্তবাহী শিরা স্ফীত করার ওষুধ (নাইট্রোগ্লিসারিণ, ভ্যালিডল, সুস্তাক, নাইট্রঙ্গ, প্যাপাভেরিণ ও অন্যান্য) ব্যবহার করে এই ব্যথার চিকিৎসা করলে, পরে এর থেকে ইনফার্কশনে সৃষ্টি হওয়া রোধ করা যায়।

হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশনের সবচেয়ে চলতি ও বিপদজনক উপসর্গ হল প্রকট হৃৎপিন্ড ও রক্ত শিরার অক্ষমতা। এই অবস্থা এতই বিপদজনক যে আজকাল একে হৃৎপিন্ড উদ্ভূত সক্ (Cardeogenous shock) বলে ধরা হয়। হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশনের অন্যান্য জটিলতা হল ফুসফুসের শোথ ও হৃৎপিন্ডের নিলয়ের ফিব্রিলেশন।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য — হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশনে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হয় ঠিক সেই ভাবে যেমন দেওয়া হয় হৃৎপিন্ডের প্রকট অক্ষমতা দেখা দিলে, সক্ হলে, ফুসফুসের শোথ হলে (যথাযথ পরিচ্ছেদগুলিতে দেখুন)। অন্যতম প্রথম যে ব্যবস্থা এতে নেওয়া দরকার তা হল ব্যথা উপশমের ব্যবস্থা করা, মর্ফিন, প্রোমেডল ও অন্যান্য ব্যথাহারী ওষুধ ব্যবহার করে। এরই সঙ্গে দরকার করোনারী রক্তবাহী শিরাগুলি স্ফীত করার ওষুধ (নাইট্রোগ্লিসারিন, ভ্যালিডল, এমিলনাইট্রেট, সুস্তাক, নাইট্রঙ্গ) ব্যবহার করা। রোগীর পূর্ণ বিশ্রামের

ব্যবস্থা করতে হয় ও তার সমস্ত রকমের সক্রিয় নড়াচড়া বন্ধ করতে হয়। হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশন সন্দেহ করলে তা সম্পূর্ণ ভাবে সূচিত করে সে রোগীকে পরিবহণ করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার, তা তার অবস্থা যতই বিপদজনক হোক না কেন।

হৃৎপিন্ডের মাংসপেশীর ইনফার্কশনের রোগীকে পরিবহণ করতে হয় পুনরুজ্জীবিতকরণের ব্যবস্থাযুক্ত বিশেষ এম্বুল্যেন্সে করে যাতে পথে যাবার সময় পুনরুজ্জীবিত করার যথোপযুক্ত চিকিৎসা পরিচালনা করা চলে।

হঠাৎ প্রসব। প্রসবাগারের প্রসারিত ব্যবস্থা-জাল থাকা সত্ত্বেও এবং প্রসূতিদের নিয়মিত সুদক্ষ স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এক এক সময় বাসায়, রেলগাড়ীতে করে যাওয়ার পথে, এরোপ্লেনে করে যাওয়ার পথে বা অন্যান্য অবস্থায় হঠাৎ প্রসব হয়ে যাওয়ার ফলে প্রসূতিকে সাহায্য দান করতে হয়। প্রসবের সময় প্রসূতিকে সাহায্য দান করতে সাহায্যকারীর সর্বপ্রথম প্রয়াস হওয়া দরকার ইনফেকশন বিহীন এসেপ্টিক অবস্থা সৃষ্টির দিকে। দরকার ভাল করে হাত ধোয়া এবং কাঁচি বা ছুরি নির্বীজিত করে নেওয়া, তৈরী রাখা দরকার স্টেরাইল ব্যান্ডেজ বা স্পিরিটে (টিংচার আয়োডিনে) ডুবিয়ে রাখতে হয় শক্ত সুতো অথবা পাকানো সুতো, যা নাড়ী বাঁধার জন্য ব্যবহৃত হবে। শিশুর যদি দম বন্ধ অবস্থায় জন্ম হয় তাহলে তার নাক মুখ থেকে ভ্রূণথলির জল নিকাশের জন্য ব্যবহার করা যায় জল শুষে নেওয়া রবারের ডুশের জন্য ব্যবহৃত বল। সদ্যজাত শিশুকে গরম ইস্তিরির
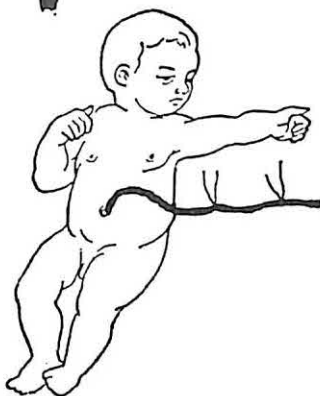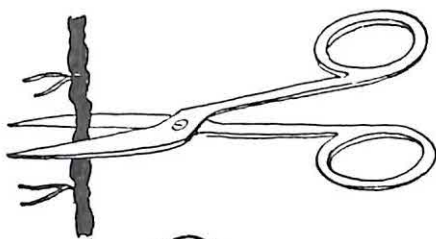
চিত্র — 65: নাভির নাড়ী বেঁধে দেওয়া ও ছেদন করা

সাহায্যে ইস্তিরি-করা চাদরের (নেকড়া) ওপর রাখতে হয়। নাভির নাড়ীতে যখন স্পন্দন বন্ধ হয়ে যায় নাড়ীকে তখন বাঁধতে হয় মোটা সুতো বা বিনানো সুতো বা ব্যান্ডেজের ফালি দিয়ে দু'জায়গায়, শিশুর নাভি থেকে ৫ ও ১০ সেণ্টিমিটার দূরে এবং তারপর দুই বন্ধনের মাঝখানে নাড়ীটাকে কাটতে হয় (চিত্র—৬৫) নাড়ীর শেষ অংশটিতে এসেপ্টিক সলিউশন মাখিয়ে। তারপর স্টেরাইল গজ দিয়ে ঢেকে, সুতো দিয়ে বেঁধে তা শিশুর নাভির কাছে আটকে রাখতে হয়।

শিশু যদি নিঃশ্বাস না নিয়ে থাকে তাহলে দরকার কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করার চেষ্টা করা মুখ থেকে মুখে ফু দিয়ে। তার আগে কিন্তু শিশুর নাক মুখ থেকে ভ্রূণের থলির জল শুষে নিতে হয় ডুশের কাজে ব্যবহৃত রবারের বলের সাহায্যে।

মা ও নবজাত শিশুকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রসবাগারে পাঠিয়ে দিতে হয়।

শিশুর জন্ম হওয়ার ১ ঘণ্টার মধ্যে নাড়ীর অবশিষ্টাংশ সহ অমরা প্রসূত হয়। অমরা প্রসূত হওয়ার পর তা ডাক্তারকে দেখানো দরকার কেননা জানা প্রয়োজন, অমরার গোটাটাই বেরিয়ে এসেছে কি না। সময়মত না বেরিয়ে আসা অমরা বিপদজনক জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রসবের পর মায়ের পেরিনিয়াম পরিষ্কার তোয়ালে বা নেকড়া দিয়ে বেঁধে দিতে হয়।

রোগীর সেবা: প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের খুঁটিনাটি

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের বহু খুঁটিনাটি, বলতে গেলে, রোগীর সেবারই অঙ্গ (জল ও অন্যান্য তরল পদার্থ পান করানো, রোগীকে জামা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া, ডুশ দেওয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার করার জন্য, মাথায়, পেটে বরফের ব্যাগ রাখা প্রভৃতি), যা সমস্ত চিকিৎসাকর্মীর জানা থাকা উচিত।

ডুশ দেওয়া। চিকিৎসা বা রোগ নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে গুহ্যদ্বারের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন রকমের তরল পদার্থ প্রবেশ করিয়ে বৃহৎ অন্ত্র পরিষ্কার করে দেওয়ার ব্যবস্থাকে বলে ডুশ দেওয়া। ডুশ দেওয়া হয় কয়েক রকমের উদ্দেশ্যে। সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় অন্ত্র পরিষ্কার করে দেওয়ার ডুশ। ডুশ দেওয়ার জন্য দরকার এসমার্কের হাতল সংযুক্ত পাত্র, কিন্তু এর জায়গায় চোঙও (funnel) ব্যবহার করা চলে। এ পাত্রের বা চোঙের নাকের সঙ্গে যুক্ত করা হয় ১·৫ মিটার লম্বা রবারের নলের একটা দিক, আর অপর দিকটাতে যুক্ত করা হয় ডুশের নল। ডুশের জন্য ব্যবহার করা হয় রুম-টেম্পারেচারে (২০° থেকে ৩০° সেণ্টিগ্রেড) পরিষ্কার জল। বরারের নলটিকে ক্লিপ দিয়ে চেপে আটকে

ডুশের পাত্রে ঢালা হয় এক লিটার জল। ডুশের নল গুহ্যদ্বারের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করানোর আগে গোটা রবারের নল ও ডুশের নল জলে ভর্তি করে নিতে হয়। এর জন্য খোলা হয় ক্লিপ এবং জল নির্গত হয়ে হাওয়া অপসারিত করে নলটিকে জলে ভর্তি করে ফেলে। রোগীকে শোয়াতে হয় বাম দিকে কাত করে, কিন্তু তার আগে রোগীর তলায় পেতে নিতে হয় অয়েল-ক্লথ (পাছে রোগী ডুশের জল ভেতরে ধরে রাখতে না পারে)। ডুশের পাত্রটিকে এক স্ট্যান্ডের সঙ্গে ঝুলিয়ে, ডুশের নলের গায়ে ভেজেলিন মাখিয়ে, বাম হাতের (I ও II) আঙ্গুল দিয়ে রোগীর নিতম্ব ফাঁক করে ডান হাতের সাহায্যে সাবধাণে ডুশের নল তার গুহ্যদ্বারের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করাতে হয় ও নলটিকে ঠেলে দিতে হয় ৩-৪ সেণ্টিমিটার নাভির দিকে ও পেছন দিকে আরও ১০-১২ সেণ্টিমিটার গভীরে। তারপর ক্লিপ খুলে দিতে হয় এবং জল তখন ডুশের পাত্র থেকে অন্ত্রে প্রবেশ করে। জল এমনভাবে ছাড়তে হয়, যাতে তা খুব তাড়াতাড়ি ভেতরে প্রবেশ না করে, কেননা তাতে ব্যথা সৃষ্টি হতে পারে। ডুশের পাত্র থেকে সমস্ত জল যখন চলে যয়ে তখন রবারের নলকে আবার আটকে সাবধাণে ডুশের নল বের করে নিয়ে আসতে হয়। রোগীকে কয়েক মিনিট পায়খানা চেপে রাখতে বাধ্য করতে হয় যাতে জলের সঙ্গে বাহ্যের দলা ভালভাবে মিশতে পারে। বাহ্যের দলা যদি খুব শক্ত হয়, জল তখন ভাল ভাবে অন্ত্রে প্রবেশ করতে চায় না। এমতাবস্থায় ডুশের পাত্রকে আরও উঁচুতে তুলে ধরতে হয় ও নলের অবস্থান পরিবর্তিত করতে হয়। তাকে আরও ভেতরে ঠেলে দিতে হয় অথবা

তা বের করে নিয়ে ধুয়ে সগম করে আবার প্রবেশ করাতে হয়। এরপরও ডুশের নলের মুখ যদি আবার বাহ্যেতে আটকে যায় তখন গুহ্যদ্বারে আঙ্গুল ঢুকিয়ে পায়খানার গুঠলিগুলি বের করে দিয়ে (আঙ্গুলের ডুশ) আবার জলের সাহায্যে অন্ত্র পরিস্কার করার ডুশ দিতে হয়।

রোগীকে যদি কাত করে শোয়ানো না যায় তাহলে চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থাতেই ডুশ দেওয়া হয়। এক এক সময় বাহ্য তরল করার জন্য ও পায়খানা যাতে সরল ভাবে বেরিয়ে যায় তার জন্য জলের সঙ্গে তেল যোগ করা হয় (ক্যাষ্টরের তেল, ,প্যারাফিনের তেল, সূর্য্যমুখীর তেল প্রভৃতি)। সামান্য চান করার সাবান বা শিশুদের ব্যবহারের সাবানও তাতে যোগ করা চলে (এক টেবিল-চামচ সাবানের চাছ এক লিটার জলের সঙ্গে মিশিয়ে)।

কোন কোন অসুখে (উচ্চ রক্ত চাপের রোগী, হৃৎপিন্ড ও রক্তবাহী শিরার অক্ষমতার রোগী, শোথের রোগী বা আরও কিছু কিছু রোগে) সাধারণ জলের ডুস দেওয়া উচিত নয়, কেননা জল তাতে অন্ত্র থেকে খানিকটা ভেতরে শোষিত হতে পারে। তাই তাদের অন্ত্র মলমুক্ত করতে ব্যবহার করা হয় হাইপারটনিক স্যালাইন সলিউশনের ডুশ — ৫০-১০০ সি.সি. ১০% সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন। সলিউশন ভেতরে প্রবেশ করানো হয় নলযুক্ত ডুশের জন্য ব্যবহৃত রবারের বলের সাহায্যে। রোগীর প্রয়োজন সলিউশনটিকে ২০-৩০ মিনিট ধরে ভেতরে ধরে রাখা। হাইপারটনিক সলিউশন, তন্ত্রের পেরিস্ট্যালসিস বৃদ্ধি করে ও তাতে অন্ত্রেব দেওয়াল থেকে অন্ত্রের নালীর

ভেতর অনেক পরিমাণ ট্র্যানসুডেট বা ভেতরের রস নিসৃত হয়।

আরও সক্রিয় ভাবে অন্ত্র থেকে মল পরিষ্কর করা যায়, সাইফন করা ডুশ দিয়ে যাতে জল দিয়ে অনেকবার অন্ত্র ধুয়ে দেওয়া হয়। সাইফন করে ডুশ দেওয়ার জন্য প্রয়োজন চোঙ, যাতে ধরে ৫০ সি.সি. জল, রবারের নল ও লম্বা ডুশের নল ও এই দুই নল যুক্ত করার কাঁচের টিউব, যার ভেতর দিয়ে দেখা যায় পেটের নাড়ী ধোয়া জল। এই সিস্টেমকে জলে পূর্ণ করে নিয়ে তার নলকে চেপে বন্ধ করা হয় তারপর ডুশের নলের অগ্রভাগে মলম মাখিয়ে তা মলনালীর ভেতরে প্রবেশ করানো হয় (২০-২৫ সেণ্টিমিটার গভীর পর্যন্ত)। তারপর ক্লিপ খুলে দিলে জল যেতে থাকে অন্ত্রের ভেতর। জলের লেভেল যখন চোঙের সরু জায়গা অব্দি নেমে আসে, চোঙকে তখন তাড়াতাড়ি দেহের লেভেলের নীচে নামানো হয়। জল তাতে অন্ত্র থেকে আবার ফিরে আসে চোঙে (ফানেলে)। চোঙকে তখন আবার ওপরে তোলা হয়, ময়লা জলকে ঢেলে ফেলে আবার তা ভরতি করা হয় পরিষ্কার জল দিয়ে। প্রক্রিয়াটিকে চালাতে হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্ত্র থেকে চোঙে ফিরে আসতে থাকে পরিষ্কার জল।

সব সময় খেয়াল রখা দরকার, সমস্ত জল যাতে ডুশ থেকে অন্ত্রে না চলে যায়, কেননা তাতে দুই যোগ যুক্ত পাত্রের নিয়ম লঙ্ঘিত হয় ও জল তন্ত্র থেকে ফিরে আসায় বাধা সৃষ্টি হয়। এই কারণেই সাবধাণ হওয়া দরকার যাতে জলের সঙ্গে অন্ত্রে বায়ু প্রবেশ করতে না পারে। খুব তাড়াতাড়ি ডুশের জল প্রবেশ করতে দিলে জলের

লেভেলের উপরিভাগে সৃষ্টি হয় ফাঁকা জায়গা যেখানে বাতাস ঢুকে পড়ে ও অন্ত্রে চলে যায়। সহজেই এটা দূর করা যায় যদি ফানেলটিকে খানিকটা হেলানো অবস্থায় ধরে রাখা যায়। ডুশের নল অন্ত্র থেকে বের করে নিতে হয় তখন, যখন অন্ত্র থেকে সমস্ত জল বেরিয়ে গেছে। সাইফন করা ডুশ ও সাধারণ অন্ত্র পরিষ্কার করার ডুশ — উভয়েই ব্যবহার করা হয় ঘরের উত্তাপযুক্ত জল।

দেহ উষ্ণ করার ব্যবস্থাগুলি। উষ্ণ করার ব্যবস্থাগুলি হয় সাধারণ উত্তাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা, অর্থাৎ যা কাজ করে গোটা দেহের উপরিভাগের ওপর এবং স্থানীয় উত্তাপ সৃষ্টির ব্যবস্থা, যা উষ্ণ করে শুধু দেহের বিশিষ্ট অংশকে। স্থানীয় তাপ সৃষ্টির ব্যবস্থাই ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়। উষ্ণকরণের বহুবিধ ব্যবস্থার মধ্যে সব চেয়ে বেশী প্রচলিত হয়েছে উত্তাপ সৃষ্টির কম্প্রেস ও গরম জলের ব্যাগ ব্যবহার

উত্তাপ সৃষ্টির কম্প্রেস, কম্প্রেস করা জায়গায় সৃষ্টি করে বর্দ্ধিত রক্তপ্রবাহ এবং তাতে করে সাহায্য করে বিভিন্ন ধরনের ফুলে শক্ত হয়ে যাওয়া জায়গার স্ফীতি হ্রাস করতে। জখম হওয়া (কেটে যাওয়া, ছড়ে যাওয়া) চামড়ার ওপর কম্প্রেস স্থাপন করা যায় না। তেমনি ফারাঙ্কুলোসিস, কার্বাঙ্কল প্রভৃতি চামড়ার ইনজেকশন জনিত ফোলা অবস্থাতেও কম্প্রেস দেওয়া উচিত নয়।

তাপ সৃষ্টি করার কম্প্রেস স্থাপন করতে হয় নিম্ন-লিখিত উপায়ে: এক টুকরো পরিষ্কার নেকড়া নিয়ে তাকে কয়েক ভাঁজ করে ১০-১৫ ডিগ্রী সে. তাপমাত্রায় ঠান্ডা জলে ভিজিয়ে, ভাল করে তাকে নিংড়ে নিয়ে স্থাপন করতে

হয় দেহের সেই জায়গার ওপর, যেখানে তাপ সৃষ্টি করতে হবে। নেকড়ার ওপর পাতা হয় তার চেয়েও একটু বড় সাইজ করে কাটা অয়েল-ক্লথ। আবার অয়েল ক্লথের ওপর পাততে হয় যথেষ্ট মোটা করে তুলোর এক স্তর। তারপর এই সবগুলিকে আটকানো হয় ব্যান্ডেজ করে। এমন শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধা হয় যাতে রক্তচলাচলে বাধা সৃষ্টি না হয়। বাঁধতে হয় এমন ভাবে যাতে স্থাপিত কম্প্রেস সরে না যায়।

কম্প্রেস ধরে রাখতে হয় ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা পর্যন্ত। কম্প্রেস খুলে নেওয়ার পর চামড়া যাতে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা না হয়ে যায় তার জন্য কম্প্রেসের জায়াগায় শুকনো ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে হয়। যদি জলে না ভিজিয়ে কম্প্রেসের নেকড়া ভেজানো হয় ৫০% স্পিরিটের সলিউশনে তাহলে সে কম্প্রেসে তাপ সৃষ্টি হয় অনেক বেশী এবং কম্প্রেস জনিত চামড়ার ম্যাসিরেশন (চামড়া ফুলে ওঠা ও কুঁচকে যাওয়া) দেখা দেয় কম।

গরম জলের ব্যাগ শুকনো উত্তাপ দান করে এবং ব্যবহৃত হয় যেমন দেহের কোন অপরিসর জায়গা তেমনি গোটা দেহ গরম করার জন্য। গরম জলের ব্যাগ হল এক চ্যাপ্টা চতুষ্কোণ অথবা গোল রবারের ব্যাগ যার মুখ ভাল করে বন্ধ করা যায় ঘোরানো খাপের সাহায্যে। তাতে ঢালা হয় গরম জল (যেকোন উত্তাপের) কানায় কানায় ভরতি করে নয়, তার অর্দ্ধেক বা ২/৩ অংশ ভরতি করে। তারপর সাবধাণে ব্যাগটির দেওয়াল চেপে ধরে তার ভেতরকার খালি জায়গার সমস্ত হওয়া বের করে দিয়ে শক্ত করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার খাপ আটকাতে হয়। ব্যাগটিকে

তারপর উল্টো করে ধরে পরীক্ষা করে নেওয়া হয় খাপ থেকে জল চোঁয়াচ্ছে কি না। এর পর খাপের জায়গা ভাল করে মুছে, ব্যাগটিকে তোয়ালেতে মুড়ে দিতে হয়। কোন কাপড় দিয়ে ব্যাগটিকে না জড়িয়ে সোজা দেহের ওপর রাখা উচিত নয় কেননা তাতে চামড়া পুড়ে যেতে পারে। তেমনি ভাবেই এক জায়গায় অনেকক্ষণ ধরে গরমজলের ব্যাগ ধরে রাখলেও গা পুড়ে যেতে পারে। অজ্ঞান হয়ে যাওয়া রোগীদের ও সেই সব রোগীদের যাদের শোথের জন্য অথবা স্নায়ু জখম হওয়ার জন্য চামড়ার অনুভূতি কম, তাদের গায়ে গরম জলের ব্যাগ দিলে সহজেই গা পুড়ে যায়। গরম জলের ব্যাগ কয়েক ঘণ্টা ধরে রাখা চলে কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, তা রোগীর সারা দেহকেও উত্তপ্ত করে।

দেহ ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থাগুলি। স্থানীয় শীতলীকরণ ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয় পেটের ভেতরকার কোন দেহাঙ্গের স্ফীতি হলে ও দেহ প্রান্তের কোন শিরার স্ফীতি হলে। সাধারণ ভাবে দেহের উত্তপ বর্দ্ধিত হলে, মস্তিষ্কের শোথ হলে বা অন্যান্য অবস্থায়। শীতলীকরণ পদ্ধতি স্ফীতি, কলার শোথ, ব্যথা প্রভৃতি কমায়। অপরিসর জায়গা ঠাণ্ডা করা যায় সে জায়গার ওপর বরফের ব্যাগ রেখে। বরফের ব্যাগ দেখতে চ্যাপ্টা, গোল এক রবারের থলে, যার ওপরের দিকে থাকে একটা বড় ফুটো, যাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মোচড় দিয়ে বন্ধ করা এক খাপ দিয়ে আটকে রাখা যায়। গায়ের ওপর বসানোর আগে ব্যাগটিকে তোয়ালে দিয়ে মুড়ে নিতে হয়, যাতে চামড়ায় তত বেশী ঠাণ্ডা না লাগে। বরফের ব্যাগ অনেকক্ষণ ধরে রাখা চলে (কয়েক দিন) কিন্তু এক

চিত্র 66: পাকস্থলী ধৌত করা
a — যেভাবে পাকস্থলীতে জল ঢোকাতে হয়;
b — যেভাবে জল বের করতে হয়

নাগাড়ে নয়। মাঝে মাঝে প্রতি ৩০ মিনিট অন্তর তা ১০-১৫ মিনিটের জন্য তুলে নিতে হয়। অতি শীতলীকরণের ফলে সে স্থানের জমে যাওয়া নিবারণ করা যায় যদি ব্যাগটিকে প্রতি ৩০ মিনিট পরপর তারই পাশের ঠাণ্ডা না হওয়া জায়গায় সরিয়ে বসানো হয়।

পাকস্থলী ধৌত করা। পাকস্থলী ধৌত করা সহজ হয় যদি তা করা যায় বসা অবস্থায় (চিত্র—৬৬)। কিন্তু এ কাজ দুর্দশাগ্রস্তের শোয়া অবস্থাতেও সম্পন্ন করা যায়। ধৌত করার কাজটি করা হয় বিশেষ রকমের রবারের নলের — পাকস্থলী টিউবের, সাহায্যে। রবারের নলটি জলসিক্ত করে রোগীর মুখের ভেতর প্রবেশ করিয়ে রোগীকে কোন জিনিষ গিলে ফেলার মত প্রচেষ্টা করাতে হয় এবং সে প্রচেষ্টার মুহূর্তে নলটিকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে হয় খাদ্যনালীতে এবং তারপর পাকস্থলীতে। ঢোকানো নলের অগ্রভাগ কোথায় অবস্থিত তা নির্ণয় করা হয় ঐ নলের গায়ে অঙ্কিত দাগগুলির ভিত্তিতে। পাকস্থলীতে তরল পদার্থ থাকলে তা নলের ভেতর দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে। নলের মুক্ত অগ্রভাগে তখন পরানো হয় কাঁচের চোঙ (funnel) যা পূর্ণ করা হয় জল দিয়ে। পাকস্থলী ধৌত করতে হয় ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না মনে হচ্ছে যে, পাকস্থলীর ভেতরকার সমস্ত অন্তর্বস্তু ধুয়ে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বিষক্রিয়া হলে পাকস্থলী ধৌত করার জলের সঙ্গে যোগ করতে হয় যথাযথ বিষ নষ্ট করার ওষুধ, এ্যাকটিভেটেড চারকোল, কার্বলেন।

নলটিকে বের করা হয় পাকস্থলী থেকে, সমস্ত তরল পদার্থ বের করে দেওয়ার পর।

পানীয় পান করানো। বিশেষ অবস্থানভঙ্গিতে থাকতে বাধ্য রোগীদের, বিশেষ করে শুয়ে থাকতে বাধ্য রোগীদের পান করানো তেমন সহজ কাজ নয়। পান করানো সবচেয়ে সুবিধাজনক চায়ের কেটলি অথবা বিশেষ পান করার পাত্রের সাহায্যে। প্রথমে পাত্রটিতে ঢালা হয় তরল পানীয় পদার্থ, তার মাত্র ১/৩ অংশ পূর্ণ করে। এরপর সাবধাণে বাম হাতের সাহায্যে রোগীর মাথা উঁচু করে ধরে ডান হাতের সাহায্যে পানপাত্রের নাক রোগীর মুখের কাছে আনা হয়। তরল পদার্থ রোগীর মুখের ভেতর ঢালতে নেই, রোগী সেই তরল পদার্থ সামান্য সামান্য করে পাত্র থেকে নিজে শুষে নিয়ে তা পান করবে যাতে তা তার শ্বাসের পথে চলে না যায়। অজ্ঞান অবস্থায় রোগীকে পান না করানোই ভাল। যদি চায়ের কেটলি না থাকে তা হলে যে কোন নলের সাহায্যে পান করানো যায়। নলের এক অগ্রভাগ থাকবে জলের পাত্রে, অপর অগ্রভাগ রোগীর মুখে এবং রোগী নিজে শুষে তা পান করবে। ভাল হয় যদি নলটি হয় নমনীয় রবারের বা প্লাষ্টিকেব নল।

বেড-প্যান দেওয়া — শায়িত অবস্থায় থাকা রোগীদের মলত্যাগ করার জন্য ব্যবহৃত হয় বিশেষ পাত্র — বেড-প্যান, যা রোগীর তলায় ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। বেড-প্যান হয় ধাতব বেডপ্যান, এনামেলের ও রবারের। বেডপ্যান রোগীর তলায় ঢোকাতে হয় সাবধাণে। রোগীর ত্রিকাস্থির নিচে বাম হাত ঢুকিয়ে তাকে সামান্য তুলে ধরে ডান হাত দিয়ে রোগীর তলায় স্থাপন করা হয় বেড-প্যান। পায়খানা

বা প্রস্রাব হয়ে যাওয়ার পর রোগীকে পরিষ্কার করা হয়— উষ্ণ জল ঢেলে ঢেলে তুলোর দলার সাহায্যে একই সঙ্গে গুহ্যদ্বারের চতুর্দিকের চামড়া পরিষ্কার করে দিতে হয়। তারপর বেড প্যান সরিয়ে নিতম্ব মুছিয়ে দেওয়া হয় শুকনো নেকড়া অথবা তুলোর দলার সাহায্যে।

অম্লজানপূর্ণ বালিশ থেকে অম্লজান দেওয়ার কায়দা। শ্বাসপ্রশ্বাসের অক্ষমতায় অনেক সময় রোগীদের অম্লজানের বালিশ থেকে শ্বাসের সঙ্গে অম্লজান গ্রহণ করতে দেওয়া হয়। সাধারণত অম্লজানের বালিশে থাকে ২০ লিটার অম্লজান ও কার্বনডাই অক্সাইড মেশানো গ্যাস। বালিশের সঙ্গে যুক্ত থাকে এক রবারের নল যার ওপর আটকানো থাকে এক কল। কলের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কতখানি অম্লজান যাবে। নলের অগ্রভাগে থাকে এক মুখদানী। মুখদানীর ওপরে দুই স্তর গজ জড়িয়ে তাকে রোগীর মুখের ওপর বসিয়ে খোলা হয় কল। অম্লজান বেরিয়ে আসে চাপসহকারে এবং রোগী শ্বাস নিলে তা সহজে ফুসফুসে চলে যায়। রোগীকে যে অম্লজান দিচ্ছে, তার লক্ষ্য রাখা দরকার রোগীর শ্বাসপ্রশ্বাস প্রক্রিয়ার প্রতি এবং অম্লজানের বালিশের কল খোলা দরকার তখন যখন রোগী নিঃশ্বাস গ্রহণ করছে। বালিশ থেকে অম্লজান দেওয়ার প্রক্রিয়াটির শেষের দিকে অম্লজানের চাপ বৃদ্ধি করা যায় বালিশের ওপর চাপ দিয়ে বা বালিশকে মুড়িয়ে। রোগীকে অম্লজান দিতে সাধারণত এক বালিশ অম্লজানে কুলায় মাত্র ৫ থেকে ৭ মিনিট। বেশী মিতব্যয়িতার সঙ্গে যদি অম্লজান দিতে হয় তাহলে, তা দিতে হয় নলের সাহায্যে যা রোগীর নাকের ভেতর ঢোকাতে হয়।

পরিশিষ্ট — ১

বিষজাত পদার্থ ও বিষক্ষয়কারক ব্যবস্থার তালিকা

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
হলদে বাবলা, ভাং	জলের মধ্যে এক্টিভেটেড চারকোল (কার্বোলেন) যোগ করে সেই জল দিয়ে পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া। লবণাক্ত জোলাপ, বিশ্রাম, দেহ গরম করে রাখা
এমোনিয়া, স্পিরিট অব এমোনিয়া	জলের সঙ্গে সাইট্রিক বা এসেটিক অম্ল মিশিয়ে সেই জল দিয়ে পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া। উল্লিখিত অম্লগুলির ১% সলিউশন পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা।
এনিলিন (এনিলিন মিশ্রিত রঙ, নাইট্রোবেঞ্জল, তলুইডিন)	শ্বাসের পথে এ বিষের বিষক্রিয়া হলে মুক্ত হাওয়ায় নিঃশ্বাসের সঙ্গে অম্লজান গ্রহণ, শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা। বিষ, সেবন করা হলে পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া, কার্বোলেন মেশানো জল দিয়ে। লবনাক্ত জোলাপ — ৩০

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
	গ্রাম এবং ১৫০ সি.সি. প্যারাফিন তেল, আগে পাকস্থলী ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়ে। বমি করার ওষুধ — এপোমর্ফিন। দুধ, স্নেহ জাতীয় পদার্থ; স্পিরিট গ্রহণ করা নিষেধ।
এট্রোপিন (ধুতুরা পাতা, বিষকাঁটালি, হাইওসসাইয়ামাস, স্ট্র্যামোনিয়াম)	পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া, জলের সঙ্গে কার্বোলেন যোগ করে অথবা ১:১০০০ পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট সলিউশন যার পর ঐ একই নলের ভেতর দিয়ে পাকস্থলীতে ভরে দিতে হয় জোলাপের ওষুধ। বিশ্রাম, বিছানায় শুইয়ে রাখা, মাথায় ঠাণ্ডা প্রয়োগ করা। দুর্বলতা দেখা দিলে এক বড়ি কেফিন, শ্বাসপ্রশ্বাসের গণ্ডগোলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা, নিঃশ্বাসের সঙ্গে অম্লজান গ্রহণ করতে দেওয়া।
বেঞ্জল, পেট্রোল, কেরাসিন, এসেটিলিন	এগুলির বাষ্প থেকে বিষক্রিয়া হলে প্রয়োজন — নিঃশ্বাসের সঙ্গে

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
	অম্লজান গ্রহণ, মুক্ত হাওয়া, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা, দেহ গরম করে রাখা, মুখ দিয়ে গ্রহণ করতে দেওয়া কেফিন, এস্কর্বিক অম্ল (ভাইটামিন C)। এগুলি মুখ দিয়ে গ্রহণ করার বিষক্রিয়া হলেও দিতে হয় ঐ একই সাহায্য এবং তাছাড়াও দরকার, জলের সঙ্গে কার্বোলিন যোগ করে তাই দিয়ে পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া। জোলাপের ওষুধ—ক্যাস্টর-অয়েল দেওয়া, পান করতে দেওয়া কড়া করে তৈরী কালো কফি, গরম দুধ।
বোরিক অম্ল	জলের সঙ্গে কার্বোলেন যোগ করে, তাই দিয়ে পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া। পান করতে দেওয়া প্রয়োজন ২০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড এক গেলাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে; এর ৫-১০ মিনিট পর

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
	ক্যালসিয়াম অক্সাইডের জল টেবিলচামচের এক চামচ, দুধ, লবণাক্ত জোলাপের ওষুধ।
বাখারি চুন	পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া—এসেটিক অম্ল যোগ-করা জলের সাহায্য। পান করতে দেওয়া প্রয়োজন ১% সাইট্রিক অথবা এসেটিক অম্লের সলিউশন, দুধ, ডিমের সাদা অংশ।
আয়োডিন, লুগ্‌ল'র সলিউশন, আয়োডোফর্ম	এগুলি ভেতরে গ্রহণ করে থাকলে প্রয়োজন — ০·৫% সোডিয়াম থাইওসালফেট সলিউশন দিয়ে পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া অথবা পান করতে দেওয়া ২ থেকে ৩ গেলাস ৫% সোডিয়াম থাইওসাল্‌ফেট সলিউশন, পাতলা শ্বেতসারের সরবৎ, দুধ, ভাতের মাড়, ২০ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ১ বা ২ গেলাস জলের সঙ্গে মিশিয়ে অথবা জল তার সঙ্গে কার্বোলেন মিশিয়ে। ওগুলির বাষ্প থেকে

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
	যদি বিষক্রিয়া হয়ে থাকে, তখন প্রয়োজন — মুক্ত হাওয়া, নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা ২% সোডিবাই কার্ব সলিউশন, ৫% সোডিয়াম সাল্‌ফেট সলিউশনের বাষ্প।
কোকেইন, ডিকেইন, প্রোকেইন	পাকস্থলী ধুয়ে পরিষ্কার করে দিতে হয়, জলের সঙ্গে কার্বোলেন মিশিয়ে অথবা ০·১% পার্টসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট সলিউশন দিয়ে। দরকার, ২-৩ ফোঁটা নাইট্রোগ্লিসা-রিন পান করতে দেওয়া, রোগীর দেহ গরম করে রাখা, পান করতে দেওয়া গরম কফি, মদ; নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে দেওয়া অম্লজান, শ্বাসপ্রশ্বাসের গণ্ডগোল দেখা দিলে, হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হলে দরকার বাইরে থেকে হৃৎপিণ্ড মালিশ করা।
মর্ফিয়া, কোডেইন ডাইওনিন, হিরোইন,	কার্বোলেন মেশানো জল দিয়ে অথবা ০·১% পটাসিয়াম

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
ওপিয়াম, অম্নাপোন	পার্ম্যাঙ্গানেট সলিউশন দিয়ে কয়েক বার পাকস্থলী ধ্বুয়ে দেওয়া, লবণাক্ত জোলপা দেওয়া। নিঃশ্বাসের সঙ্গে অম্লজান দেওয়া, পান করতে দেওয়া ৬ থেকে ৮ ফোঁটা এট্রোপিন সাল্ফেট। শ্বাসের গণ্ডগোল দেখা দিলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা। শান্ত পরিবেশ, মাথায় বরফ, ওষ্বধ দেওয়া এতে নিষেধ।
আর্সেনিক ও আর্সেনিক যুক্ত ওষ্বধ	এগ্বলির বিষক্রিয়ায় দরকার — কার্বোলেন মেশানো জল দিয়ে অথবা ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড সলিউশন দিয়ে (২০ গ্রাম, ১ লিটার জলে) অথবা আর্সেনিকের প্রতিশেধক সলিউশন দিয়ে (১০০ সি. সি. ২ থেকে ৪ লিটার জলে) অনেকক্ষণ ধরে এবং অনেকবার পাকস্থলী ধ্বুয়ে দেওয়া। প্রতি ৫ মিনিট অন্তর ১ চামচ করে আর্সেনিকের প্রতিশেধক অথবা ধাতব বিষ প্রতিশেধক পান করতে

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
	দেওয়া, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড দেওয়া দরকার। লবণাক্ত জোলাপ, দুধ, মাখন দেওয়া ও শরীর গরম করে রাখা উচিত। পেটের ওপর রাখতে হয় গরম জলের ব্যাগ।
ডিজিটালিস পার্পিউরিয়া, এডোনিস ভের্নালিস, কনভ্যাল্লরিয়া মাজালিস, এডনিসিডাম, ডিজিটালিস লান্তা	কার্বোলেন মেশানো জল দিয়ে পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া, বিশ্রাম, বিছানায় শোয়া অবস্থায় থাকা, নিঃশ্বাসের সঙ্গে অম্লজান গ্রহণ করা, লবণাক্ত জোলাপ দেওয়া, মুখ দিয়ে ৬ থেকে ৮ ফোঁটা ০·১% এট্রোপিন সাল্‌ফেট সলিউশন পান করা। এতে বমি করানোর ওষুধ দেওয়া নিষেধ।
সীসা, লেডঅক্সাইড, লেডঅ্যাসিটেট ও অন্যান্য দস্তা যুক্ত ওষুধ	এগুলির বিষক্রিয়ায় দরকার বমি করানোর ওষুধ (এপোমর্ফিন) সেবন করানো ও সোডিয়াম বা ম্যাগনেসিয়াম সাল্‌ফেট সলিউশন,

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
	ধাতব বিষ নাশক দেওয়া। পাকস্থলী ধুয়ে দেওয়া, সোডিয়াম সাল্‌ফেট সলিউশন বা জলের সঙ্গে মেশানো এক্টিভেটেড চারকোল সলিউশন বা ধাতব বিষ প্রতিশেধক সলিউশন দিয়ে। দিতে হয় লবণাক্ত জোলাপ, আর কলিকে — এট্রোপিন, নো-স্পা, গরম জলে চান।
হাইড্রোসাইয়ানিক অম্ল (সাইয়ানাইড গ্যাস, পোটাসিয়াম সাইয়ানাইড ও অন্যান্য)	যদি বিষ প্রবেশ করে থাকে শ্বাসপথে, তাহলে প্রয়োজন — রোগীকে সে বিষাক্ত পরিবেশ থেকে সরিয়ে নেওয়া; মুক্ত হাওয়া, নিঃশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করা এমিলনাইট্রেট গ্যাস, অম্লজান। বিষ মুখ দিয়ে গৃহীত হলে অবিলম্বে পাকস্থলী ধুয়ে দিতে হয় পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট সলিউশন দিয়ে তার সঙ্গে এক্টিভেটেড চারকোল যোগ করে, অথবা ১-৩% হাইড্রোজেন পেরক্সাইড সলিউশন দিয়ে বা ৫%

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
	সোডিয়াম থিওসাল্‌ফেট সলিউশন দিয়ে। দরকার, নিঃশ্বাসের সঙ্গে অম্লজান দেওয়া, প্রয়োজন হলে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করা।
মিথাইল এলকোহল (মেথানল)	এর বিষক্রিয়ায় প্রয়োজন — অনেক পরিমাণে ক্ষারীয় জল যেমন, সোডার জল পান করতে দেওয়া, ঐ সব জল দিয়েই পাকস্থলী ধৌত করে দেওয়া। দিতে হয় লবণাক্ত জোলাপ, পান করতে দিতে হয় ৩০% (১০০ সি. সি.) ইথাইল এলকোহল ও তারপর প্রতি ২ ঘণ্টা অন্তর তা ৫০ সি. সি. করে।
স্ট্রিচ্‌নিন	একটুও সময় নষ্ট না করে ০·১% পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট সলিউশনের সঙ্গে এক্টিভেটেড চারকোল মিশিয়ে তাই দিয়ে পাকস্থলী ধৌত করে দিতে হয়, রোগীকে বমি করাতে হয়,

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
	মুখ দিয়ে দিতে হয় এক্টিভেটেড চারকোল ও লবণাক্ত জোলাপের ওষুধ। রোগীর বিশ্রাম প্রয়োজন।
সুলেমা, ক্যালোমেল, পারদ যুক্ত লবণ	এর বিষক্রিয়ায় অম্ল পানীয় পান করতে দেওয়া নিষেধ, ভিনিগার দেওয়াও নিষেধ। অবিলম্বে মুখ দিয়ে দিতে হয় ধাতব বিষনাশক। সেই বিষনাশকই জলের সঙ্গে মিশিয়ে তা দিয়ে পাকস্থলী ধৌত করে দিতে হয়। মুখ দিয়ে গ্রহণ করতে দিতে হয় এক্টিভেটেড চারকোল, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, দুধ, এলবুমিন, ভাতের ফ্যান। প্রতি ঘণ্টায় হাইড্রোজেন পেরক্সাইড সলিউশন অথবা পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট সলিউশন দিয়ে কুলকুচি করাতে হয়। দেহ গরম করে রাখতে হয়, গরম জলে চান করাতে হয়।
ফসফরাসের সঙ্গে জৈব পদার্থের	এই সব পদার্থ চামড়ায় পড়লে তা ধুয়ে ফেলতে ১০% এমোনিয়া

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
সংযোগে সৃষ্ট মিশ্র পদার্থ (পাইরোফস, ফস্ফোনল, থিওফস, ক্লোরফস, কার্বোফস, ট্রাই-ক্লোর-মেটাফস ও অন্যান্য)	সলিউশন অথবা ৫% সোডা সলিউশন দিয়ে। পাকনালীতে পড়লে পাকস্থলী ধৌত করে দিতে হয় একটিভেটেড চারকোল মেশানো জলের সঙ্গে ২% সোডি বাইকার্ব সলিউশন মিশিয়ে সেই জল দিয়ে। প্রচুর পরিমাণে পান করতে দিতে হয় ২% সোডি বাই কার্ব সলিউশন, দেওয়া দরকার লবণাক্ত জোলাপ। শ্বাসের গণ্ডগোল দেখা দিলে দিতে হয় নিঃশ্বাসের সঙ্গে অম্লজান, করতে হয় কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা।
ক্লোরিন, কোরিনেটেড ওয়াটার অথবা ব্লিচিং পাউডার, ক্লোরামিন ক্লোরাসিড ও অন্যান্য	শ্বাসপথে বিষক্রিয়া হলে — রোগীকে তৎক্ষণাৎ বিষাক্ত পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হয়। হাওয়া, দেহ গরম করে রাখা, নিশ্বাসের সঙ্গে অম্লজান দেওয়া, গরম জলীয় বাষ্পের সঙ্গে স্পিরিট অব এমোনিয়ার বাষ্প গ্রহণ করতে দেওয়া প্রয়োজন। পাকপথে বিষক্রিয়া হলে — তৎক্ষণাৎ

বিষের নাম	সে বিষের বিষক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য
	পাকস্থলী ধৌত করে দিতে হয় পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট সলিউশন দিয়ে, তার সঙ্গে একটিভেটেড চারকোল যোগ করে অথবা ৩% হাইড্রোজেন পেরক্সাইড সলিউশন দিয়ে, বা ৫% সোডিয়াম থাইওসাল্‌ফেট সলিউশন দিয়ে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে দিতে হয় অম্লজান আর দরকার পড়লে কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাস পরিচালনা করতে হয়।

পরিশিষ্ট — ২

বিভিন্ন উগ্র বিষক্রিয়ার সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা (প্রতিশেধকের সাহায্যে)

বিষাক্ত পদার্থ যা থেকে বিষক্রিয়া হচ্ছে	তার প্রতিশেধক পদার্থ
এনিলিন, পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট	মেথিলিন ব্লু (১% সলিউশন), এসকর্বিক অম্ল (৫% সলিউশন)
রক্ত জমাট-বাঁধা বন্ধ করার ওষুধ — হেপারিন ও অন্যান্য পদার্থ	প্রোটামিন সাল্‌ফেট (১% সলিউশন) ভিটামিন K (১% সলিউশন)
এট্রোপিন	পিলোকার্পিন (১% সলিউশন); প্রোজেরিন (০·০৫% সলিউশন)
বার্বিটিউরেট যুক্ত ওষুধ	বেমেগ্রিড (০·৫% সলিউশন)
বেরিয়াম ও বেরিয়াম যুক্ত লবণ	ম্যাগনেসিয়াম সাল্‌ফেট (২৫% সলিউশন ১০০ সি. সি.) সেব্য
আইসোনিয়াজাইড টিভাজিড	ভিটামিন B_6 (৫% সলিউশন)

বিষাক্ত পদার্থ যা থেকে বিষক্রিয়া হয়েছে	তার প্রতিশেধক পদার্থ
অম্ল	সোডিয়াম হাইড্রোকার্বনেট (৪% সলিউশন)
ভারী ধাতু (পারদ, আর্সেনিক, সীসা, তামা প্রভৃতি)	ইউনিথল (৫% সলিউশন), টেটাসাইন ক্যালসিয়াম (১০% সলিউশন)
মিথাইল এলকোহল (মেথানল), ইথাইলেন গ্লাইকল	ইথাইল এলকোহল ৩০% সলিউশন মুখ দিয়ে গ্রহণ; ৫% সলিউশন শিরার ভেতর দিয়ে গ্রহণ
আর্সেনিক হাইড্রক্সাইড	মেকাপটিড (৪০% সলিউশন)
এলকালয়েড, ঘুমের ওষুধ, শুষে নেওয়া সাধারণ পদার্থ, ভারী ধাতুর মিশ্র পদার্থ ইত্যাদি	একটিভেটেড কার্বন (কার্বোলেন)
সিলভার নাইট্রেট	সোডিয়াম ক্লোরাইড (২-৫% সলিউশন)

বিষাক্ত পদার্থ যা থেকে বিষক্রিয়া হয়েছে	তার প্রতিশেধক পদার্থ
কার্বন মনক্সাইড, হাইড্রোজেন সাল্ফাইড	নিঃশ্বাসের সঙ্গে অম্লজান গ্রহণ করা
প্যাচিকার্পিন	প্রোজেরিন (০·৫% সলিউশন) A.T.F. (১% সলিউশন) ভিটামিন B_1 (৫% সলিউশন)
আফিং জাতীয় প্রোমেডল, কোডেইন ওষ্ধ (মর্ফিন, ও অন্যান্য)	এট্রোপিন সাল্ফেট (০·১% সলিউশন); নালর্ফিন (০·৫% সলিউশন)
হৃৎরোগের গ্ল্কোসাইড	টেটাসাইন — ক্যালসিয়াম (১০% সলিউশন), পটাসিয়াম ক্লোরাইড (০·৫% সলিউশন); এট্রোপিন সাল্ফেট (০·১% সলিউশন)
সাইয়ানিক অম্ল	সোডিয়াম নাইট্রেট (১% সলিউশন), সোডিয়াম থাইওসাল্ফেট (৩০%

বিষাক্ত পদার্থ যা থেকে বিষক্রিয়া হয়েছে	তার প্রতিশেধক পদার্থ
	সলিউশন), ক্রোমস্মন (১% সলিউশন)
সাপের কামড়	সাপের সুনির্দিষ্ট বিষনাশক সিরাম
ফর্মালিন	এমোনিয়াম ক্লোরাইড (৩% সলিউশন) অথবা এমোনিয়াম কার্বনেট (৩% সলিউশন)
ফসফরাস ও জৈব পদার্থে সৃষ্ট মিশ্র পদার্থ	কোলিন এষ্টারেজের কাজ জোরদার করবার ওষুধ — ডিপাইরক্সিম (১৫% সলিউশনের ১ সি. সি), আইসোনাইট্রোসিন (৪০% সলিউশনের ৩ সি. সি) এট্রোপিন সাল্‌ফেট (০·১% সলিউশন)

পরিশিষ্ট — ৩

ডাক্তারের প্রত্যক্ষ সাহায্যপূর্ব প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়ার বিদ্যালাভের শিক্ষার্থীদের, নিজের জ্ঞান নিজে পরখ করার কতগুলি অবস্থাভিত্তিক সমস্যাযুক্ত প্রশ্ন।

১. ওপর থেকে কাঁচ পড়ে রোগীর পুরোবাহুর সামনের দিকের উপরিভাগে সৃষ্টি হয়েছে কাটা ক্ষত। ক্ষত থেকে ফিনকি দিয়ে পড়ছে, শিরার রক্ত। হাতের কাছে রক্তবন্ধের বিশেষ ব্যবস্থা কিছুই নেই — না আছে বন্ধনী বাঁধার নির্বীজিত (স্টেরাইল) সামগ্রী। সাহায্যকারীর কাছে আছে শুধু নাক মোছা রুমাল, এথাক্রিডিন ল্যাক্টেট সলিউশন (রিভানল), ইলেকট্রিক ইস্তিরি ও উনুনের ওপর ফুটন্ত চায়ের কেটলী।

এমতাবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে পর্যায়ক্রমে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১ নং পরিচ্ছেদের "বন্ধনী বাঁধার সামগ্রী ও তার নির্বীজিতকরণ" নামক আলোচিত অংশ; ২ নং পরিচ্ছেদ (উর্দ্ধ ও নিম্ন দেহপ্রান্তের বন্ধনী)।

২. ফুটন্ত তরল পদার্থ পড়ে উরু ও জঙ্ঘায় II-III ডিগ্রীর দাহক্ষত হয়েছে। সাহায্যকারীর হাতের কাছে না আছে জল, না আছে নির্বীজিত বন্ধনীর সামগ্রী, নিজের হাতও ময়লা। হাতের কাছে আছে শুধু শিশিতে ভরা

সোরিগেল ও পটাসিয়াম পার্ম্যাঙ্গানেট সলিউশন ও নাক মোছার কয়েকটি রূমাল।

এমতাবস্থায় প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে কী করতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন, ১নং পরিচ্ছেদের "রাসায়নিক এণ্টিসেপ্টিক পদার্থ", "হাতের পরিচর্য্যা করা ও গ্লোভস্ নির্বীজিতকরণ" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ; ২নং পরিচ্ছেদ (উর্দ্ধ ও নিম্ন দেহপ্রান্তের বন্ধনী); ৩নং পরিচ্ছেদ; ১০নং পরিচ্ছেদ — দাহ ক্ষত।

৩. ভোঁতা অস্ত্রের আঘাতের ফলে নাক থেকে প্রচুর রক্ত পড়তে আরম্ভ করল। হাতের কাছে আছে শুধু তুলো ও কয়েক পল ন্যাক্ড়া (বহরে ৫ সেণ্টিমিটার লম্বায় ৫০ সেণ্টিমিটার)। কোন পরম্পরায় ও কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ৭নং পরিচ্ছেদের "কতিপয় বাহ্যিক ও দেহের অভ্যন্তরে রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য" নামক অংশটি ও ২নং পরিচ্ছেদের "ফিতে যুক্ত বন্ধনী"।

৪. এক যুবক বক্ষে ছুরিকাহত হয়। তার ডান দিকের অক্ষকাস্থির নীচে পরিলক্ষিত হচ্ছে ৩×১·৫ সেণ্টিমিটার মাপের এক কাটা জখম, যার ভেতর দিয়ে বের হচ্ছে ফেনাযুক্ত রক্ত। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদাতার হাতের কাছে আছে শুধু এক শিশি টিংচার আয়োডিন, অনির্বীজিত (স্টেরাইল না-করা) এক পলিএথিলিনের থলে ও অনির্বীজিত ব্যাণ্ডেজ।

এক্ষেত্রে কীভাবে দিতে হবে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য?

উত্তরের জন্য দেখুন ২নং পরিচ্ছেদ (বক্ষপিঞ্জরের ওপর

বন্ধনী বাঁধা); ৮ নং পরিচ্ছেদে "মাথা, বক্ষ ও পেটের জখমে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের বিশেষত্ব" নামক আলোচিত অংশ।

৫. ছুরিকাঘাতে জানুপশ্চাতের ধমনী থেকে আরম্ভ হয়েছে ভীষণ রক্তপাত। আপনার কাছে সাহায্য দেবার না আছে কোন যন্ত্রপাতি, না আছে বন্ধনী বাঁধার কোন সামগ্রী। আছে শুধু নিজের পরিহিত জামা কাপড়।

প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে কোন কোন পরম্পরায় কী কী করতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ৭ নং পরিচ্ছেদ, ৩ নং পরিচ্ছেদ (দুর্দশাগ্রস্তের পরিবহণ)।

৬. রাস্তায় আপনি দেখলেন একটি লোক পড়ে আছে, যার জীবনের কোন লক্ষণ নেই। লোকটি অজ্ঞান, তার বুক ওঠা-নামা করছে না, স্পর্শ করে নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না। কী ভাবে নির্ণয় করতে হবে — লোকটি বেঁচে আছে না মরে গেছে? উত্তরের জন্য দেখুন ৩নং পরিচ্ছেদ।

৭. আপনার সামনে যেতে যেতে একটি লোক হঠাৎ চিৎকার করে উঠে পড়ে গেল। আপনি ওর কাছে পেঁছুতে পেঁছুতে ওর দেহপ্রান্তগুলির নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। দেখলেন, তার মুঠিবদ্ধ হাতে ইলেকট্রিক পোষ্ট থেকে ঝোলা এক নগ্ন ইলেকট্রিকের তার। তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে আপনাকে পর্যায়ক্রমে কী করতে হবে? উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "বৈদ্যুতিক জখম ও বজ্রাঘাত" নামক আলোচিত অংশ।

৮. জল থেকে তোলা হল একটি ডুবে-যাওয়া লোককে, যার জীবনের সমস্ত চিহ্ন অন্তর্হিত। নাড়ী নেই,

শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বন্ধ, হৃৎপিন্ডের সঙ্কোচনের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান করতে এ ক্ষেত্রে কী করতে হবে? উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "ডুবে যাওয়া, দম বন্ধ হওয়া, মাটির ধ্বসে চাপা পড়া" নামক আলোচিত অংশ; ৫নং পরিচ্ছেদের "রক্ত চলাচল বন্ধে পুনরুজ্জীবিতকরণ" বিষয়ে আলোচিত অংশ।

৯. পাহাড় থেকে স্কী-করে নামতে নামতে একজন লোক পড়ে গেল। তার নিম্নপায়ে দেখা দিল ভীষণ ব্যথা, একটু নড়া-চড়াতেই যা বৃদ্ধি পায়। লোকটি পায়ে ভর দিয়ে উঠতে পারছেনা। তার চরণ অস্বাভাবিক ভাবে বাইরের দিকে ঘোরানো, কিন্তু চামড়ার অবিচ্ছিন্নতা রক্ষিত। এ ক্ষেত্রে জখমের চরিত্র কী ও কীভাবে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া দরকার? উত্তরের জন্য দেখুন ৯নং পরিচ্ছেদের "অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা" নামক আলোচিত অংশ।

১০. মোটরগাড়ী দুর্ঘটনায় আহত হল দুজন লোক। এক জনের জামা-কাপড় ও মুখমন্ডল রক্তে মাখা, কপালে রয়েছে ৩ সেণ্টিমিটার লম্বা কাটা জখম, যা থেকে রক্ত ঝরছে। তার জ্ঞান আছে, তবে খুব উদ্বিগ্ন, নাড়ী ও শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক। দ্বিতীয় ব্যক্তির গায়ে বাইরে থেকে কোন জখমের দাগ নেই, বলছে মাথা ব্যথা করছে, গা বমি বমি করছে, দুর্ঘটনা কী ভাবে হল তার মনে নেই।

জখম কি গুরুতর? কোন্ রোগীকে আগে সাহায্য দিতে হবে? ওদের দুজনের কাকে প্রথমে হাসপাতালে পাঠানো দরকার?

উত্তরের জন্য দেখুন ৯নং পরিচ্ছেদ।

১১. দুর্দশাগ্রস্ত অজ্ঞাত এক তরল পদার্থ পান করেছে এবং ঠিক তার পরই অনুভব করতে আরম্ভ করেছে মুখে, উরঃফলকের পেছনে ও পেটে সাঙ্ঘাতিক ব্যথা। দেখা গেল লোকটি ভীষণ উদ্বিগ্ন, ব্যথায় ছট্‌ফট্‌ করছে, বারে বারে বমি হচ্ছে, বমিতে রক্ত মেশানো। ঠোঁট, জিহ্বা, মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর ওপর পড়েছে পরত ও ছাল ওঠা-ওঠা ভাব, রঙ হল্‌দেটে সবুজ, শ্বাসের কষ্ট হচ্ছে।

কিসের বিষক্রিয়া হয়েছে তার? কিভাবে প্রাথমিক সাহায্য দিতে হবে তাকে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "ঘনীভূত অম্ল ও ক্ষয়কারক ক্ষারের বিষক্রিয়া" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

১২. গরম রৌদ্রতপ্ত দিনে চানের ঘাটে এক ব্যক্তির শরীর খুব খারাপ করতে লাগল। দেখা দিল মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, বমি, শ্বাসকষ্ট, কান ভোঁ ভোঁ করা। পরীক্ষা করে দেখা গেল তার নাড়ী খুবই দুর্বল — গতি মিনিটে ১২০, শ্বাসপ্রশ্বাস অগভীর, মিনিটে ৪০; কথার উচ্চারণ জড়ানো।

ঐ অবস্থার কারণ কী? কিভাবে তাকে প্রাথমিক সাহায্য দিতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "তাপাঘাত ও সূর্য্যাঘাত" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

১৩. এক ব্যক্তি হঠাৎ অনুভব করতে আরম্ভ করল কানে ব্যথা, কি যেন তার কান ফুটো করছে, কানের ভেতর কড় কড় করছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল শ্রবণপথের গভীরে নড়ছে একটা পোকা।

কীভাবে তাকে দিতে হবে প্রাথমিক সাহায্য?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "কান, নাক, চোখ, শ্বাসপথ এবং পাকস্থলী ও অন্ত্র পথে ঢুকে পড়া বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

১৪. এক রোগী মলত্যাগ করতে যাওয়ার পর হঠাৎ তার মাথা ঘুরতে আরম্ভ করল, তারপর সে অজ্ঞান হয়ে গেল। পরীক্ষা করে দেখা গেল রোগীর গায়ের রঙ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, তার ঠাণ্ডা ঘাম হচ্ছে, নাড়ী দুর্বল — মিনিটে ১৩০। দেখা গেল পায়খানার বেসিনে রয়েছে অনেক পরিমাণ আলকাতরার মত কালো রঙের তরল পদার্থ, যা থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া ও গুরুতর অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার কারণ কী? তাকে কী ধরনের প্রাথমিক সাহায্য দিতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "পেটগহ্বরের দেহাঙ্গগুলির প্রকট অসুখ" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

১৫. একটি রুগ্ন শিশুকে পরীক্ষা করার জন্য আপনাকে ডাকা হয়েছে। গিয়ে দেখলেন শিশু বিছানায় শুয়ে আছে, সামান্যতম উত্তেজনায় পরিলক্ষিত হচ্ছে তার দেহের সমস্ত মাংসপেশীর খিঁচুনি। দৃষ্টি আকৃষ্ট হচ্ছে তার মুখমণ্ডলের মাংসপেশীগুলির ভীষণ সংকোচনের প্রতি। শিশু মুখ খুলতে পারছেনা। তার নিম্ন দেহপ্রান্তে ছড়ে যাওয়া জায়গার নীচে দেখা যাচ্ছে এক ছোট জখম। শিশুর ঐ গুরুতর অবস্থার কারণ কী? কীভাবে দিতে হবে তাকে প্রাথমিক সাহায্য? উত্তরের জন্য দেখুন ৮ নং পরিচ্ছেদ (টিটেনাস)।

১৮. ইলেকট্রিক ট্রেনে একজন যাত্রীর অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে পড়ল। তার উরঃফলকের পেছনে দেখা দিল ভীষণ ব্যথা, যা ছড়িয়ে পড়তে লাগল তার বাম হাত ও বাম কাঁধে। রোগী অনুভব করতে লাগল হাওয়ার অসংকুলান, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা। তার মুখের চেহারায় ভীতির ভাব, রঙ ফ্যাকাশে; নাড়ী — মিনিটে ৫০, দুর্বল, শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত।

যাত্রীটির গুরুতর অবস্থার কারণ কী? কীভাবে তাকে প্রাথমিক সাহায্য দিতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "হৃৎপিণ্ডের মাইওকার্ডিয়ামের ইনফার্কশন" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

১৭. মোটরগাড়ী দুর্ঘটনায় এক যাত্রীর নিম্ন দেহপ্রান্ত দুটি, কাত হয়ে পড়া গাড়ীর তলায় চাপা পড়ে যায়। দুঘন্টা ধরে পায়ের ওপর থেকে সে চাপ মুক্ত করা যায়নি।

এমন দুর্দশাগ্রস্তকে দেহপ্রান্ত চাপমুক্ত করার পর কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া দরকার? উত্তরের জন্য দেখুন ৯ নং পরিচ্ছেদ।

১৮. শিশুর ওপর নজর না রাখায় সে অনেকগুলি এনালজিন ট্যাবলেট গিলে ফেল্‌ল।

শিশুটিকে কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে?

উত্তরেরর জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "ওষুধের ও এলকোহলের বিষক্রিয়া" নামক অংশ।

১৯. এক ব্যক্তি অনেকক্ষণ ধরে একটুও নড়াচড়া না করে দাঁড়িয়ে ছিল রাস্তায়, ঠাণ্ডা আঁট জুতো পরে। হাওয়ার তাপমাত্রা ছিল তখন ১০ থেকে ১৫ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড।

বাসায় ফেরার পর তার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর হয় ও দুই পায়ের পাতা ব্যথা করতে আরম্ভ করে। পায়ের পাতা বেগুণী রঙ ধারণ করে, ফুলে ওঠে ও স্ফীতি বিস্তৃত হয় নিম্ন পায়ে। পায়ের পাতার পিঠে দেখা দেয় সাদা রঙের জল নিয়ে ফুলে-ওঠা কতগুলি ফোস্কা। পায়ের আঙ্গুলের চামড়া বোধশক্তি বিহীন, পায়ের ওপর চাপ দিলে ভীষণ ব্যথা অনুভূত হয়।

জখমের চরিত্র কী? কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১০ নং পরিচ্ছেদের "তুষারাঘাত" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

২০. যান্ত্রিক কাজের সাবধাণতার নিয়ম লঙ্ঘন করার ফলে এক শ্রমিক তার নিম্নবাহুতে চক্রাকারের করাতের আঘাত পায়। তার নিম্ন বাহুর মাঝে তৃতীয়াংশের সামনের দিকে সৃষ্টি হয় আড়াআড়ি গভীর, উন্মুক্ত ক্ষত। ভেতর থেকে মাঝে মাঝে দমকে দমকে ফিনকি দিয়ে উজ্জ্বল লাল রঙের রক্ত বেরোচ্ছে। দুর্দশাগ্রস্ত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে, সারা দেহে তার ঘাম।

এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের বিভিন্ন ব্যবস্থাগুলি প্রয়োগের পরম্পরা কিসের ওপর নির্ভর করে? দুর্দশাগ্রস্তের রক্তপাত এ কেসে কোন্ ধরনের (শিরার রক্তপাত না ধমনীর রক্তপাত)? কোন্ ব্যবস্থা অবলম্বন করে রক্ত থামাতে হবে? তারপর আপনি আর কি করবেন?

উত্তরের জন্য দেখুন ২ নং, ৬ নং, ৭ নং পরিচ্ছেদ;

৩ নং পরিচ্ছেদ (দুর্দশাগ্রস্তের পরিবহণ, পরিবহণের সময় দুর্দশাগ্রস্তের অবস্থানভঙ্গি)।

২১. হাওয়া ঢোকার ব্যবস্থাবিহীন এক মোটরগাড়ির গ্যারেজে দেখা গেল, একটি গাড়ির কাছে, যার ইঞ্জিন চালু অবস্থায় রয়েছে, পড়ে আছে এক ব্যক্তি অজ্ঞান হয়ে। তার ফ্যাকাশে হয়ে-যাওয়া চামড়ায় স্থানে স্থানে দেখা যাচ্ছে উজ্জ্বল লাল রঙের ছোপ-ছোপ দাগ। শ্বাসের কাজ বন্ধ, নাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না, চোখের তারা স্ফীত, স্টেথিস্কোপ দিয়ে শোনা যাচ্ছে বিরল, অস্পষ্ট হৃৎপিন্ড সংকোচনের আওয়াজ।

লোকটির কী হয়েছে? দুর্দশাগ্রস্তের অবস্থার কী মূল্যায়ন করবেন? অবিলম্বে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার এবং তারপর কোন্ পরম্পরায় প্রাথমিক সাহায্যের আরও কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "কার্বনমনক্সাইড গ্যাসের বিষক্রিয়া" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ; ৫নং পরিচ্ছেদের "শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধে পুনরুজ্জীবিতকরণ" বিষয়ে আলোচিত অংশ।

২২. নিম্ন দেহপ্রান্তের ভেরিকোজ ভেনের অসুখে অনেক দিন ধরে ভোগা এক বয়স্কা মহিলার ভেরিকোজ শিরার গুটি ছিঁড়ে গিয়ে জঙ্ঘার পাশের দিক থেকে অধিক রক্ত-পাত আরম্ভ হল, ক্ষত থেকে ধারার মত পড়তে থাকল কালচে রঙের রক্ত। যথেষ্ট রক্তক্ষয় হয়েছে, কেননা চারপাশের সমস্ত জিনিষ রক্তে ভেজা, নাড়ীর গতি মিনিটে ১০০, চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে।

কোন ধরনের এই রক্তপাত? এই ধরনের রক্তপাত বন্ধ

করার নিয়ম কী? অনুরূপ প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যদান করার ব্যবস্থাগুলি কোন্ পরম্পরায় প্রয়োগ করতে হয়?

উত্তরের জন্য দেখুন ৭ নং পরিচ্ছেদ (প্রকট রক্তশূন্যতা) এবং সেই অংশ, যেখানে আলোচিত হয়েছে "বিভিন্ন ধরনের রক্তপাত" সম্বন্ধে; ২নং পরিচ্ছেদ (ব্যাণ্ডেজ দিয়ে বন্ধনী বাঁধার মূল কায়দাগুলি)।

২৩. আপনার সম্মুখে চলতে চলতে একজন পুরুষ মানুষ হঠাৎ পড়ে গেল। পড়ে যাওয়া লোকটির কাছে গিয়ে আপনি দেখলেন, লোকটি সমস্ত শক্তি দিয়ে শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে, মুখমণ্ডল নীলাভ, চোখের তারা স্ফীত, নাড়ী পাওয়া যাচ্ছেনা, হৃৎপিণ্ডের সংকোচনের আওয়াজও নেই, অর্থাৎ দেখা দিয়েছে রক্তপ্রবাহ বন্ধের সমস্ত উপসর্গ।

এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে কী কী করতে হবে? কোন্ পরম্পরায় সেই সব সাহায্য দিতে হবে? রোগীকে হাসপাতাল পরিবহণ করার কাজ কীভাবে সংগঠিত করতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ৫ নং পরিচ্ছেদ "রক্তপ্রবাহ বন্ধে পুনরুজ্জীবিতকরণ।"

২৪. মোটা এক মহিলা পা পিছলে পড়ে যায়। আঘাত লাগার মুহূর্ত থেকে তার মাজায় দেখা দেয় অসম্ভব ব্যথা, যার জন্য সামন্যতম নড়চড়া করাও অসম্ভব হয়ে ওঠে। অচিরেই মহিলাটি দেখল তার নিম্ন দেহপ্রান্ত দুটি অবশ হয়ে আসছে আর দেহের অবস্থানভঙ্গি পরিবর্তনের সামান্য চেষ্টা করলেই ব্যথা তীব্রতর হচ্ছে, আর এমনকি পিঠ স্পর্শ করলেও ভীষণ ব্যথা লাগছে।

মহিলাটির কী রকম জখম হয়েছে? কোন্ দিক থেকে তা বিপদজনক? পরিবহণ করার জন্য কি তাকে নিশ্চলভাবে ধরে রাখার অবস্থা সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে? দুর্দশাগ্রস্তাকে কি ভাবে হাসপাতালে পরিবহণ করা প্রয়োজন?

উত্তরের জন্য দেখুন ৯ নং পরিচ্ছেদের "অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ (কশেরুকার অস্থিভঙ্গ)।

২৫. বৃদ্ধ এক ব্যক্তি হঠাৎ হোঁচট খেয়ে তাঁর দুই হাতের পাতার ওপর ভর করে পড়ে যাওয়ায় দেখা দিল তার হাতের কব্জির অস্থিসন্ধিতে ভীষণ ব্যথা, যা হাতের পাতা নাড়ালে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তার হাতের কব্জি ও বহিঃপ্রগণ্ডাস্থির বহিরাকৃতিও খুব বদলে গেল।

লোকটির কী জখম হয়েছে? প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের এক্ষেত্রে কর্তব্য ও করণীয় কী?

উত্তরের জন্য দেখুন ৯ নং পরিচ্ছেদের "অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

২৬. ট্রাক থেকে মাল খালাস করার সময় এক ব্যক্তি গড়িয়ে-পড়া কাঠের গুঁড়িতে চাপা পড়ে। সে শ্রোণীচক্র অঞ্চলে ভীষণ ব্যথার কথা বলছে, পা দুটো নাড়াতে পারছেনা। দুর্দশাগ্রস্ত দেখতে ফ্যাকাশে, চামড়া আঠালো ঠাণ্ডা ঘামে আবৃত, তার নাড়ী দুর্বল ও দ্রুত।

লোকটির জখমের চরিত্র কী? দুর্দশাগ্রস্তের গুরুতর অবস্থা হওয়া কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানে কোন্ পরম্পরা রক্ষা করে, তা করতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ৯নং পরিচ্ছেদের "অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য"।

২৭. ধাক্কা লেগে মোটর সাইকেল চালকের দুই জঙ্ঘাতেই জোর আঘাত লাগল। ফলে দুই জঙ্ঘাস্থির বহিরাকৃতিই পরিবর্তিত হল ও তাতে দেখা দিল অস্বাভাবিক সচলতা ও একটু নড়লেই ভীষণ ব্যথা। ডান পায়ের জঙ্ঘার ওপর দেখা যাচ্ছে ক্ষত যার ভেতর দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বৃহৎ জঙ্ঘাস্থির ভাঙ্গা হাড়ের কণ্ডির গোড়া।

মোটর সাইকেল চালকের জখমের ধরনটা কী? প্রাথমিক সাহায্য দিতে কোন্ পরম্পরায় কী কী করতে হবে? ক্ষতের জন্য কী করতে হবে এবং বিশেষ স্প্লিণ্ট না থাকলে জখম হওয়া পা-কে কীকরে নিশ্চল করে রাখতে হবে।

উত্তরের জন্য দেখুন ৯নং পরিচ্ছেদের "অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

২৮. মোটরের ধাক্কা খেয়ে এক ব্যক্তি রাস্তার ওপর পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পেল। কি ঘটেছে তা সে স্মরণ করতে পারছে না। ক্লেশ — মাথা ব্যথা, মাথা ঘুরানি, বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া। শিরনিম্নাস্থি অঞ্চলে তার বাড়ি লাগা ক্ষত, দুই কানের শ্রবণপথ দিয়ে গড়াচ্ছে রক্তমাখা রস, অস্থিভাঙ্গার কোন পরিস্কার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

দুর্দশাগ্রস্তের গুরুতর অবস্থার কারণ কী এবং কী প্রকারের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য তাকে দেওয়া দরকার? এই ধরনের জখম হলে রোগীকে পরিবহণ করতে পালনীয় মূল নিয়মগুলি কী?

উত্তরের জন্য দেখুন ৯ নং পরিচ্ছেদ (করোটি ও মস্তিষ্কের জখম)।

২৯. একটি শিশু, গাছ থেকে পড়ে গিয়ে কোন শক্ত জিনিষের সঙ্গে ধাক্কা (বুকে) খেল। শিশুটি ব্যথায় গোঙাচ্ছে, তার শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে দ্রুত ও অগভীর ভাবে। একটু কাশি দিলে বা নড়াচড়া করলে ব্যথা ভীষণ বেড়ে যাচ্ছে। বুক স্পর্শ করলে তা বেদনাদায়ক ও চামড়ার তলায় অনুভূত হচ্ছে মচমচানি আওয়াজ, যেমন আওয়াজ হয় তুষারের ওপর হাট্‌লে।

কী জখম হয়েছে? জখম কি বিপদজনক? কিভাবে সাহায্য করা যায় দুর্দশাগ্রস্তকে?

উত্তরের জন্য দেখুন ৮নং পরিচ্ছেদের "করোটি, বক্ষপিঞ্জর ও পেটের জখমে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ; ৯নং পরিচ্ছেদের "অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য" (পাঁজরের অস্থিভঙ্গ) সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৩০. আপনার কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে আপনার প্রতিবেশী। কয়েক ঘণ্টা ধরে সে কষ্ট পাচ্ছে পেটের ব্যথায়, কয়েকবার বমিও হয়েছে, জ্বর ৩৭·৫° সেণ্টিগ্রেড, ব্যথাটা ক্রমে সীমাবদ্ধ হয়ে আসছে তলপেটের ডান দিকে, পায়খানা হয় নি। পেট বেশ শক্ত এবং স্পর্শ করলে তা বেদনাদায়ক।

এ ক্ষেত্রে কী অসুখ সন্দেহ করা দরকার? কিভাবে তাকে প্রাথমিক সাহায্য দিতে হবে? রোগীকে কি অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানো দরকার?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "পেটগহ্বরের দেহাঙ্গগুলির প্রকট অসুখ" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৩১. তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে এক ব্যক্তি গিলে ফেল্‌ল

তার নিজস্ব দাঁতের ডেঞ্চার (বাঁধানো দাঁতের ব্লক)। তার নিজের অনুভূতি এই যে, তা আটকে আছে খাদ্যনালীতে। কষ্ট — উরঃফলকের পেছনে ব্যথা। শ্বাস নিতে কোন কষ্ট হচ্ছেনা, গলার আওয়াজও পরিষ্কার।

বহিরাগত বস্তু কি খাদ্যনালীতে আটকে থাকতে পারে? রোগীকে অবিলম্বে হাসপাতালে পাঠানোর প্রয়োজন আছে কি? এ কেসে কী ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "কান, নাক, চোখ, শ্বাসপথ এবং পাকস্থলী-অন্ত্রপথে বহিরাগত বস্তু" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৩২. মৌমাছির চাকের কাছে অসাবধাণ হওয়ার ফলে শিশুকে হুল ফোটালো কয়েকটি মৌমাছি, তার দেহের নানা জায়গায় ও মুখমণ্ডলে।

কী প্রকারের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে এক্ষেত্রে? শিশুর দেহের অনেক জায়গায় মৌমাছি হুল ফোটালে, তাকে কি হাসপাতালে পাঠানো অবশ্য প্রয়োজনীয়?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "রেবিস রোগে আক্রান্ত জীব-জন্তুর কামড়, বিষাক্ত সাপ ও পোকা-মাকড়ের কামড়" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৩৩. আপনার শরণাপন্ন হয়েছে এক যুবতী। তার কষ্ট ভীষণ দুর্বলতা, মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, পেটে — সহ্য করা যায় এমন ব্যথা। যুবতীটি ভীষণ রক্তশূন্য, নাড়ীর গতি মিনিটে ১২০ এবং তা দুর্বল, পেট খানিকটা ফাঁপা, চাপযুক্ত হাতের স্পর্শে পেটের সমস্ত অংশে তার

ব্যথা অনুভূত হয় কিন্তু স্পর্শের পর পেট থেকে হাত হঠাৎ তুলে নিলে সে মুহূর্তে ব্যথা ভীষণ বর্দ্ধিত হয়।

এ ক্ষেত্রে কোন্ অসুখ সন্দেহ করা উচিৎ? সে অসুখ কি গুরুতর অসুখ? এ কেসে প্রাথমিক সাহায্য ও জরুরী ভাবে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "পেটগহ্বরের দেহাঙ্গগুলির প্রকট অসুখ" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ; ৭নং পরিচ্ছেদের "দেহের বাইরে ও ভেতরে রক্তপাতের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৩৪. আপনার প্রতিবেশিনী কাজের পর সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখতে পেলেন যে তার স্বামী সোফায় শুয়ে আছে অজ্ঞান হয়ে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে গলায় ঘড় ঘড় করে আওয়াজ হচ্ছে, যা দূর থেকেও শোনা যায়। নাড়ী দ্রুত ও দুর্বল, ঘরের জানালা বন্ধ ও জানালার পৈঠাতে ক্লোরফস গ্যাসের একটা ডিবে।

লোকটির গুরুতর অবস্থার কারণ কি? এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দান কী উপায়ে করতে হয় ও রোগীকে গাড়ীতে করে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার সময় কী কী বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৩৫. বাসে দাঁড়ানো অবস্থায় একজন পুরুষ মানুষ হঠাৎ পড়ে গেল। তার দেহপ্রান্তগুলির, কাঁধের ও মুখ-মণ্ডলের মাংসপেশীগুলির এলোপাথাড়ি খিঁচুনি আরম্ভ হল। খিঁচুনির সঙ্গে সঙ্গে তার ঘাড় একদিকে বেঁকে গেল, মুখ থেকে ফেনাযুক্ত রস বেরোতে আরম্ভ করল, মুখমণ্ডল

নীলাকার হয়ে গেল ও ফুলে ফুলে উঠল, শ্বাস জোরে জোরে এবং শ্বাসের সঙ্গে আওয়াজ হতে লাগল। ২-৩ মিনিটের মধ্যেই খিঁচুনি বন্ধ হয়ে গেল, শ্বাস নেওয়া মোলায়েম হয়ে উঠল, যেমন দেখা যায় নিদ্রিত মানুষের।

ঐ পুরুষ মানুষটির কী অসুখ? মাংসপেশীর খিঁচুনি কোন্ দিক থেকে বিপদজনক? এতে কী ভাবে প্রাথমিক সাহায্য দেওয়া উচিত?

উত্তরের জন্য দেখুন পরিচ্ছেদ ১১ (এপিলেপ্সির খিঁচুনি)।

৩৬. ডিস্পেন্সারীতে এসে একজন পুরুষ মানুষ অনুরোধ জানায় তার স্ত্রীকে সাহায্য করার জন্য। স্ত্রীর প্রসব শুরু হয়েছে — জল ভেঙ্গেছে। প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের জন্য ডিস্পেন্সারী থেকে সঙ্গে কী কী নেওয়া প্রয়োজন? প্রসবে নবজাতককে কেমন ভাবে গ্রহণ করতে হয় ও কি ভাবে তার নাড়ী কাটতে হয় ও নাড়ীর পরিচর্য্যা করতে হয়? মা ও নবজাত শিশুকে কি এরপর প্রসবাগারে পাঠানো দরকার?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "হঠাৎ প্রসব" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৩৭. এক শিশু, বোতল থেকে এক অজানা তরল পদার্থ পান করে ফেলেছে। মুখ ও পেটে আরম্ভ হয়েছে ভীষণ ব্যথা। ঠোঁট দুটি ও মুখগহ্বরের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী আবরণী ফুলে উঠেছে, ঢেকে গেছে কুঁচকানো সাদাটে-ধূসর রঙের পরত দিয়ে। বারে বারে রক্ত মিশ্রিত বমি হচ্ছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট দেখা দিয়েছে।

কোন্ বিষের বিষক্রিয়া হয়েছে শিশুর? কী উপায়ে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের 'ঘ'নীভূত অম্ল ও ক্ষয়কারক ক্ষারের বিষক্রিয়া" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৩৮. অনেকদিন ধরে হৃৎপিন্ডের ভাল্বের গন্ডগোলে-ভোগা একটি রোগীর অবস্থা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে পড়ল: দেখা দিল ও তাড়াতাড়ি বাড়তে লাগল তার হাওয়া অসংকুলানের অনুভূতি ও শ্বাসকষ্ট। শ্বাসের সঙ্গে আরম্ভ হল গলায় ঘড়ঘড় আওয়াজ, কাশির সঙ্গে বেরুতে লাগল অনেক পরিমাণে সাদা রঙের ফেনা ফেনা শ্লেষ্মা। চামড়া ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর রঙ নীলাভা হল, দেখা দিল হৃৎপিন্ডের কাজের গন্ডগোল — ধুক ধুকানি মাঝে মাঝে বন্ধ হওয়া, নাড়ীর গতি বেতাল হওয়া।

রোগীর এ কোন্ জটিলতা দেখা দিল? কিভাবে এতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে। দেহের কোন্ অবস্থানভঙ্গিতে রেখে এ রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা দরকার?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "ফুসফুসের শোথ" বিষয়ক অংশ।

৩৯. এক বালকের হঠাৎ ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল, দেখা দিল জোরে জোরে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছুঁড়ে চলা ও চলায় শৃঙ্খলাবিহীনতা। চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে, নাড়ীর গতি খুব দ্রুত; চোখের তারা স্ফীত। মাঝে মাঝে বমি হতে লাগল। অন্য ছেলেদের কাছ থেকে শুনে বোঝা গেল যে, শিশুটি কোন এক রকমের ফলের গোটা খেয়েছে।

কোন্ বিষের এই বিষক্রিয়া? কীভাবেও কী দিয়ে এতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে? এর জন্য ডাক্তারের সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "ওষুধ ও এলকোহলের বিষক্রিয়া" নামক অংশ এবং "বিষনাশক ও বিষক্রিয়া নষ্ট করার উপায়ের তালিকা"।

৪০. আততায়ী কিশোরকে পেটে ছুরিকাহত করে উধাও হয়েছে। পরীক্ষা করে দেখা গেল পেটের সামনের দিকের দেওয়ালে রয়েছে ৫ সেণ্টিমিটার লম্বা ক্ষত, যেখান থেকে সামান্য রক্ত পড়ছে ও ক্ষতের ভেতর দিয়ে নাড়ীর মালার মত অংশ বেরিয়ে পড়েছে।

কোন্ পরম্পরা রক্ষা করে এতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে? কী দিয়ে ক্ষত ঢাকতে হবে, হাতের কাছে যদি স্টেরাইল ব্যাণ্ডেজ না থাকে? কীভাবে আহতকে হাসপাতালে পরিবহণ করতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ৮নং পরিচ্ছেদের "করোটি, বক্ষপিঞ্জর ও পেটের জখমে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের বিশেষত্ব" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৪১. অজানা এক কুকুরের কামড়ে একজন স্ত্রীলোকের নিম্ন দেহপ্রান্তে সৃষ্টি হল কতগুলি ছিঁড়ে-যাওয়া জখম, যা থেকে সামান্য রক্ত পড়ছে।

কীভাবে এক্ষেত্রে প্রাথমিক সাহায্য দিতে হবে? এণ্টিরেবিক (জলাতঙ্ক বিরোধী) ভ্যাকসিন দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি? থাকলে তা কখন দিতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "রেবিস রোগে আক্রান্ত জানোয়ারের কামড়, বিষাক্ত সাপ ও পোকা মাকড়ের দংশন" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৪২. খাদ্যের সঙ্গে ব্যাঙের ছাতা গ্রহণ করার কয়েক ঘণ্টা পর পরিবারের সকলের দেখা দিল পেটের ব্যথা, অত্যধিক

লালা নিঃসরণ, বমি, মাথা ধরা, পাতলা পায়খানা, দেহের তাপবৃদ্ধি আর পরিবারের ছোটদের উত্তেজনা ও বিকার।

কি থেকে হল বিষক্রিয়া? কিভাবে তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে? হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসার এতে কি প্রয়োজন আছে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "খাদ্যের বিষক্রিয়া" নামক অংশ।

৪৩. কেরোসিনের টিন পুড়ে বিস্ফোরিত হয়ে আগুন ধরে যায় এক শ্রমিকের জামা-কাপড়ে। ত্রিপলের সাহায্যে আগুন নেভানো হল, ধূম্রময় জামা-কাপড়ে জল ঢেলে তুষের আগুনে পোড়াও নিবারিত হল, মুখমণ্ডলে দেখা গেল দাহক্ষত। দুর্দশাগ্রস্তের অবস্থার তাড়াতাড়ি অবনতি পরিলক্ষিত হল: দেখা দিল অবসাদ, অবদমিত অবস্থা, পারিপার্শ্বিকের প্রতি আগ্রহবিহীনতা, নাড়ীর গতি দ্রুত, শ্বাসপ্রশ্বাস অগভীর।

এই গুরুতর অবস্থা সৃষ্টির কারণ কী? কীভাবে তাকে প্রাথমিক সাহায্য দিতে হবে? কীভাবে তাকে হাসপাতালে পরিবহণ করতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ৪নং পরিচ্ছেদ, ১০নং পরিচ্ছেদের "দাহক্ষত" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৪৪. প্রসারিত বাহুর ওপর পড়ে গিয়ে কাঁধের অস্থিসন্ধিতে দেখা দিল ভীষণ ব্যথা ও তার বহিরাকৃতির বিকৃতি। অস্থিসন্ধি নড়ানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল, দেহ-প্রান্ত অচল হয়ে রইল তার অস্বাভাবিক অবস্থায়, লম্বায় খানিকটা খর্ব হয়ে।

দুর্দশাগ্রস্তের কোন্ ধরনের জখম হয়েছে? তাকে কী

উপায়ে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে? এতে ডাক্তারের সাহায্যের প্রয়োজন আছে কি?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "চোট লাগা, টান লাগা, ছিঁড়ে যাওয়া, চেপ্টে যাওয়া, অস্থির সন্ধিচ্যুতির প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য" নামক অংশ; ২নং পরিচ্ছেদ (বক্ষপিঞ্জরের ওপরে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা)।

৪৫. পশুপালন ফার্মের এক কর্মিণীর হাতে, পশুপালনের চালা সাফ করার সময় সেখানকার দেওয়ালে গাঁথা একটি লোহার আঁচড় লাগে। ছড়ে-যাওয়া জায়গাটার ওপর টিংচার আয়োডিন লাগিয়ে সে কাজ করতে থাকে।

কর্মিণীটির তা করা উচিত হয়েছে কি? চামড়ার উপরিভাগ ছড়ে গেলে কী কী বিপদ হতে পারে? এ ক্ষেত্রে কর্মিণীটির কী করা উচিত ছিল?

৪৬. কাঠকাটার কাজে নিযুক্ত এক শ্রমিক, অনেক উঁচু থেকে কাঠের পাঁজার ওপর পড়ে গিয়ে পিঠে খুব চোট পায়। দেখা দেয় পিঠের ভীষণ ব্যথা একটু নড়াচড়া করলে যা আরও বৃদ্ধি পায়, নিম্ন দেহপ্রান্ত দুটিকে নড়ানই কঠিন হয়ে উঠল।

লোকটির কী জখম হয়েছে? কী ভাবে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে? কীভাবে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা যায় যদি হাতের কাছে স্ট্রেচার না থাকে?

উত্তরেরর জন্য দেখুন ৯ নং পরিচ্ছেদের "অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য" নামক অংশ; ৩ নং পরিচ্ছেদ (দুর্দশাগ্রস্তের পরিবহণ)।

৪৭. অসাবধাণ অঙ্গ সঞ্চালনে এক ব্যক্তির নিম্নবাহু ও হাতের পাতায় উৎলানো দুধ পড়ে গেল। ফলে সেস্থান

ভীষণ লাল হয়ে উঠল, অনেক জায়গায় জল ভরা ফোস্কা পড়ল। কষ্ট — হাতের ভীষণ জ্বালা।

কী ধরনের প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য তাকে দিতে হবে? ফোস্কাগুলির মাথা ছিঁড়ে দেওয়া কি উচিত? হাতের পোড়া চামড়ার উপরিভাগে কি তৈলাক্ত মলম লাগানো উচিত? বন্ধনী বাঁধার প্রয়োজন আছে কি? কীভাবে জ্বালা কমানো যায়?

উত্তরেরর জন্য দেখুন ১০ নং পরিচ্ছেদের "দাহক্ষত" নামক অংশ।

৪৮. পড়ে গিয়ে এক বৃদ্ধা মহিলার উরুর অস্থিসন্ধি অঞ্চলে (hip joint) ব্যথা করতে লাগল। মহিলা উঠতে পারছেন না, কেননা দেহপ্রান্তটিকে একটু নড়ালেই ভীষণ ব্যথা করে উঠছে।

মহিলার কী ধরনের জখম হয়েছে? তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে কোন্ পরম্পরায় কী কী করতে হবে? দুর্দশাগ্রস্তকে কোথায় এবং কেমন ভাবে স্থানান্তরিত করতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ৯ নং পরিচ্ছেদের "অস্থিভঙ্গে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ, ৩ নং পরিচ্ছেদ (দুর্দশাগ্রস্তের পরিবহণ)।

৪৯. এক ব্যক্তি ভুল করে এক গেলাস বরিক অম্লের সলিউশন পান করে ফেলেছে। কষ্ট — পেটের ব্যথা, জ্বালা করা ঢেকুর ও বমি বমি ভাব।

তাকে কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে? কোন্ উপায়ে ও কী দিয়ে তার পাকস্থলী ধৌত করে দেওয়া উচিত?

উত্তরের জন্য দেখুন ৯ নং পরিচ্ছেদের "ঘনীভূত অম্ল ও ক্ষয়কারক ক্ষারে বিষক্রিয়া" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ; বিষনাশকের তালিকা।

৫০. এক যুবকের বাইরের শ্রবণপথে হঠাৎ খুব সুড়সুড় আওয়াজ হতে লাগল, কান চুলকাতে লাগল, অনুভূত হতে লাগল কানের ভেতর যেন ধারালো জিনিষের আঁচড় লাগছে।

কী ব্যাপার ঘটেছে তার কানে? কীভাবে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দিতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ৯ নং পরিচ্ছেদ (কানে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তুর প্রবেশ)।

৫১. এক বৃদ্ধ ব্যক্তির এপেপ্লেক্সি হওয়ায় দীর্ঘদিন শুয়ে থাকার ফলে ৫ দিন ধরে পায়খানা হচ্ছে না। তারই জন্য ক্ষুধাও নেই, দেখা দিয়েছে ভীষণ দুর্বলতা। পেটটা বড় হয়ে উঠেছে অথচ ব্যথা নেই।

কী ভাবে রোগীকে সাহায্য করতে হবে? এ কেসে সাইফন করা ডুস ব্যবহার করা কি উচিত?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "পেটের দেহাঙ্গগুলির প্রকট অসুখ" নামক অংশ ও ১২ নং পরিচ্ছেদের "রোগীর সেবা ও তাকে বিভিন্ন ধরনের সাহায্য দান" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৫২. নাকের ফুটো দুটি থেকে হঠাৎ বেশী রকম রক্তপাত শুরু হল। রোগী বিচলিত, তার নাক ঝাড়ায় ও থুতুর সঙ্গে রক্ত বেরুচ্ছে আর আংশিক ভাবে সে রক্ত গিলে ফেলছে।

কীভাবে রোগীর এই রক্তপাত বন্ধ করা যায়? রক্ত

বন্ধের জন্য রোগীকে দেহের কোন অবস্থানভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে? রোগীকে এ কেসে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন আছে কি?

উত্তরের জন্য দেখুন ৭নং পরিচ্ছেদের "বাইরে ও দেহের ভেতর কয়েক রকম রক্তপাতের প্রাথমিক সাহায্য" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৫৩. জঙ্ঘায় ক্ষত হওয়ার জন্য একজন রোগীকে টিটেনাস বিরোধী সিরাম ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর সে হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো, সারা দেহে দেখা দিল ঠান্ডা ঘাম, শ্বাস-কষ্ট আরম্ভ হল। নাড়ীর গতি দ্রুত, রক্তের চাপ নেমে গেল ৬০-৪০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভে। রোগীর অবস্থা হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়া কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? কী করা প্রয়োজন এই কেসে?

উত্তরের জন্য দেখুন ৪নং পরিচ্ছেদ।

৫৪. তিন বছরের এক শিশু খেলা করতে করতে নিজের কানের ভেতর ঢুকিয়ে দিল একটি দানা। বলছে কান ব্যথা করছে।

কী করা উচিত ও কতক্ষণের মধ্যে তা করা উচিত?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদ (কানে বহিরাগত বিজাতীয় বস্তু)।

৫৫. বাষট্টি বৎসরের এক মহিলা হঠাৎ স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল তাঁর চামড়ার রঙ ফ্যাকাশে, নাড়ীর গতি মিনিটে ৯২, রক্তের চাপ ১০০/৬০ মিলিমিটার পারদস্তম্ভ, শ্বাসপ্রশ্বাস গভীর — মিনিটে ১৫ বার।

এ ক্ষেত্রে কী করা দরকার? অনুরূপ অবস্থার কারণ কী? উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদ।

৫৬. ওষুধের সলিউশন দিয়ে ডুশ দেওয়ার পর রোগীর দেখা দিল ভীষণ পেটব্যথা এবং ডুশের নিষ্কাশিত জলের সঙ্গে বেরিয়ে এল অনেক রক্ত।

ওরকম অবস্থা হওয়ার কারণ কী? কী করা দরকার? উত্তরের জন্য দেখুন ৭ নং পরিচ্ছেদের (পাকস্থলী ও অন্ত্র থেকে রক্তপাত) নামক অংশ।

৫৭. এক জন পুরুষ — ৪৩ বছর বয়স, ব্যথায় চিৎকার করে কোঁকাতে লাগল। ২ ঘণ্টা আগে তার হঠাৎ আরম্ভ হয়েছে কটিদেশে যন্ত্রণা, যা ছড়িয়ে পড়ছে বাম ঊরুতে ও যৌনাঙ্গের থলিতে। পরিলক্ষিত হচ্ছে বারে বারে প্রস্রাব, প্রস্রারের রঙ গোলাপী লাল, অনুরূপ আক্রমণ তার হয়েছিল এক বছর আগে।

এ ক্ষেত্রে কোন অসুখ সন্দেহ করা যায়? কী করতে হবে?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "বৃক্কের কলিক" নামক অংশ।

৫৮. দাঁত তোলার ৩ ঘণ্টা পর রোগী লক্ষ্য করল মুখে তার রক্ত জমা হচ্ছে, যা বারে বারে থুতু ফেলে বের করে দিতে হচ্ছে। রোগীর সাধারণ অবস্থা ভালই, চামড়ার রঙ গোলাপী, নাড়ীর গতি মিনিটে ৮০ বার, তাতে দুর্বলতার লক্ষণ নেই।

রক্তপাতের কারণ কী? রক্তপাত বন্ধের জন্য কি করতে হবে? দাঁতের ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শের দরকার আছে কি? যদি তা করতে হয় তাহলে কখন তা করা দরকার?

উত্তরের জন্য দেখুন ৭ নং পরিচ্ছেদের (দাঁত তোলার পর রক্তপাত) সম্বন্ধে লিখিত অংশ।

৫৯. তিরিশ বছর বয়সের এক পুরুষ শ্রমিক কাজ করতে করতে ৮ মিটার উঁচু স্থান থেকে নিচে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেল তার শিরকুণ্ডাস্থির ওপর রয়েছে এক ক্ষরণরত ক্ষত। ক্ষতের মাপ ১০×৪ সেন্টিমিটার। নাক ও মুখ দিয়েও রক্ত পড়ছে। তার ডান কাঁধের চামড়ার ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভাঙ্গা হাড়ের চোখা টুকরো। নাড়ী মিনিটে ১২০, কোমল, ভরাট হচ্ছে ভালই। রক্তের চাপ ১০০/৬০ মিলিমিটার পারদ স্তম্ভ।

দুর্দশাগ্রস্তের কী ঘটেছে? প্রাথমিক সাহায্য চিকিৎসা দিতে এক্ষেত্রে পর পর কোন পরম্পরায়, কী কী করতে হবে? দুর্দশাগ্রস্তকে কোন্ বিষয়ে বিশেষীকৃত হাসপাতালে পাঠাতে হবে? হাসপাতালে তাকে পরিবহণ করে নিয়ে যাওয়ার জন্য কী রকম ব্যবস্থা সংগঠিত করা দরকার?

উত্তরের জন্য দেখুন ৮ নং পরিচ্ছেদের "ক্ষতের ইনফেকশন হওয়া" নামক অংশ; পরিচ্ছেদ নং ৩ (দুর্দশাগ্রস্তের পরিবহণ)।

৬০. এক বৃদ্ধ পুরুষ মদ খেয়ে মাতাল হওয়ার ফলে তার দেখা দিল বমি। বমি করার সময় পড়ে গিয়ে সে অজ্ঞান হয়ে যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেল তার চোখের তারা স্ফীত, শ্বাসপ্রশ্বাস বিরল, দেহপ্রান্তগুলিতে নাড়ী নেই, কেন্দ্রীয় ধমনীগুলিতেও নাড়ী অনুভূত হচ্ছে না।

অনুরূপ অবস্থা হওয়া কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? কী অবস্থা অবলম্বন করা দরকার?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১নং পরিচ্ছেদের "ওষুধ ও এলকোহলের বিষক্রিয়া" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

৬১. খাদ্যের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য ভিনিগার পান করে ৬ বছরের এক শিশু মুখগহ্বরের ভীষণ ব্যথায় কাঁদছে ও চিৎকার করছে।

শিশুটিকে কীভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দেওয়া দরকার?

উত্তরের জন্য দেখুন ১১ নং পরিচ্ছেদের "ঘনীভূত অম্ল ও ক্ষয়কারক ক্ষারের বিষক্রিয়া" সম্বন্ধে আলোচিত অংশ।

পাঠকদের প্রতি

বইটির অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

USSR, 129820, MOSCOW, I-110,
GSP, PERVY RIZHSKY PROEZD, 2
MIR PUBLISHERS

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

মির প্রকাশনের নতুন বই

আ. কিতাইগারোদস্কি

সকলের জন্য পদার্থবিদ্যা (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)

এই বই দুটি দিয়েই 'সকলের জন্য পদার্থবিদ্যা' সিরিজটি শেষ হবে। এতে আছে নিম্নলিখিত ধারণাসমূহ: অণু ও পরমাণুর বৈদ্যুতিক গঠন, রেডিও ইঞ্জিনিয়ারিং, চৌম্বক ক্ষেত্র, তড়িৎ-চৌম্বক ক্ষেত্র, তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ, আলোকযন্ত্র, বলবিদ্যার সার্বিকীকরণ, পরমাণু-কেন্দ্রের গঠন, আমাদের চারিদিকের শক্তি। বই দুটির নাম দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে 'ইলেক্ট্রন' ও 'ফোটন ও পরমাণু-কেন্দ্র।'

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে

মির প্রকাশনের নতুন বই

ড. লাঙ্গে

পদার্থবিদ্যা: প্রশ্ন ও উত্তর

পদার্থবিদ্যার নানা বিভাগের ১৪৩টি প্রশ্ন ও তাদের সমাধান সংবলিত এই বইখানা মূলত স্কুলের উচ্চতর শ্রেণী ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে লিখিত। প্রশ্নগুলির অধিকাংশই পরীক্ষামূলক চরিত্রের হলেও সেগুলোর সমাধানের জন্য হাতের কাছে পাওয়া সাধারণ জিনিষ-পত্র ও পদার্থবিদ্যার প্রাথমিক জ্ঞানই যথেষ্ট। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত সচিত্র বইখানা অবশ্যই পাঠকের চিন্তার খোরাক জোগাবে।

পুস্তিকাটি, প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্যের সাধারণ ও অতিপ্রয়োজনীয় ধারণা সম্বলিত একটি পাঠ্যপুস্তক। নানা ধরনের দুর্ঘটনা ও আকস্মিক রোগে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য দানের মূল নীতিসমূহ ও তার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের আবশ্যকতা সম্বন্ধেও বইটিতে বলা হয়েছে। নিবীজিতকরণ, ব্যান্ডেজ বাঁধা এবং পুনরুজ্জীবিতকরণের নানা পদ্ধতি ছাড়াও বইটিতে রয়েছে রক্তপাত, অস্থিভঙ্গ, বিদ্যুতাঘাত, বিষক্রিয়া ইত্যাদিতে প্রাথমিক চিকিৎসা সাহায্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা। তাই, পুস্তিকাটি কেবলমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক হিসেবেই নয়, সাধারণ পাঠকের জ্ঞান প্রসারণের জন্যও কাজে লাগানো যেতে পারে।

ISBN 5-03-000427-0